দ্য স্যান্ড অফ টাইম

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

১. বিশ্ববিখ্যাত মানুষদের জীবন 2
২. লাস লাভাস ডেল মারকোয়েস 92
৩. মনের মধ্যে পবিত্র আগুনশিখা 192
৪. লকহীডের পাইলট 252
৫. জাইমে মিয়োর ঘুম 309
৬. কর্নেল র‍্যামন আকোকা 377

১. বিশ্ববিখ্যাত মানুষদের জীবন

বিশ্ববিখ্যাত মানুষদের জীবন আমাদের কানে কানে সেই কথা বলে, আমরাও তাদের মতো হতে পারি। তারা চলে যান, কিন্তু সময়ের বালুকাবেলায় তাদের পদচিহ্ন থেকে যায়।

–হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো।

.

না, যারা মারা গেছেন তাদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করো না।

তারা এই পৃথিবীর অংশ হয়ে গেছেন। এই পৃথিবীর মধ্যে তাদের সব কিছু মিশে আছে। তারা সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন। সেপনের গৃহযুদ্ধে যারা নিহত হয়েছেন, তারা ইতিমধ্যেই অমরত্ব লাভ করেছেন।

—আরনেস্ট হেমিংওয়ে।

.

গল্প শুরুর আগে আপনারা এটাকে একটা বানানো উপন্যাস বলতে পারেন, কিন্তু...

আমরা প্রবেশ করতে চলেছি ডন কুইকসোট এবং ফ্লেমিংকোর সেই রোমান্টিক ভূমিখণ্ডে, যা বরাবর ট্যুরিস্টদের হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। একে আমরা স্পেনীয় অভিযাত্রীদের মহান দেশ বলতে পারি। টরকোয়েমাডার দেশ হিসেবেও একে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখব, এই দেশের বুকে একদা সবথেকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ হয়ে গেছে। পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। একদিকে প্রজাতন্ত্রী, অন্যদিকে বিদ্রোহী জাতীয়তাবাদীরা। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে ২৬৯টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। জাতীয়তাবাদীরা হত্যা করতে থাকে প্রজাতন্ত্রীদের। প্রতি মাসে অন্তত এক হাজার করে। নিহতদের জন্য শোক প্রকাশের ওপর জারি করা হয় নিষেধাজ্ঞা। ১০৭টি গির্জা ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। কনভেন্ট থেকে বিতাড়িত করা হয় উপাসিকাদের। ডার্ক ডি সেন্ট সিমন লিখেছেন– এটা হল স্পেনীয় সরকার এবং চার্চের কর্তৃত্বের মধ্যে লড়াই। শেষ পর্যন্ত তা অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল। সংবাদপত্রের আধিকারিকদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খবরের টুটি চেপে ধরা হয়েছে। এই গৃহযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়। জাতীয়তাবাদীরা ফ্রাঙ্কের নেতৃত্বে স্পেনের ওপর তাদের দখলদারি কায়েম করে। ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পর স্পেনে রাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৩৬-১৯৩৯ সরকারীভাবে গৃহযুদ্ধের সময়সীমা। তারপরেও যুদ্ধের আগুনের আঁচ ধিকিধিকি জ্বলেছে। স্পেনের দুটি অংশ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কখনও সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত করা সম্ভব হয়নি। আজ স্পেনের বুকে আর একটি গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে। গেরিলারা বাসকোর নেতৃত্বে কর্তৃত্বের জন্য লড়াই করছে। এই লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে তারা গণতন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়েছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্কের শাসনকালে এই

যুদ্ধে তারা পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে যথেষ্ট বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। একের পর এক ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। দেখা গেছে গুপ্ত হত্যা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

ই টি এ অর্থাৎ একটি গেরিলা সংবাহিনীর নেতা মাদ্রিদ হাসপাতালে মারা গেছেন। তাকে ভীষণভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল। এই মৃত্যু দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করেছে। এর ফলে স্পেনের পুলিশ বিভাগের মহা আধিকারিককে পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। পাঁচজন নিরাপত্তা প্রধানকেও অপসারিত করা হয়েছে। চলে গেছেন ২০০ জন বলিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক।

১৯৮৬ সালে বার্সিলোনাতে বাসকোয়েটরা জনসমক্ষে স্পেনের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছেন। বাসকোর অধীনস্থ মানুষদের অত্যাচারে পাম্পালোনাতে হাজার হাজার মানুষ ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। পুলিশ দীর্ঘদিন যোবা ভূমিকা পালন করেছে। তারপর শুরু হয়েছে আধা সামরিক বাহিনীর শাসন। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে। দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। বাসকোর বাড়িতে গুলি চলেছে। জনগণ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ চোখে পড়ছে।

১৯৭৬ সালের ঘটনাবহুল দুটি সপ্তাহকে পাথেয় করে লেখা হল এই উপন্যাসটি। তাই . বলছি পাঠক-পাঠিকা, একে বানানো উপন্যাস বলার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করবেন...

.

০১. পাম্পালোনা, স্পেন-১৯৭৬

যদি পরিকল্পনাটা কোনো কারণে ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে আমাদের সকলকে মরতে হবে।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন এই প্রকল্পনার মধ্যে কোনো লুকোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি আছে কিনা। উনি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। শেষ পর্যন্ত দেখলেন, না, কোনো ছিদ্র চোখে পড়ছে না। পরিকল্পনাটার মধ্যে দুঃসাহসের ছাপ আছে। একে আমরা এক নির্ভীক প্রকল্প বলতে পারি। সেকেন্ডের ক্ষণভগ্নাংশের মধ্যে কাজ করতে হবে। জয়যুক্ত হলে অসামান্য সফলতা অর্জিত হবে। কিন্তু যদি আমরা হেরে যাই...

এখন চিন্তা করার কোনো মানে হয় না। জাইমে মিরো দার্শনিকভাবে চিন্তা করলেন এখন কাজে লেগে পড়তে হবে।

জাইমে মিরোকে আমরা কিংবদন্তীর এক মহানায়ক বলতে পারি। বাসকের অধীনে এক মহান নেতা। ইতিমধ্যে তিনি স্পেনীয় সরকারের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছেন। ছফুট লম্বা, মুখমণ্ডলে বুদ্ধির দ্যুতি, পুরুষালি চেহারা, দুটি চোখের তারায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অবয়বের থেকে তাকে আরও বেশি উচ্চ বলে মনে হয়। দেহের যা রং, তার থেকে বেশি বাদামী বলে মনে হয়। তিনি এক জটিল চরিত্রের মানুষ। বাস্তববাদী, যে কোনো ঘটনার ভবিষ্যৎ ব্যাপার কী হতে পারে, তা অনায়াসে বুঝতে পারেন। আবার রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন। স্বপ্নের জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠিত হন না।

পাম্পালোনা শহরটির সকলে এখন উন্মাদ হয়ে গেছে, কারণ কিছুক্ষণ বাদেই শুরু হবে সেই রক্ত নাচানো খেলা। ফিয়েস্টা দে সান ফেরমিন, উন্মত্ত ষাঁড়ের লড়াই, জুলাই-এর ৭ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত এই হাড় হিম করা খেলার আসর বসে। সমস্ত পৃথিবী থেকে তিরিশ হাজার পর্যটক ইতিমধ্যেই এই শহরে ভিড় করেছে। কেউ কেউ এসেছে এই শ্বাসরোধকারী খেলাতে অংশ নিতে ওই ভয়ংকর জন্তুর সাথে লড়াইতে অবতীর্ণ হতে। কোনো হোটেলে একটুকরো জায়গা ফাঁকা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নাভারা থেকে বিছানা নিয়ে দরজার সামনে শুয়ে পড়েছে। ব্যাঙ্কে ঢোকা সম্ভব হচ্ছে না। পার্কিং করা গাড়িগুলোতেও তারা জোর করে বসে পড়েছে। মাঠে ময়দানে তাদের তাবু চোখে পড়ছে। এমন কি ফুটপাথেও দেখা যাচ্ছে তাদের সারিবদ্ধ মিছিল।

কাফে এবং হোটেলে নানা ভাষার মানুষের ভিড়। সকলেই ওই শব্দচঞ্চল বর্ণরঞ্জিত মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছে। আহা, কৌতূহলোদ্দীপক বাজনা বেজে উঠেছে। প্যারেড এগিয়ে চলেছে। বাদামী রঙের ক্লোক পরা। কেউ বা সবুজ পোশাকে আচ্ছাদিত। মাথায় উষ্ণীষ, হাতে উন্মুক্ত তরবারি। সোনার আলো ঝিকঝিক করছে। রাস্তার মধ্যে দিয়ে তারা বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে এ বুঝি সাতরঙা নদী, মাঝে মধ্যে আতস বাজির বিস্ফোরণ, এখানে সেখানে আলোর ছটা। উৎসব শুরু হল বলে।

মানুষজন এসেছে সান্ধ্যলড়াইতে যোগ দেবে বলে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য অংশ হল এনসিরো– ভোরবেলার লড়াই। এর জন্য অনেকে উদগ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করে।

মধ্যরাত শুরু হবার দশ মিনিট আগে, রাস্তাঘাট অন্ধকার হয়ে গেছে। পাগল ষাঁড়গুলোকে তাদের আস্তানা থেকে বের করা হচ্ছে। এবার তারা সেতুর ওপর দিয়ে দৌড়োতে শুরু

করবে। তাদের গন্তব্য ক্যালে সানটো ডোমিংগো। সেখানে সারারাত তাদের আটকে রাখা হবে। ভোর হবার আগে দড়ি খুলে দেওয়া হবে। তারা এগিয়ে যাবে সরু ক্যালে সানটো ডোমিংগোর মধ্যে দিয়ে। হাজার মানুষের দৃষ্টি তাদের ওপর পড়বে। পৌঁছোবে প্লাজা দে হেমিংওয়েতে। সেখানে তাদের আটকে রাখা হবে বিকেল পর্যন্ত।

মধ্যরাত থেকে সকাল ছটা, আগন্তুকদের চোখের তারায় ঘুম উধাও, তারা আনন্দে মদ্যপান করছে, যৌবনের গান গাইছে, একে অন্যকে অনভিপ্রেত ভালোবাসা নিবেদন করছে। এত বেশি উত্তেজিত যে ঘুমোতে পারছে না। যারা এই মরণ খেলায় অংশ নেবে, তারা ইতিমধ্যেই জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে।

ছটা বাজতে আর বেশি দেরী নেই। মিনিট পনেরো বাকি আছে, ব্যান্ডের শব্দ পাওয়া গেল। অসাধারণ সংগীত, নাভারে বৃন্দবাদন। সকাল সাতটা, মনে হল বাতাসের মধ্যে দিয়ে রকেট ছুটে গেছে। মানুষ পাগল হয়ে গেছে। তারা আনন্দে চিৎকার করছে। এক-একটা মুহূর্তকে এক-একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। সময় এগিয়ে এসেছে, এবার–সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত।

এমন কিছু ঘটনা চোখে পড়ছে যা কোনোদিন ভোলা সম্ভব হবে না–একটির পর একটি। বাতাসের বুকে আলোড়ন। জলের বুকে বুদবুদ, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শব্দরা হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন একটি শব্দ আসছে। দেখা গেল, ছটি কালো কুচকুচে গোক আর ছটি বিরাট আকারের ষাঁড়কে। এক-একটির ওজন ১৫০০ পাউন্ডের কম হবে না। তারা। সকলেই প্রশিক্ষিত। চাবুকের আঘাত মাত্রই গর্জন করে উঠছে। কাঠের আচ্ছাদনের ভেতর সকলের চোখ। লড়াই এবার শুরু হবে। ষাঁড়গুলোকে কোনোরকমে শেষ অব্দি

বেঁধে রাখা হচ্ছে। তারাও লড়াই করতে উদগ্রীব। কিছু কিছু মানুষ চিৎকার করছে–ভয় এবং আতঙ্কে। কেউ আবার ওই উন্মত্ত বন্য জন্তুর সাথে লড়াই করার প্রহর গুণছে।

রাস্তার শেষ প্রান্তে অনেক মানুষের ভিড়, ক্যালে লাফটফেটা এবং ক্যালে জাভিয়ারের পাশে। দোকানগুলো চোখে পড়ছে। জামাকাপড়ের দোকান, ফলের দোকান। আমরা এগিয়ে চলেছি প্লাজা দে হেমিংওয়ের দিকে। এবার একটা চিৎকার শোনা যাবে। উন্মাদ মানুষের মুখ থেকে। ওই দেখা যাচ্ছে, ওই দেখা যাচ্ছে ষাঁড়ের মিছিল। শুরু হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেল আর্তনাদ। তাদের চকচকে তীক্ষ্ণ শিং, তাদের খুর দিয়ে আগুন ছুটছে। আমরা বাস্তবে ফিরে এসেছি। মৃত্যু, আরও আরও কাছে এসে গেছে। আমরা কি এখন পালাব? ঢুকে পড়ব ঘরের মধ্যে। দেখা গেল, একদল ভীতু মানুষকে। তারা এখানে থাকতে পারছে না। এই উত্তেজনার আগুনের আঁচ তাদের পুড়িয়ে ফেলছে। মনে হচ্ছে ষাঁড়ের পায়ের তলায় তারা চাপা পড়বে। এখুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

একটি ছোট্ট ছেলে তার দাদুর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ব্যারিকেডের আড়ালে। দুজনেরই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে দুটি শরীর।

ওদের দিকে তাকাও, বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, অসাধারণ তাই নয় কি?

ছোটো ছেলেটি ভয় পেয়েছে আমি ভয় পাচ্ছি দাদু, আর এখানে থাকব না।

দাদু এগিয়ে এলেন, ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, ভয় পাবার কী আছে? হ্যাঁ, ভয়-ভয় করছে বটে, কিন্তু দেখো, এই অভিজ্ঞতা তুমি সারা জীবন মনে রাখবে।

আমি একবার ষাঁড়ের সঙ্গে লড়েছিলাম। প্রথমে খুব ভয় লেগেছিল। তারপর দেখলাম, না, ব্যাপারটার ভেতর এত আতঙ্কের কিছু নেই। এভাবেই তুমি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে পারবে। জিতলে মনে হবে তুমি সত্যিকারের পুরুষ।

এখানে একটা নিয়মের কথা বলা যাক। ওই জন্তুগুলো ক্যালে সানটো ডোমিংগো ধরে প্রতি দুমিনিটে ৯০০ গজ ছুটে নিরাপদ জায়গায় চলে আসবে। বাতাসের মধ্যে সংকেত ভেসে আসবে। শুরু হবে লড়াই। কিন্তু? চারশো বছর ধরে আমরা একই নিয়ম পালন করে আসছি, তাই তো?

সরু পথ দিয়ে ষাঁড়ের দৌড় শুরু হয়ে গেছে। অন্তত ছজন বীর পুরুষকে দেখা গেল, বর্ণরঞ্জিত পোশাক তাদের পরনে, তারা সবকিছু সামলাচ্ছে। তারা ওই ষাঁড়গুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি রেখেছে। দেখছে, এখানে যেন কোনো অশুভ ঘটনা না ঘটে। একটু বাদেই সবকিছু পালটে যাবে। অনেকের শুভ সন্ধ্যা দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। অনেকের জীবন মৃত্যুর হাহাকারে হারিয়ে যাবে। বোঝা যাচ্ছে, উন্মাদনা আরও বাড়ছে। আঘাত করা হচ্ছে ওই ষাঁড়গুলোকে। তাদের গায়ে চাবুক। তারা ক্ষেপে উঠেছে।

আমরা আবার দৃষ্টি ফেরাচ্ছি ওই ছোট্ট ছেলে এবং তার দাদুর ওপর। কী হল? এক মুহূর্তের অসতর্কতা। ষাঁড়ের পায়ের তলায় দুজনেই প্রাণ হারিয়েছে কি? আর্তনাদ? হ্যাঁ, ঘাতক ষাঁড়ের শিং ঢুকে গেছে ওই ছোটো ছেলেটির পেটের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে তার। একটু বাদে তার মার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল। বাতাসে মৃত্যুর ইশারা। শুরু হয়ে গেছে বিশৃঙ্খলা। কেউ কাউকে মানতে চাইছে না। ষাঁড়েরা খেপে গেছে। বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের অবস্থা শোচনীয়। তারা শিং বাগিয়ে ধরেছে। ঢুকে পড়েছে

বাড়ির মধ্যে। ভেঙে দিচ্ছে খাবারের স্টলগুলি। কোনো কিছুকেই তারা রেয়াদ করছে না। কেন এমন হল? মানুষজন পালাচ্ছে, কীভাবে এখান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া যেতে পারে, তাই নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখা গেল একটা উজ্জ্বল লাল ট্রাককে। কে এসেছে? পুলিশ কি? এবার কী হবে? এই রাস্তা কোথায় গেছে? পাম্পালোনার কারাগারের দিকে।

.

এবার আমরা, দোতলা পাথরের তৈরি বাড়ির দিকে দৃষ্টি ফেরাব। এই বাড়ির সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এর ছোটো ছোটো জানলাগুলি। চারটি দিকে চারটি জানালা আছে। মাথার ওপর লাল-হলুদ স্পেনদেশীয় পতাকা উড়ছে। পাথরের তৈরি গেট। ছোট্ট বাগান। তিনতলায় আছে বেশ কয়েকটা সেল, যেখানে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের আটকে রাখা হয়।

জেলখানার মধ্যে একদল গার্ড ইউনিফর্ম পরে পায়চারি করছে। কঠিন কঠোর তাদের দৃষ্টি। পুলিশের হাতে মেশিন গান।

এখানে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। প্রশ্ন করাটা অপরাধ। কেউ একজন জানতে চাইল ফাদার, আমরা কি আরও সতর্ক হব? মনে হচ্ছে, একটা অঘটন ঘটতে চলেছে।

সেই প্রহরী তাকিয়ে থাকল ফাদারের দিকে। মেটাল ডিটেক্টর তার হাতে ধরা আছে। এগুলো সাধারণত এয়ারপোর্টে ব্যবহার করা হয়।

–আমি দুঃখিত ফাদার, কিন্তু এটাই হল এখানকার নিয়ম।

–ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে এত কিন্তু কিন্তু করতে হবে না।

পাদরি সাহেব সিকিউরিটি পেট্রলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন, পরিস্থিতি এখন অনুকূল নয়। দেখা গেল রথী তার হাতে ধরা অস্ত্রের ওপর আঙুলের চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

যাজক তাকালেন। প্রশ্রয়ের হাসি।

–এটা আমারই ভুল। তিনি মেটাল ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তার গলায় একটা রুপোর চেন ছিল। সেটি তুলে দিলেন প্রহরীর হাতে। না, এবার কোনো শব্দ নেই। মেশিন নীরব হয়ে গেছে। প্রহরী ওই ক্রুশটা আবার তার হাতে দিয়ে দিল। এবার তিনি কোথায় যাবেন? তিনি বোধহয় কারাগার কক্ষে প্রবেশ করবেন।

করিডরে কিছু মানুষের ভিড়। প্রহরী দার্শনিক সুরে বলে উঠল– আপনি যাবেন, সত্যি ফাদার? কিন্তু কেন? এই ষাঁড়ের আত্মার শান্তি কামনায়?

হ্যাঁ, আমাকে তো চেষ্টা করতে হবে।

প্রহরী মাথা নাড়ল- আমি তো বলেছি, এখানে নরকের অন্ধকার। এখানে আপনার কোনো কাজ নেই।

পাদরি সাহেব অবাক হয়ে প্রহরীর দিকে তাকালেন। তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমি কেন এসেছি জানো? আমি স্বীকারোক্তি গ্রহণ করব। অন্তত কিছু মানুষের কাছ থেকে।

প্রহরী ঘাড় ঝাঁকাল– কোনো কোনো সময় আমরা আপনাকে বাঁচিয়েছি। জামবোরা মারা গেছে ইনফারমিতে, হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তার।

প্রহরী এগিয়ে গেছে দূরবর্তী সেলের দিকে।

–এখানে এসে গিয়েছি আমরা, ফাদার।

এক প্রহরী দরজাটা খুলে দিল। তারপর সাবধানে ভেতরে প্রবেশ করল। তাকে অনুসরণ করে পাদরি সাহেব ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। প্রহরী দরজাটা বন্ধ করে দিল। করিডরে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখে বিরক্তি এবং ভয়ের চিহ্ন।

পায়ে পায়ে যাজক এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। নোংরা কারাকক্ষে শুয়ে আছেন এক বন্দী।

তিনি বললেন- তোমার নাম কী?

–রিকার্ডো মেলাডো।

পাদরি অবাক হয়ে তাকালেন। এই মানুষটিকে কেমন দেখতে তা ভাষায় বর্ণনা করা সহজ নয়। মুখটা ফুলে গেছে। চোখ প্রায় বন্ধ। মোটা দুটি ঠোঁট। সে কোনোরকমে বলল ফাদার শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আমি স্বপ্নেও তা ভাবতে পারিনি।

ফাদার হাসলেন– এটা আমার কর্তব্য। এই জন্যই তো আমাকে এই পদে নির্বাচিত করা হয়েছে।

আজ সকালে আমার ফাঁসি হবে। তাই তো।

ফাদার বললেন- হ্যাঁ, তোমার ওপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ জারি করা হয়েছে।

রিকার্ডো মেলাডো ফাদারের দিকে তাকাল। কিছু বলার চেষ্টা করল।

ফাদার বললেন আমি দুঃখিত, দেশের প্রধানমন্ত্রী এই আদেশ জারি করেছেন।

ফাদার ওই বন্দীর মাথায় হাত দিলেন। বললেন- তুমি কিছু বলবে কি?

রিকার্ডো মেলাডো বলে উঠল– আমি আর কী বলব? হ্যাঁ, যে পাপ আমি করেছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। আন্তরিকভাবে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রহরী কিছু শোনার চেষ্টা করছিল। ভাবছিল, এসব পাগলামির কী লাভ?

পাদরি সাহেব বললেন- তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক। এখন আমি আর কী বলতে পারি।

পদরি সাহেব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন কারাকক্ষের দরজার দিকে। প্রহরী দরজা খুলে দিল। সে এক মুহূর্তের জন্য পেছন ফিরে তাকাল। ওই বন্দীর দিকে তার বন্দুকটা তাক করল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

পাদরি সাহেব, কাজ শেষ হল?

যাজক এবার দ্বিতীয় কারাকক্ষে প্রবেশ করবেন। এখানে যে মানুষটি পড়ে আছে, তাকেও ভীষণভাবে আঘাত করা হয়েছে। অনেকক্ষণ তার রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকালেন যাজক। বললেন- তোমার নাম কী?

ফেলিক্স কারপিও। গলাটা খাসখসে। বেশ দাড়ি গোঁফ আছে। চোখের তারায় উজ্জ্বলতা। মনে হয় সে কিছু লুকোতে চাইছে। সে বলল, আমি মরতে ভয় পাই না ফাদার।

বাঃ, এই সাহসই তো আমি চাইছি। এই পৃথিবীতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাকে ভয় করব কেন?

এবার পাদরি তার স্বীকারোক্তি শুনলেন। দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে। প্রথমে জড়ানো, তারপর পরিষ্কার। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে তার জীবনে। বিদ্যুৎ চমক। একটির পর একটি মুহূর্ত কেটে গেছে। প্রহরী শুনছিল, অবাক হয়ে শব্দগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে।

ফাদার, তাড়াতাড়ি করুন, বাইরে কিছু একটা হচ্ছে বলে মনে হয়।

–আমার হয়ে গেছে।

প্রহরী আবার ওই কারাকক্ষের দরজাটা খুলে দিল। যাজক বেরিয়ে এলেন বাইরে, করিডরে দাঁড়ালেন। প্রহরী দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে সংঘর্ষের শব্দ। কী হচ্ছে? ছোট্ট জানলা দিয়ে প্রহরী দেখার চেষ্টা করল।

বুঝতে পারছি না। এত গোলমালের উৎস কোথায়?

যাজক বললেন- মনে হচ্ছে, কেউ বোধহয় আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চাইছে। আমি কি একবার দেখব?

–কিন্তু এভাবে?

না, তোমার অস্ত্রটা একবার ধার দেবে ভাই?

যাজক কথা বললেন, তিনি প্রহরীর কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপর? একটা স্টিলেট্রে হাত বদল হল। মুহূর্তের মধ্যে একটা চকচকে ছুরি ঢুকে গেল প্রহরীর বুকের ভেতর।

–আমার কিছু করার নেই, জাইমে মিরো বললেন। সাব মেশিনগানটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে মৃতার্ত ওই প্রহরীর হাত থেকে। হে ঈশ্বর, আমি জানি, এই অস্ত্রটা আর তোমার কোনো কাজে লাগবে না।

রক্তাক্ত দেহ, পড়ে গেল সিমেন্টের মেঝের ওপর। জাইমে মিরো চাবি নিলেন, মৃতদেহের কাছ থেকে। অতি দ্রুত দুখানা কারাকক্ষ খুলে দিলেন। বাইরে শব্দ আরও-আরও উত্তেজিত।

এবার আমাদের যেতে হবে। জাইমে আদেশের সুরে বললেন।

রিকার্ডো মেলাডো, ওই মেশিনগানটা তুলে নিয়েছে। দেখছি কাজটা আপনি ভালোই করেছেন। আপনি তো আমাকে প্রায় ঘাবড়ে দিয়েছিলেন।

সে হাসার চেষ্টা করছে, কিন্তু আহত মুখে হাসি ফুটছে না।

–আর একটু দেরী হলে কী হত বলুন তো? যাক আমি কিন্তু ভয় পাইনি।

জাইমে মিরো অস্ত্র হাতে রাখলেন। আর এগিয়ে চললেন করিডর দিয়ে।

–জামবোরার কী হয়েছে?

–প্রহরীরা তাকে মেরে ফেলেছে, আঘাত করতে করতে। আমরা তার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছি। তাকে ইনফারমারিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মিথ্যে করে বলা হয়েছে, হার্ট অ্যাটাকে সে মারা গেছে।

সামনে তালা বন্ধ একটা লোহার দরজা।

এখানে একটু দাঁড়াও। জাইমে মিরো বললেন।

তিনি দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। ওদিকে যে প্রহরী ছিল তাকে বললেন- আমার কাজ হয়ে গেছে।

প্রহরী বলল- আপনি তাড়াতাড়ি করুন ফাদার। বাইরে পোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

বাকিটুকু সে শেষ করতে পারল না। জাইমের ছুরি অতি দ্রুত তার পেটে ঢুকে গেল। রক্ত ছিটকে এল, ওই হতভাগ্য প্রহরীর মুখ থেকে।

জাইমে বললেন– আরও তাড়াতাড়ি।

ফেলিক্স করপিও ওই প্রহরীর বন্দুকটা তুলে নিল। তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। বাইরে কী হয়েছে? পুলিশ ছুটোছুটি করছে। উন্মত্ত মানুষের চিৎকার। কেন? আর্তনাদ? কেউ বোধহয় এই ষাঁড়দের ছেড়ে দিয়েছে। একটা পাগল ষাঁড় এই বাড়িটার সামনে চলে এসেছে। পাথরের প্রবেশ পথটা ভেঙেচুরে দিয়েছে। আর একটা ষাঁড় ইউনিফর্ম পরা গার্ডের শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সামনে একটা লাল ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে সেটা সচল হবে। প্রচণ্ড গোলমাল। তিনজন মানুষ কোথায় চলে গেল, কেউ নজর করল না। কেউ দেখল না, কী ঘটেছে এখানে, তারা তখন ওই ঝঞ্ঝাট সামলাতে ব্যস্ত।

কোনো কথা না বলে জাইমে এবং দুই অপরাধী ট্রাকের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর জনাকীর্ণ রাস্তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আর এভাবেই! এভাবেই প্যারামিলিটারী পুলিশকে বোকা বানানো হল। সবুজ ইউনিফর্ম পরে তারা বৃথাই খোঁজাখুঁজি করেছে। তাদের মাথায় কালো চামড়ার টুপি। তারা উন্মত্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। কী হবে? সকলকেই অসহায় বলে মনে হচ্ছে। এখানে সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকায়। মানুষজন বিভিন্ন দিকে ছুটোছুটি করছে। উন্মাদ ষাঁড়দের হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা

করছে। সমস্যা আরও বাড়ছে। আরও–আরও বেশি মানুষ পদপৃষ্ট হচ্ছে। রক্ত ঝরছে। মৃত্যুর ঘটনা। এক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। তারা চাপা পড়েছে মানুষের পায়ের তলায়।

জাইমে ওই বিশৃঙ্খলতার দিকে তাকালেন? বললেন– আহা, এমন ঘটনা কেন ঘটল? তিনি শব্দ করলেন। তিনি এক মনে তাকিয়ে থাকলেন। এখানে কিছুই করার নেই। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। শোকবিহ্বল এই দৃশ্যগুলোকে না দেখাই ভালো।

ট্রাক পাম্পালোনা শহরের বাইরে চলে গেছে। দক্ষিণদিকে এগিয়ে চলেছে। শব্দ ক্রমশ কমে আসছে। দাঙ্গার চিহ্ন এখানে নেই।

–জাইমে আমরা কোথায় চলেছি। রিকার্ডো মেলাডো জানতে চেয়েছিল। টর্চের বাইরে একটা ভালো জায়গা আছে, নিরাপদ। আমরা সেখানে থাকব, সন্ধ্যে পর্যন্ত।

ফেলিক্স কারপিও মাঝে মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল।

জাইমে মিরো তার দিকে তাকালেন। তার মুখে করুণার আভাস। তিনি বললেন– বন্ধু, আমরা অতি শীঘ্র যেখানে পৌঁছে যাব।

মন থেকে পাম্পালোনার এই দুঃখজনক স্মৃতি কিছুতেই মুছছে না।

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। তারা টরের ছোট্ট গ্রামে চলে এসেছেন। একটা ফাঁকা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। গ্রামের একেবারে মধ্যে জাইমে মিরো দুজনকে নিয়ে এলেন।

মধ্যরাতে আপনাদের নিতে আসব? তাই তো? ড্রাইভার জানতে চাইল।

–হ্যাঁ, একটা ভালো ডাক্তার পাওয়া যাবে? জাইমে প্রশ্ন করলেন।

তিনজনে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। এটা একটা ফার্ম হাউস। ছোট্ট ছিমছাম অথচ আরামপ্রদ। এক কোণে ফায়ার চুল্লি আছে, লিভিং রুমের মধ্যে। টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজ দেখা গেল। জাইমে মিরো কাগজটা পড়লেন। আহা সম্ভাষণী শব্দবন্ধ বারে কয়েক বোতল মদ দেখা গেল। জাইমে মিরো মুখে মদ ঢালতে শুরু করলেন।

রিকার্ডো মেলাডো মন্তব্য করল– আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব। আপনি না থাকলে এতক্ষণে...

জাইমে গ্লাস তুললেন আসুন, আমরা স্বাধীনতার সপক্ষে জয়গান গাই।

হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল। জাইমে মিরো এগিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, একটা পাখি খাঁচার ভেতর ছটফট করছে। তিনি খাঁচাটা খুললেন। পাখিটাকে ভোলা জানলা দিয়ে উড়িয়ে দিলেন।

শান্তভাবে বললেন– যে কোনো জীবন্ত মানুষের স্বাধীনতা থাকা উচিত।

.

০২. মাদ্রিদ

প্রধানমন্ত্রী লিও পোলডো মার্টিনেজ ভীষণ রেগে গেছেন। মোটামুটি মাঝারি উচ্চতার মানুষ। চোখে চশমা আছে। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। জাইমে মিরোকে থামাতেই হবে। তিনি চিৎকার করলেন। তার কণ্ঠস্বর, তীক্ষ্ণ এবং উচ্চ।

আপনারা কি আমার কথার মানে বুঝতে পারছেন?

তিনি ওই ঘরে উপস্থিত ছ-জন মানুষকে উদ্দেশ্য করে বললেন আমরা একজন উগ্রপন্থীর সন্ধান করব। কিন্তু গোটা পুলিশ এবং মিলিটারী তার খোঁজ পাবে না। আমরা কি মুখের স্বর্গে বাস করছি?

মোনক্লোয়া প্যালেসে এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে প্রধানমন্ত্রী থাকেন এবং কাজ করেন। এটি হল মাদ্রিদ শহরের কেন্দ্র থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। কারটেরা দে গ্যালিসিয়া অঞ্চলে। এটা এমন একটি হাইওয়ে যার কোনো সংকেত চিহ্ন নেই। সবুজ ইট দিয়ে বাড়িটা তৈরি হয়েছে। লোহার ব্যালকনি আছে, আছে সবুজ জানালা ঢাকনা এবং প্রত্যেক কোণে প্রহরীদের থাকার জায়গা।

এটা এক গরম শুকনো দিন। বাতাস হলকা বহন করছে। যতদূর চোখ পড়ছে, শুধুই নিদাঘের তপ্ত নিঃশ্বাস। আর কিছু নেই। আর দেখা যাচ্ছে, একদল ভৌতিক সেনা বুঝি এগিয়ে চলেছে, ব্যাটেলিয়নের মতো।

–গতকাল মিরো পাম্পালোনাকে একটা রণক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। মার্টিনেজ অবাক হয়ে একথা বললেন। ঘুষি মারলেন ডেস্কের ওপর, তিনি দুজন কারারক্ষীকে হত্যা

করেছেন। জেলখানা থেকে দুই সন্ত্রাসবাদীকে বের করে নিয়েছেন। ইচ্ছে করে উন্মত্ত ষাঁড়গুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে অনেক সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এক মুহূর্ত সকলেই চুপচাপ, কেউ কোনো কথা বলতে পারছেন না।

যখন এই প্রধানমন্ত্রী অফিসে বসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন আমার প্রথম কাজ হল এই সব উগ্রবাদী সংগঠনগুলিকে ভেঙে দেওয়া। ইতিমধ্যে মাদ্রিদ অনেক রক্ত সহ্য করেছে, আমি দেশে এতগুলো উপদল থাকতে দেব না।

তিনি আশাবাদী। তবে স্বাধীনচেতা বাসকোস অন্য কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই শুরু হয়েছিল ব্যাপক বোমাবর্ষণ। একটির পর একটি ব্যাঙ্ক লুণ্ঠনের ঘটনা চোখে পড়েছে। ই টি এ সংস্থার সন্ত্রাসবাদীরা আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। শুরু হয় তাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ।

মার্টিনেজের ডানপাশে বসে থাকা মানুষটি শান্তভাবে বললেন আমি ওনাকে সনাক্ত করবই, আজ অথবা আগামীকাল, আমাকে একটু সময় দিন।

তিনি হলেন কর্নেল র‍্যামন আকোকা, জিওই-র প্রধান। এই সংস্থাটি স্থাপন করা হয়েছে। বাসকো উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি করার জন্য। আকোকাকে সংক্ষেপে এক দস্যু বলা যেতে পারে। বয়স ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেছেন। মুখে শীতল শান্ত আভা। চোখ দুটি কুতকুতে। এক সময় তিনি ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর অধীনে এক তরুণ অফিসার হিসেবে কাজ করেছিলেন, গৃহযুদ্ধের সময়। ফ্রাঙ্কো দর্শনে বিশ্বাস করতেন। এই দর্শন বলছে আমরা কেবল মাত্র ঈশ্বর এবং ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ থাকব।

আকোকাকে এক প্রশিক্ষিত আধিকারিক বলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন ফ্রাঙ্কোর ডানহাত। এই কর্নেলের মধ্যে একটা লৌহকঠিন নিয়মশৃঙ্খলা আছে। যারা আইন মেনে চলতে ভালোবাসে না, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর শাস্তি জারি করেন। গৃহযুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলির সাক্ষী তিনি। তিনি দেখেছেন, জাতীয়তাবাদী সন্ধি দলগুলি কীভাবে রাজতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করছে। কোনো কোনো জেনারেল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ভূমির মালিকেরা নিজস্ব সংগঠন তৈরি করেছেন। চার্চের আধিপত্যের অবসান ঘটে গেছে। ফ্যাসিবাদী দলগুলি জেগে উঠেছে। তিনি দেখেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের উত্থান। একদিকে গণতন্ত্রপ্রেমীরা, অন্যদিকে সমাজবাদীরা। সাম্যবাদী অথবা উদারনৈতিকতা। বাসকো এবং ক্যাটালন, একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন। বলা যেতে পারে, সেটা ছিল ভয়ংকর প্রহর, মৃত্যু নিয়ে মানুষ ছেলেখেলা খেলেছে। দেশে আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। দিনের পর দিন ধরে মৃত্যুর সংজ্ঞা শুধু বেড়েছে। এখন বাসকো আবার নতুন একটি রণক্ষেত্র খুলেছেন। হতাহতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

কর্নেল আকোকার অধীনে একটি অত্যন্ত প্রশিক্ষিত নির্মম সন্ত্রাসবিরোধী পুলিশবাহিনী আছে। তার অনুগামীরা মাটির তলায় কাজ করে। তারা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে। জনসমক্ষে নিজের মুখ দেখায় না। তাদের মনে অনুশোচনা নেই। ভয় শব্দটাকে তারা অভিধান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু, কে এই কাজটা করবে?

প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন। কর্নেলের ওপরেই এই কাজের দায়িত্ব দিলে বোধহয় ভালো হবে। প্রাইভেট লাইনে ফোন বেজে উঠেছে। বোঝা গেল, এটি কার কণ্ঠস্বর।

–জাইমে মিরোকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। উনি একটা ভীষণ সন্ত্রাসবাদী দলের সর্বাধিনায়ক। আমরা কর্নেল র‍্যামন আকোকাকে এই দায়িত্ব দেব। তাকেই আমরা এই বাহিনীর প্রধান করব। ব্যাপারটা বোঝা গেল?

-ঠিক আছে স্যার। আপনার আদেশ শিরোধার্য।

লাইনটা মরে গেল।

এই কণ্ঠস্বর হল ও পি ইউ এস-এর এক সদস্যের। এই সংস্থাটিকে আমরা এক গোপন সংগঠন বলতে পারি। এই সংস্থার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিরা আছেন। আছেন ব্যাঙ্কের অধিকর্তারা, আইনজীবীরা, শক্তিশালী করপোরশেনের প্রধানরা, সরকারী মন্ত্রীরা। এই সংস্থাটি স্থাপন করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার জন্য। এই সংস্থাটির কোষাগারে অনেক অর্থ আছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থের ধারাবাহিক স্রোত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে এত টাকা আসছে, তা একটা রহস্য। কেউ কেউ বলে থাকেন, এখানে দুর্নীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে। তবে এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করার সাহস করেন না।

শেষ অব্দি প্রধানমন্ত্রী কর্নেল আকোকাকেই প্রধান আধিকারিক নিযুক্ত করলেন। তাঁকে নানা ধরনের উপদেশ দেওয়া হল। বলা হল, যে করেই হোক ওই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। ইতিমধ্যেই ব্যবস্থাটা হাতের বাইরে চলে গেছে। এবার কর্নেল আকোকা

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

রণক্ষেত্রে নামলেন। ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু করলেন। প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন, বাসকো এবার ঠান্ডা হয়ে যাবেন। যেভাবে প্রতি আক্রমণ শুরু হয়েছে। শেষ অব্দি বাসকোর কোনো কোননা অনুগামীকে পালোনার কাছে কারারুদ্ধ করা সম্ভব হল। তাদের ফাঁসি দেওয়া হল। কর্নেল আকোকা প্রথম রাউন্ডে জিতে গেলেন। তিনি চেয়েছিলেন ওই ফাঁসির ঘটনা যেন সকলে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। নৃশংসভাবে ওদের হত্যা করা হবে। জনমানসে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া পড়বে। কেটে দেওয়া হবে ওই অপরাধীদের মেরুদণ্ড, রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

জাইমে মিরা এখনও পর্যন্ত অধরা থেকে গেছেন। কর্নেল আকোকা রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেন।

কর্নেল আকোকা চিৎকার করে বলেন- আমি ওঁর মাথা চাই। ওনার মাথাটা কেটে ফেলো। তাহলে বাসকোর আন্দোলন থেমে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী মাঝে মধ্যেই বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করছেন, তিনি একটা সরল সত্য স্বীকার করেছেন। তা হল জাইমে মিয়োর অনেক অনুগামী আছে। অনেকের চোখে তিনি দেবদূত। কিংবদন্তীর মহানায়ক। তাই অত্যন্ত বিপজ্জনক।

প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন- কর্নেল আকোকাকে আরও তৎপর হতে হবে।

প্রাইমো কাসাভো, পুলিশ বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল কথা বলছেন– মাননীয় মহাশয়, পাম্পলোনাতে যা ঘটে গেছে তা একটা দুঃস্বপ্ন। জাইমে মিরো...

-হ্যাঁ, আমি জানি। প্রধানমন্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, আমি জানতে চাইছি কোথায় উনি আছেন?

উনি কর্নেল আকোকার দিকে তাকালেন।

উনি কোথাও লুকিয়ে আছেন। কর্নেল বললেন, তার কণ্ঠস্বরে অভিজ্ঞতার সুর– আমি আপনাকে আরও একবার মনে করাতে চাইছি যে, আমরা শুধু একজন মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিনি। আমরা বাসকোর অনুগামীদের সাথে লড়াই করছি। তারাই জাইমে মিরোকে সাহস জুগিয়ে চলেছে। তারাই ওই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। দিচ্ছে খাদ্য এবং অস্ত্র। হ্যাঁ, ওই মানুষটি সকলের চোখে হিরো। কিন্তু ভয় পাবেন না, কিছুদিনের মধ্যেই তাকে আমরা ফাঁসির মঞ্চে ঝোলাব। অবশ্য তার আগে বিচারের প্রহসন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী এখনও বুঝতে পারছেন না, কীভাবে নির্দেশনামা জারি করা যেতে পারে। তিনি কি স্নায়ুরোগে ভুগছেন? কর্নেল সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বললেন– ভদ্রমহোদয়রা, আরও–আরও তৎপর হতে হবে আমাদের।

এবার সকলে চলে যাবেন। কিন্তু কর্নেল আকোকা এখন যাবেন না। তাকে থাকতে হবে। লিও পোলডো মার্টিনেজ যাবার জন্য উঠলেন। তিনি বললেন–আমরা স্প্যানিয়ানদের সাহায্য নিতে পারি, তাদের দলভুক্ত করলে কেমন হয়?

আকোকা বললেন না, তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য তৎপর। তারা দেশের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, আছে নিজস্ব পতাকা।

-না, যতদিন ধরে আমি এই অফিসে বসে থাকব, আমি স্পেনকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেব না। সরকারের প্রধান হিসেবে এটা আমার একমাত্র কর্তব্য। তাই ওদের আমরা একধরনের বিপ্লবী ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।

নৈঃশব্দ্য ভেসে এল, আমায় ক্ষমা করবেন, মাননীয় মহাশয়। বিশপ আইবানেজ এসেছেন।

–ওনাকে আমার কাছে পাঠান।

কর্নেলের চোখ ছোটো হয়ে এল। আপনি সুনিশ্চিত থাকলে পাদরিরা এই ঘটনার অন্তরালে আছেন। এবার ওঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখব, চার্চের ভূমিকা সত্যিই বিতর্কিত। কর্নেল আকোকা এই ব্যাপারে চিন্তা করলেন। গৃহযুদ্ধের শুরুতে ক্যাথোলিক চার্চ জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে সাহায্য করেছে। পোপ নিজে ফ্রাঙ্কোর সমর্থক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নামে এই কাজ করেছেন। যখন বাসকো বিভিন্ন গির্জা এবং মনেস্ট্রিগুলিকে আক্রমণ করতে থাকলেন, চার্চ তার সমর্থন তুলে নিল।

-বাসকো এবং ক্যাটালানসকে আরও বেশি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। পাদরিরা এই আবেদন করেছিলেন। বলা হয়েছিল, বাসকো যাতে পারিদের হত্যা করতে না পারেন, সেদিকে নজর দিতে হবে।

ফ্রাঙ্কো এই কথা শোনেননি, তিনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন–চার্চ এসে আমার সরকার পরিচালনা করবে? আমি এক নীরব দর্শক হয়ে অপেক্ষা করব?

শুরু হল ব্যক্তিত্বের সংঘাত। আরও–আরও বেশি গির্জা এবং মনেস্ট্রি ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হল। উপাসিকা এবং যাজকদের হত্যা করা হল। বিশপদের গৃহে অন্তরীণ করা হল। সমস্ত স্পেন জুড়ে শুরু হল অরাজকতা। যাজকদের ওপর কর ধার্য করা হল, বলা হল, মিথ্যে উপদেশ দেবার জন্য সরকারী তহবিলে অর্থ জমা রাখতে হবে। এবার চার্চ আবার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে, তারা ফ্রাঙ্কোকে ভয় দেখাতে থাকে। শেষ অব্দি ফ্রাঙ্কোর আক্রমণের তীব্রতা কমে আসে।

আকোকা ভাবছিলেন, চার্চের ভূমিকা সত্যিই সন্দেহজনক। ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর চার্চের প্রভাব প্রতিপত্তি আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

উনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকালেন এবার বিশপের কাছে পরিষ্কার করে জানতে চান, স্পেনের আসল শাসক কে?

বিশপ কালগো প্রবেশ করলেন– রোগা পাতলা চেহারা, মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছাপ। মাথায় একগাদা সাদা চুল। চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি তার চশমার আড়াল থেকে এই দুটি মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বললেন– শুভ সন্ধ্যা।

কর্নেল আকোকা ভাবলেন, এখনই কথা বললে কেমন হয়? ওই ভদ্রলোককে দেখা মাত্র তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে সামনে বোধহয় কসাই মাংস ঝুলিয়ে রেখেছে। মুখটা তার বিকৃত হয়ে গেল।

বিশপ এসে দাঁড়ালেন। বসার জন্য এখনও আমন্ত্রণ পাননি তিনি। আমন্ত্রণ এলো না। তাকে কর্নেলের সাথে পরিচিত করানো হল না, ব্যাপারটা সত্যি ভাবতে খারাপ লাগছে।

প্রধানমন্ত্রী আকোকার দিকে তাকালেন। কিছু বলার কথা ভাবতে থাকলেন।

আকোকা কাটা কাটা কণ্ঠস্বরে বলতে থাকেন আমাদের কাছে কিছু খারাপ সংবাদ এসেছে। বাসকো বিপ্লবীরা ক্যাথোলিক মনেস্ট্রিতে গোপন অধিবেশন ডেকেছে। আমরা আরও জানতে পেরেছি যে, বিভিন্ন চার্চে ওই সন্ত্রাসবাদীরা আশ্রয় পেয়েছে।

কণ্ঠস্বরে ইস্পাতের কাঠিন্য।

–আপনারা স্পেনের শত্রুদের সাহায্য করছেন, কাজেই আপনাদের আমরা স্পেন জনগণের শত্রু বলতে পারি।

বিশপ ইবানে অবাক চোখে তাকালেন। লিও পোলডো মার্টিনেজের দিকে তাকিয়ে বললেন– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা রেখে আমি বলছি, আমরা সকলে স্পেনের সন্তান। বাসকো কিন্তু আপনার শত্রু নয়। তারা একধরনের স্বাধীনতা চাইছে।

আকোকা গর্জন করে উঠলেন– চাইছেন, না, জোর করে কেড়ে নিতে চেষ্টা করছেন। দেশের এখানে সেখানে অরাজকতার আবরণ। একটির পর একটি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে। পুলিশদের হত্যা করা হচ্ছে। আর আপনি বলছেন, তারা দেশের শত্রু নয়? এ আপনার কী বিচার?

-হ্যাঁ, আমি বলছি, এই কাজ করতে গিয়ে তারা কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কিন্তু কেন? ভেবে দেখুন তো, কী তাদের উদ্দেশ্য?

তাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই, তারা নিজেদের উদরপুর্তি করতে চাইছে। স্পেনের ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না। এই জন্যই আমাদের এক মহান লেখক বলেছেন স্পেনের কেউই সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না। প্রত্যেকটা দল নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উদগ্রীব। একদিকে পাদরি, অন্যদিকে বাসকো, এপাশে ক্যাটালোন। একে অন্যকে আঘাত করার চেষ্টা করছে।

বিশপ বুঝতে পারলেন, কর্নেল আকোকার কথার মধ্যে ভুল আছে। উনি অরটেগা গাসেটের উক্তি মিথ্যেভাবে বলেছেন। সম্পূর্ণ উক্তিটা বললে আমরা বুঝতে পারতাম, ওই লেখক সশস্ত্র বাহিনী এবং সরকারকে সাবধান করেছেন। তবে তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি। ভদ্রলোক প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকালেন। ভেবেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে তাত্ত্বিক শব্দ বেরিয়ে আসবে।

মাননীয় মহাশয়, ক্যাথোলিক চার্চ...

প্রধানমন্ত্রীর মনে হল, আকোকা জবাব দিতে পারবেন।

–বিশপ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। তাত্ত্বিক দিক থেকে সরকার ক্যাথোলিক চার্চকে সাহায্য করবে, একশো শতাংশ সাহায্য।

কর্নেল আকোকা আবার বলতে থাকেন। কিন্তু আমরা আপনাদের দ্বারা কোন ধ্বংসাত্মক কাজ হতে দেব না। অনুগ্রহ করে চার্চকে বলুন এসব ব্যাপারে মাথা না ঘামাতে। কেন চার্চ মনেস্ট্রি আর কনভেন্ট আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে? যতদিন পর্যন্ত আপনারা বাসকোর সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেবেন, তাদের গোপন অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন, ততদিন ভয়ংকর ঘটনার জন্য আপনাদের তৈরি থাকতেই হবে।

–আমার মনে হচ্ছে এ বিষয়ে অতিরঞ্জিত খবর এসেছে, বিশপ বললেন, ঠিক আছে, আমি এই ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখব।

প্রধানমন্ত্রী বললেন– আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, বিশপ। তা হলেই হবে।

প্রধানমন্ত্রী মার্টিনেজ এবং কর্নেল আকোকা তাকিয়ে থাকলেন, বিশপ চলে যাচ্ছেন।

–আপনার কী মনে হল?

মার্টিনেজ জিজ্ঞাসা করলেন।

উনি সব জানেন কিন্তু বললেন না।

প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তিনি বুঝতে পারছেন, চার্চকে নিয়ে ভবিষ্যতে আরও সমস্যা হবে। একেই চারিদিকে নানা সমস্যা, তার ওপর একটা নতুন ঝামেলা এসে গেল।

যদি চার্চ বাসকোকে সাহায্য করে, তাহলে আমরা চার্চের বিরুদ্ধাচরণ করব। কর্নেল আকোকার কণ্ঠস্বর আরও কঠিন। আমি আপনাকে বলছি, আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি ওই বিশপকে সাংঘাতিক শিক্ষা দেব।

প্রধানমন্ত্রী তাকিয়ে থাকলেন। বোঝা গেল, ওই মানুষটির চোখে মুখে এক ধরনের উগ্র প্রতিশোধ ধিকধিক করে জ্বলে উঠেছে। উনি সাবধানে বললেন– সত্যি-সত্যি আপনি এই সংবাদ পেয়েছেন? উপাসনালয়গুলি কি সন্ত্রাসবাদীদের হয়ে কাজ করছে?

হ্যাঁ, মাননীয় মহাশয়।

কে সত্যি বলছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী জানেন, আকোকা চার্চকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। তবে চার্চ যদি এইভাবে বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে তাকে সহবত শেখাতেই হবে। কিন্তু দেখতে হবে কর্নেল আকোকা যেন তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের অপব্যবহার না করেন। প্রধানমন্ত্রী মার্টিনেজ বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আকোকা নৈঃশব্দ ভেঙে বললেন– যদি চার্চ ওই উগ্রবাদীদের আশ্রয় দেয়, তাহলে শাস্তি দিতেই হবে।

প্রধানমন্ত্রী উদাসীনভাবে মাথা নাড়লেন– আপনি কীভাবে শুরু করতে চাইছেন?

–জাইমে মিরো এবং তার অনুগামীদের গতকাল আভিলাতে দেখা গেছে। তারা কোনো একটি কনভেন্টে লুকিয়ে আছেন বলে আমার স্থির বিশ্বাস।

প্রধানমন্ত্রী এবার মনস্থির করে বললেন- তাহলে অনুসন্ধান শুরু করুন।

এই ছোট্ট উক্তি যে ঘটনা পরাম্পরার জন্ম দিয়েছিল, তা সমস্ত স্পেনের বুকে একটি আতঙ্ক স্বরূপ বিরাজ করে। শুধু স্পেন নয়, সারা পৃথিবীর মানুষ শিহরিত হয়ে ওঠে।

.

০৩. আভিলা

নীরবতার সাথে আমরা শান্ত তুষারের পতনের তুলনা করতে পারি, কোমল এবং শব্দহীন। আহা, বুঝি নিদাঘ তপ্তদিনে বাতাসের ফিসফিসানি, আকাশের বুকে খসে পড়া। তারপর নীরবতা।

সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট, এটি প্রাচীর আচ্ছাদিত আভিলা শহরের অন্যতম সম্পদ। এটি হল স্পেনের সবথেকে উঁচু শহর। মাদ্রিদ থেকে ১১২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। কনভেন্টের সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছে। ১৬০১ সালে যে অনুশাসন চালু করা হয়েছিল, এখনও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। কত শতাব্দী কেটে গেছে, তবুও এখানে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা হয়। এখানে আছে কঠিন নিয়মনীতি। আছে নীরবতা, নীরবতার মধ্যেই এখানকার বাসিন্দারা আত্মার সন্ধানে মগ্ন থাকেন।

এই কনভেন্টকে আমরা পাথরের নির্মিত শান্ত শীতল বাড়ির সমাহার বলতে পারি, বিশাল এক ভূমিখণ্ডের মধ্যে তাদের অবস্থিতি। মাঝে আছে বেশ কয়েক বিঘা খোলা জমি, সূর্যের আলো পড়ে। আর আছে উপাসিকাদের বসবাসের জন্য কয়েকটি বাড়ি। সকাল থেকে সন্ধ্যে তারা জীবনের নিয়মনীতি পালন করেন। এই কনভেন্টে চল্লিশজন ধর্ম্যাজিকা আছেন। তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। সৎ সুন্দর জীবন যাপন করেন। আভিলার এই কনভেন্টটি সাতটি কনভেন্টের অন্যতম। আগে এখানে কয়েকশো কনভেষ্ট ছিল। কিন্তু সিভিল ওয়ার তার সবকটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মাত্র এই কটি কনভেন্ট এখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে।

সিস্টারসিয়ান কনভেন্টের ভেতর শুধু প্রার্থনার শব্দ শোনা যায়। এটি হল এমন একটা জায়গা যেখানে অন্যায় অত্যাচার নেই। এখানে মানুষে মানুষে হিংসা নেই। মনে হয় মানুষের মন থেকে হিংসাকে চিরদিনের জন্য দূরীভূত করা হয়েছে। সিস্টারসিয়ানের জীবন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মানুষ এখানে সন্তুষ্ট। সামান্য উপাদানে জীবন কাটাতে ভালোবাসেন, আহা, এ বুঝি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বর্গীয় দ্বীপ।

সব সিস্টাররা একই ধরনের পোশাক পরে থাকেন। পোশাকের মধ্যে কোনো বাহুল্য নেই। কয়েক শতাব্দী ধরে একই ফ্যাশান তারা পালন করছেন। একধরনের আলখাল্লা, ক্লোক এবং মাথায় টুপি। সরলতা ও পবিত্রতার প্রতীক। আছে লিনেন টিউনিক, যা দেখলে বুঝতে পারা যায়, এখানে অস্থিরতার প্রবেশ নিষেধ। শীতের দিনে তারা গায়ে শাল জড়িয়ে রাখেন। সকাল থেকে পরিশ্রম করেন। পরিশ্রমের চিহ্ন মুখে আঁকা থাকে।

.

এই কনভেন্টের ভেতর আছে অভ্যন্তরীণ নিয়মনীতি। চারপাশে বিরাজ করছে নিয়মশৃঙ্খলা। বেশ কয়েকটি বড়ো বড়ো ঘর, প্যাসেজ ওয়ে, সিঁড়ি, ডাইনিং রুম, কমিউনিটি রুম, ছোটো ছোটো কক্ষ এবং চ্যাপেল। সব জায়গাতে শীতলতার ছোঁয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। দরজা-জানালায় পর্দা ঝুলছে। বাইরে উঁচু পাঁচিলওয়ালা বাগান। প্রত্যেকটা দরজার ওপর আছে লোহার দণ্ড, কোনো কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না ভেতরে কী হচ্ছে। ডাইনিং হলটি বেশ লম্বা। এর জানালায় খড়খড়ি আছে, জানলায় পর্দা ঝুলছে। মোমদানিতে মোম রয়েছে। পুরোনো মোমদানি। সিলিং-এ এবং দেওয়ালে ভৌতিক ছায়া কাঁপছে।

মনে হয়, চারশো বছর এই প্রাচীরের ওপর দাগ কাটতে পারেনি। কনভেন্ট একইরকম আছে, শুধু বাসিন্দাদের মুখগুলো পালটে গেছে। সিস্টারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই। তারা দরিদ্রতা ভালোবাসেন। দরিদ্রতাকে মহান যিশুখ্রিস্টের অবদান হিসেবে গণ্য করেন।

চার্চের সর্বত্র ছিমছাম পরিস্থিতি। মনে হয়, এখানে বিরাজ করছে নিদারুণ শান্তি। কিন্তু এখানে এক অমূল্য সম্পদ আছে, নিরেট সোনার তৈরি ক্রশ, অনেক দিন আগে এক ধনী ভক্ত উপহার দিয়েছিলেন। এটিকে রিফ্যাক্টরি ক্যাবিনেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা আছে। আর বেদীতে ঝুলছে একটি সাধারণ কাঠের তৈরি ক্রুশ চিহ্ন।

মহান ঈশ্বরের সাথে যারা জীবন ভাগ করে নিয়েছেন, তারা একত্রে দিন কাটান। একসঙ্গে কাজ করেন, একসঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করেন, একসঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

কোনো ঘটনা তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। তারা খুব কম কথা বলেন। কিন্তু যখন পরম শ্রদ্ধেয় মাদার প্রাওরেস বেটিনা আসেন, তখন এইসব বাসিন্দাদের মধ্যে চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা যায়। তখন তারা একে অন্যের সাথে অতিরিক্ত কথা বলেন। তবুও তারা প্রাচীন সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেন। এই শব্দের ওপর বেশি জোর দেন।

মহান মাদারকে আমরা এক প্রবীণ নেত্রী বলতে পারি, সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে। মুখে এখনও যৌবনের উজ্জ্বলতা, সব সময় হাসিমুখে থাকতে ভালোবাসেন। অসীম শক্তির অধিকারিনী। জীবনে কত আনন্দ আছে, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তার সমস্ত জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তিনি এই সব উপাসিকাদের পরম রক্ষাকর্ত্রী। তিনি মনে করেন, আরও বেশি শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারব।

উপাসিকারা করিডর দিয়ে হেঁটে যান। মাটির দিকে আবদ্ধ তাদের চোখ। হাত দুটি জড়ো করা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকের কাছে ধরা আছে। এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করেন। কথা বলেন না। কেউ কাউকে চিনতে পারেন না, এমন ভঙ্গিমা। কনভেন্টে যে শব্দ শোনা যায়, সেটি হল ঘণ্টাধ্বনি। ভিক্টর হুগো যাকে বলেছেন- স্টেপেলসের অপেরা।

এই সিস্টাররা এসেছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের আগমন। তবে সকলেই যে ওই পরিবারভুক্ত এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেকে ছিলেন অভিজাত পরিবারের কন্যা, কেউবা কৃষক তনয়া, কেউবা কোনো সেনাপতির মেয়ে। তারা এই কনভেন্টে এসে সবকিছু ভুলে গেছেন। ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ এখানে নেই, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বিভাজন রেখা মুছে গেছে। দুঃখিত অথবা

উল্লসিত কোনো ভেদাভেদ এখানে মানা হয় না। ঈশ্বরের চোখে তারা সকলেই সমান। যিশুর সঙ্গে তারা সকলে এক আধ্যাত্মিক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ।

এখানকার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা তাদের আকর্ষণ করে। শীতকালের বাতাস তীক্ষ্ণ ছুরি হয়ে আক্রমণ করে। দিনের আলো ক্রমশ নিভে আসে। জানালার মধ্যে দিয়ে অন্ধকার ঘনীভূত হয়। ধর্ম যাজিকারা পোশাক পরে খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়েন। গায়ের ওপর কুটকুটে কম্বল চাপা দেওয়া হয়। প্রত্যেকের জন্য একটি ছোট্ট কক্ষ নির্দিষ্ট করা আছে। সেখানে একটা ঠকঠকে চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। নেই আর কোনো উপকরণ। দৈনন্দিন জীবনের ওপর দারিদ্রতার ছাপ। বেসিন আছে, মেঝের এককোণে, মাটির তৈরি মগ আছে। কোনো উপাসিকা অন্য উপাসিকার ঘরে প্রবেশ করতে পারেন না। একমাত্র মহান মাদার বেটিনা সব জায়গায় যেতে পারেন। বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধু কাজ আর প্রার্থনা। কাজের মধ্যে কী আছে? সেলাই বোনা, বই বাঁধাই । করা, মেশিনে উল বোনা, রুটি তৈরি করা, প্রত্যেককে নিয়মমতো দিনে আট ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এই কাজগুলোকে আবার নানা নামকরণে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে হয়।

এবার আমরা চার্চের নির্দিষ্ট নিয়মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমেই ম্যাশনের কথা বলতে হবে। এই কাজ শুরু হয় একেবারে ভোরবেলা। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। তখন ঘুমিয়ে থাকেন। আবার কিছু মানুষ তখন পাপ কাজে লিপ্ত হয়।

লাউডস নামে পরবর্তী পর্বটি শুরু হয় দিন সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এরপর মার্টিন্স। নামে আর একটি কাজ। তখন সূর্য মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

প্রাইমকে বলা হয় ওই চার্চের সকালবেলার প্রার্থনা। ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়- হে মহান দেবতা, আজকের দিনটি যেন আমরা ভালোভাবে কাটাতে পারি। সকাল নটায় টেরসের আসর বসে। সেন্ট অগাস্টাইন মহান আত্মাকে ডেকে পাঠান।

সেকটের আসর বসে এগারোটা বেজে তিরিশ মিনিটে। মন থেকে কামনা-বাসনা দূর করার জন্যই এই প্রার্থনা সভা।

বিকেল তিনটের সময় যে প্রার্থনা তাকে বলে নান। এই মুহূর্তটিকে আলাদাভাবে মনে রাখা হয়। কারণ এই মুহূর্তেই মহান খ্রিস্টের মৃত্যু হয়েছিল। চার্চের বিকেলের অধিবেশনকে ভেসপারস বলা হয়। দিন শেষ হয়ে গেল। রাত্রি আসছে। তার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে।

কমপ্লাইন হল দিনের শেষ অধিবেশন। রাত্রির জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। মৃত্যুর জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষা। এভারেই তো সবকিছু শেষ হয়ে যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার কিছু নিত্যনতুন নিয়মের ব্যবস্থাপনা করা হয়। কিন্তু সিস্টারসিয়ান কনভেন্টে সেই পুরোনো নিয়মটাকেই মেনে চলা হচ্ছে। সপ্তাহে একদিন বিশেষ অধিবেশন বসে। সেদিন আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠতে হয়। সেদিন এই সন্ন্যাসিনীরা শরীরে যন্ত্রণা দেন। তারা আঙুলের ভেতর উঁচ ফুটিয়ে দেন। তারা বারো

ইঞ্চি লম্বা ব্লেড দিয়ে নিজেদের আঘাত করতে থাকেন। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠেন। এইভাবেই তারা যন্ত্রণা দগ্ধা হতে ভালোবাসেন। তখন শোনা যায় সিস্টারসিয়ান চার্চের মঠাধ্যক্ষের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

তিনি বলতে থাকেন চোখ বন্ধ করে একবার ভেবে দেখো তো, মহান যিশুখ্রিস্টকে কীভাবে আহত করা হয়েছিল। সেই আঘাত অনুভব করার জন্যই আমরা আমাদের দেহকে এইভাবে ক্ষত-বিক্ষত করছি।

আমরা এই জীবনটাকে বন্দীজীবন বলতে পারি কি? কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের মুখের দিকে তাকালে, আপনি প্রত্যক্ষ করবেন, সেখানে অলৌকিক আভার প্রজ্জ্বলন। বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে তারা বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। তারা শারীরিক প্রেমকে দূরে বিসর্জন দিয়েছেন। নিজস্ব বলতে কোনো কিছু নেই। নির্বাচনের স্বাধীনতা নেই, তবে লোভ এবং প্রতিযোগিতার আসর থেকে তারা কি সত্যি সত্যি দূরে চলে গেছেন? ঘৃণা এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ? আমরা জানি না বাইরের পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে লড়াই চলেছে, সেই লড়াই থেকে এরা কি সত্যি সত্যি দূরে? এই কনভেন্টের মধ্যে এলে মনে হয়, এখানে : বুঝি শুধুই আনন্দের ঝরনা ধারা, ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হবার এক ঐকান্তিক প্রয়াস। এখানে বিরাজ করছে শান্ততা, এবং নীরবতা। চার দেওয়ালের মধ্যে অন্য এক পৃথিবী। এখানে হৃদয় আরও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি কেউ এই কনভেন্টকে একটি জেলখানার সঙ্গে তুলনা করতে চেষ্টা করেন, তাহলে এটিকে আমরা মহান ঈশ্বরের নিজস্ব কারাগার বলব। অথবা বলব, এটি হল স্বর্গের ইডেন উদ্যান। এখানে চিরন্তনতা বিরাজ করছে। যারা এখানে এসেছেন, তারা ইচ্ছে করেই এই অবস্থাকে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং তাদের মনের মধ্যে কোনো অনুশোচনা নেই।

.

কনভেন্টের বেলের শব্দে সিস্টার লুসিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ দুটি খুললেন। তাকালেন দুরের দিকে। এক মুহূর্তে তার মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অনুরণন। যে ছোট্ট কক্ষে তিনি শুয়েছিলেন, সেটি এখনও অন্ধকারে ঢাকা। সকাল তিনটে, বেল বাজছে, এবার বোধহয় কাজ শুরু হবে। এখনও সারা পৃথিবী অন্ধকারের ওড়না ঢেকে শুয়ে আছে।

শিট, এই রুটিনটা আমাকে মেরে ফেলবে, সিস্টার লুসিয়া ভাবলেন।

তিনি তার ছোট্ট আরামবিহীন খাটে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। একটি সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। উদাসীনভাবে নিজেকে শয্যা থেকে তুলে আনলেন। ভালো লাগছে না এইভাবে শুয়ে শুয়ে দিন কাটাতে। আহা, একসময় রোমে থাকার সময় কত সুন্দর সুন্দর পোশাক পরতেন। গেস্টাডের সেই দিনগুলি মনে পড়ছে। ভ্যালেন্টিনসের কথা মনে পড়ছে, আর্মানিস এবং জিয়ানিস।

সিস্টার লুসিয়া একটা শান্ত পদধ্বনি শুনতে পেলেন। উপাসিকাদের চলাচল শুরু হয়েছে। তারা এবার প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়াবেন। উদাসীনভাবে তিনি বিছানা গুটিয়ে রাখলেন। লম্বা করিডর দিয়ে হেঁটে গেলেন। ইতিমধ্যে সেখানে ধর্মযাজিকাদের ভিড় লেগেছে। সকলের মুখ মাটির দিকে নামান। তারা চ্যাপেলের দিকে এগিয়ে চলেছেন। মনে হচ্ছে, এরা বুঝি একদল পেঙ্গুইন, সিস্টার লুসিয়া ভাবলেন। এই মহিলারা কী জীবন কাটাচ্ছেন? যৌন উত্তেজনা নেই, ভালো পোশাক পরছেন না, ভালো খেতে

পারছেন না, এইসব জিনিস ছাড়া কেন বেঁচে আছেন? কীসের আশায়? নিকুচি করেছে এই যাচ্ছেতাই নিয়মনীতির।

যখন সিস্টার লুসিয়া প্রথম এই কনভেন্টে প্রবেশ করেছিলেন, পরম শ্রদ্ধেয়া মাদার তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- এখানে তোমায় কতগুলো নিয়ম মনে রাখতে হবে। সব সময় হাত জড়ো করে রাখবে। ছোটো ছোটো পা ফেলবে। ধীরে ধীরে হাঁটবে। কখনও অন্য কোনো সিস্টারের চোখের দিকে চোখ মেলে দেবে না। তাদের অবলোকন করবে না। কথা খুব কম বলবে। মনে রাখবে, তোমার কান দুটি শুধু ভগবানের কথা শোনার জন্য উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

–হ্যাঁ, পরম শ্রদ্ধেয়া মাদার।

পরবর্তী মাসে লুসিয়ার প্রশিক্ষণ শুরু হল।

যারা এখানে আসে, তারা একে অন্যের নাম পর্যন্ত জানবে না। ঈশ্বরের সঙ্গেই আমাদের সংযুক্তি মনে রেখো। আত্মাকে জাগাতে হলে নৈঃশব্দ্যের আবরণ চাই। আমরা ঈশ্বরের সাথে এক হব, তাই নীরবতার মধ্যে দিয়ে সময় কাটবে।

-হ্যাঁ, মহামান্যা মাদার।

সবসময় চোখের তারায় নীরবতার চাউনি মেলে দেবে। অন্য কারোর দিকে তাকাবে না। তাহলে তুমি এক অদ্ভুত দৃশ্যকল্প দেখবে।

-হ্যাঁ, মহামান্যা মাদার।

–তোমায় প্রথম যে শিক্ষা দেব, তা হল অতীতকে ভুলতে হবে। পুরোনো অভ্যেসকে পাল্টাতে হবে। পার্থিব সম্পদের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকা চলবে না। অতীতের কোনো ছবি যেন তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করতে না পারে, দেখতে হবে। তুমি মনকে আরও পবিত্র করবে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে পাল্টাবে। নিজেকে ভালোবাসবে। আত্মবিশ্বাসে মেতে উঠবে। ব্যাপারটা সহজে আসবে না। অতীতের ঘটনা আমাদের নানাভাবে বিব্রত করে। অতীতের কোনো অপরাধবোধ মনকে আচ্ছন্ন করে। দেখবে, তুমি যদি এই নিয়মগুলি পালন করো, তাহলে অচিরেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাবে। ঈশ্বরের পবিত্র আভায় তোমার চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তুমি তোমার পাপগুলিকে ভুলে যাবার চেষ্টা করবে, ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো দিন পাপকাজ করতে না পারো, সেদিকে সচেষ্ট হবে।

-হে মহামান্য মাদার, আপনার সব কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সঙ্গে লড়াই করবে। জানোত, জন অফ দ্য ক্রুশ বলেছিলেন, রাত্রি এইসব কামনামদির মুহূর্তগুলিকে নিয়ে আসে।

-হ্যাঁ, মহামান্য মাদার।

প্রত্যেক উপাসিকা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বিচরণ করবে। মনে হবে, তুমি যেন স্বর্গেই পৌঁছে গেছে। এই পবিত্র সুন্দর নীরবতা তোমাকে আরও আনন্দ দেবে। তুমি তোমার মনের

ভেতর একটা আলোকশিখা দেখতে পাবে। মনে হবে, ঈশ্বর তোমার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন, অথবা তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারছ।

প্রথম মাস শেষ হয়ে গেল। লুসিয়া তার প্রতিটি শপথকে মনে রেখেছেন। এবার আনুষ্ঠানিক উৎসব শুরু হবে। তার মাথার চুল কেটে দেওয়া হল। ভয়ংকর একটা অভিজ্ঞতা। এই কাজটা মহামান্য মাদার নিজের হাতে করেন। তিনি লুসিয়াকে তার অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন। তাকে বসতে আদেশ করলেন। লুসিয়ার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। লুসিয়া কিছুতেই টের পেলেন না, শুধু কঁচির কচকচানি শব্দ শুনতে পেলেন। বুঝতে পারলেন, তার মাথা থেকে কিছু একটা খসে পড়ল। তিনি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন এই ব্যাপারটা ভালোই হল। এতে ছদ্মবেশ ধারণ করা সহজ হবে। আমি তো এটাই চেয়েছিলাম, চুল ভবিষ্যতে বেড়ে যাবে। লুসিয়া ভেবেছিলেন, এবার আমাকে এইভাবেই থাকতে হবে। আমি বোধহয় একটা ডানাছাটা মুরগি।

লুসিয়া ওই কিউবিকলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাকে অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন। এটা হল সাপের গর্ত। এই মেঝের কোথাও কোনো ফাঁক ফোকর নেই। চারপাশে উঁচু জানালা। আকাশ চোখে পড়ে না। কিন্তু একটা খবরের কাগজ পেলে ভালো হত। কোথায় পাওয়া যায়? এই জায়গাটার কথা খবরের কাগজে কখনও লেখা হয় না। এখানে কোনো রেডিও আনার অনুমতি দেওয়া হয় না। টেলিভিশনের প্রবেশ নিষেধ। বাইরের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। এমনই বিচ্ছিরি নিয়ম।

লুসিয়া চিন্তা করতে থাকলেন। নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ডুবে গেলেন। কোথায় যোগাযোগ আছে? হাতের সাহায্যে। আর? এই ভালো মানুষটি সব কথা বলতে পারে? যখন ঝাটার দরকার হয়, লুসিয়া ডানহাতে বিশেষ ইঙ্গিত করেন। ডান আঙুলকে বাঁ আঙুলের দিকে নিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট বস্তুটি এসে যায়। যখন তার ওপর মহামান্যা মাদার রাগ করেন? তিনি লুসিয়াকে ডেকে পাঠান। তিনি তাঁর শরীরের সামনে তিনবার আঙুল ইঙ্গিত করেন। অন্য আঙুলগুলো ধরা থাকে। লুসিয়া বুঝতে পারেন, কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। মহামান্যা মাদার মাঝে মধ্যে তার ডানহাতের ওপর চাপ দেন, বোঝা যায়, তিনি লুসিয়াকে শাস্তি দিতে চাইছেন। লুসিয়া দোষ স্বীকার করে নেন। তিনি বুঝতে পারেন, এইভাবে কাজ করলে হয়তো তাঁকে এই কনভেন্ট থেকে বিতাড়িত করা হবে।

হায় যিশুর দোহাই, লুসিয়া ভাবলেন, এইভাবে মানুষ কি বেঁচে থাকতে পারে?

তারা চ্যাপেলে পৌঁছে গেছেন। ধর্মযাজিকারা নীরবতার মিছিল করে এগিয়ে চলেছেন। শতাব্দী প্রাচীন বেদীমূলে তারা পৌঁছে গেলেন। এখান থেকে যাত্রা শুরু হবে প্যাটানস্টারের দিকে। সিস্টার লুসিয়ার চিন্তা এখন আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বরের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি বাইরের জগতের কথা চিন্তা করছেন।

— আর একটা মাস, কিংবা দুমাস। এবার বোধহয় পুলিশ আর আমাকে খুঁজবে না। আমি তখন একেবারে স্বাধীন হব। এই পাগলাখানা থেকে আমাকে মুক্ত হতেই হবে।

সকালের প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে। সিস্টার লুসিয়া ডাইনিং রুমে চলে এলেন। নিয়মনীতি ভাঙবার চেষ্টা করলেন। রোজই তিনি এই নিয়ম ভাঙেন। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন

অন্য উপাসিকাদের মুখের দিকে। সেখানে শুধুই আনন্দের বিচ্ছুরণ। ভাবতে পারা যাচ্ছে না, ওরা কীভাবে এই জঘন্য নিয়মটাকে মেনে নিয়েছে?

সিস্টার বুঝতে পারলেন কোনো কোনো মুখে ঔৎসুক্য আছে, কোনো মুখ বয়সের ভারে ভারাক্রান্তা, কোনো মুখে লাবণ্যের ছটা, কেউ কেউ অত্যন্ত সুন্দরী। কেউ কুৎসিত। সকলকে এত খুশী দেখাচ্ছে কেন? এমন একটি মুখের সন্ধান লুসিয়া পেলেন না, যেখানে দুঃখের ছাপ আছে। সিস্টার থেরেসা, হা, ষাট বছর বয়স্কা এই ভদ্রমহিলার মুখখানি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তাকে সুন্দরী বলা যায় কি? তার শরীরের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক অলৌকিকতার স্পর্শ আছে। মনে হয় তিনি সর্বদা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসেন। মুখের কোণে হাসি ফুটেছে। ওই হাসির মধ্যে করুণা ঝরছে। লুকিয়ে আছে একটা গোপন অভিলাষ।

আর এক যাজিকাকে লুসিয়ার খুবই ভালো লাগে। তিনি হলেন সিস্টার গ্রাসিলা। এক অসাধারণ রূপবতী মহিলা। তিরিশ বছর বয়স হয়নি। অলিভ পাতার মতো তার ত্বকের রং, অসাধারণ দেহবল্লরী, চোখের মধ্যে কালো দাগ আছে, সেই দাগ সবসময় জ্বলে উঠছে।

ওই ভদ্রমহিলা একজন অভিনেত্রী হতে পারতেন, লুসিয়া ভাবলেন। ওনার গল্পটা কী? উনি কেন এমন একটি বন্দীশালায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন?

তৃতীয় যে ধর্মযাজিকা লুসিয়ার আগ্রহ কেড়ে নিয়েছিলেন, তিনি হলেন সিস্টার মেগান। নীল চোখের অধিকারিনী, চোখের তারা সোনালি, ছোটো ছোটো চিহ্ন আছে, খুব কমই

বয়স। সবেমাত্র কুড়ির গণ্ডি পার হয়েছেন, মুখের ওপর একটা অসাধারণ সারল্য খেলা করছে।

ওই মেয়েটি কেন এখানে এসেছেন? উনি এখানে থেকে কী করবেন? ওনার কি কোনো গোপন গল্প আছে? এমন কোনো অপরাধ, যা চেপে রাখার জন্য এই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দিনী জীবন যাপন করছেন? আরামবিহীন খাটে শুতে বাধ্য হচ্ছেন, সারাদিনে আট ঘণ্টা প্রার্থনা করছেন, আট ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রম করছেন, সামান্যক্ষণ ঘুমোচ্ছেন।

আমার মতো ওদের সকলের একটা অতীত ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসটা ভয়ংকর। তাই বোধহয় ওরা সকলে...

লুসিয়া ভাবলেন, আমার অবস্থান ওঁদের থেকে অনেক ভালো। আমি সারা জীবন এই বন্দীশালায় থাকব না। একমাস, অথবা দুমাস বাদে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব। হয়তো তিন মাস, লুসিয়া ভাবতে থাকেন। লুকিয়ে থাকার পক্ষে এটা একটা আদর্শ জায়গা। এতদিন আমি কেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। দুই-একমাস বাদে পুলিশ ভাববে, আমি মরে গেছি। আমি আমার টাকা নিয়ে সুইজারল্যান্ডে চলে যাব। তারপর এই জায়গা সম্পর্কে একটা বই লিখব। পৃথিবীর মানুষ এই কনভেন্টের আসল কথা জানতে পারবে।

.

ডেকে পাঠানো হল লুসিয়াকে মহামান্যা মাদারের কাছে। তাকে একটা কাগজে সই করতে হবে। তখনই তিনি ফাইলের দিকে তাকাবার ফুরসত পেলেন। কিন্তু মাদারের চোখে ধরা পড়ে গেলেন।

মাদার বেটিনা কঠিন চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন- তুমি কেন আমাদের নিয়মনীতি ভঙ্গ করছ বলল তো?

সিস্টার লুসিয়া হাতে ইঙ্গিত করে বললেন– হ্যাঁ, মহামান্যা মাদার। আমি অপরাধ স্বীকার করছি।

লুসিয়াকে আবার তার সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। করিডরে ধর্ম্যাজিকাদের পায়ে হাঁটার শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল, কাউকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। বারংবার কারোর পিঠে চাবুকের আঘাত। কেন? এই আঘাত সিস্টার লুসিয়াকে করা হয়েছে? নানেরা অবাক হয়ে গেছেন। তারা ঘুমোত পারছেন না, লুসিয়া কী অপরাধে অপরাধী!

রিফ্ল্যাক্টরিতে ওঁরা বসে আছেন। চল্লিশ জন যাজিকা। বিশাল একটি টেবিলের চারপাশে সিস্টারসিয়ানে খাবার বিতরণ শুরু হয়েছে। এখানে নিরামিষ আহার বন্টন করা হয়। কারণ যদি আমরা মাছ-মাংস খাই তাহলে শরীর আরও চিকনবতী হয়ে উঠবে। ভোর হবার আগে এক কাপ চা কিংবা কফি দেওয়া হয়। দেওয়া হয়, কয়েক আউন্স শুকনো পাউরুটি। বেলা এগারোটার সময় দুপুরের খাবার বণ্টন করা হয়। কী থাকে, সেখানে? পাতলা স্যুপ, কয়েক টুকরো সবজি, কোনো কোনো সময় এক টুকরো ফল।

এখানে আমরা এসেছি শরীরকে কষ্ট দিতে, আমরা ঈশ্বরকে খুশী করব।

আমি এই প্রাতরাশ জীবনে খাইনি। সিস্টার লুসিয়া ভাবতে থাকেন। মাত্র দুমাস। দুমাস পর কী হবে? আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, ইতিমধ্যে আমার ওজন দশ পাউন্ড কমে গেছে। আহা, ঈশ্বর কি তাই চাইছেন?

প্রাতরাশের আসর শেষ হয়ে গেছে। দুজন উপাসিকাকে দেখা গেল, তাদের থালাবাসন ধুয়ে রাখছেন। তারা থালাবাসন টেবিলের এক কোণে সাজিয়ে রাখবেন। তারা সিস্টার লুসিয়ার দিকে তাকালেন। এখানকার নিয়ম খুব কঠিন। একজনের ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন আবার তোয়ালে দিয়ে সব কিছু মুছে দিচ্ছেন। পাঠিয়ে দিচ্ছেন তার মালিকের হাতে। জলটা গরম এবং কেমন একটা গন্ধ আছে তার মধ্যে।

আহা, এইসব মহিলারা সারা জীবন এই নরকের যন্ত্রণা ভোগ করবেন। সিস্টার লুসিয়া ভাবতে থাকলেন। আমি কার কাছে অভিযোগ জানাব? বলা যেতে পারে, জেলখানায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর থেকে এই জীবনটা তো ভালো।

আহা, কেউ যদি আমাকে একটা সিগারেট দিত, তাহলে আমার আত্মা তৃপ্তি লাভ করত।

যেখানে কনভেন্টের অবস্থান তার থেকে পাঁচশো গজ দূরে, রাস্তায় তখন শুরু হয়েছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কর্নেল র‍্যামন আকোকার নেতৃত্বে চব্বিশজন মানুষকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তারা চিন্তা করছেন, কখন কনভেন্টের ওপর বহু প্রতীক্ষিত অভিযান শুরু হবে।

.

০৪.

কর্নেল র‍্যামন আকোকার মধ্যে এক শিকারীর মনোভাব রয়ে গেছে। সব সময় তিনি অনুসরণ করতে ভালোবাসেন। শেষ অব্দি হত্যা করাতেই তার মনে অসীম আনন্দ জেগে ওঠে। একদা তিনি তার এক বন্ধুর কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলেন– হত্যা করার মুহূর্তেই আমি আত্মরতির চরম সীমায় পৌঁছে যাই। আমি কখনও ভেবে দেখি না, সে হরিণ, খরগোশ, নাকি মানুষ। যখন তুমি কাবোর প্রাণ নিচ্ছো, নিজেকে ভগবানের প্রতিস্পর্ধী ভাবতে পারো।

আকোকা মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে এক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হিসেবে সহজেই নাম কিনেছিলেন। তাঁর মন নির্ভীক, তিনি নির্মম, প্রজ্ঞাবান এই তিনটি বিষয়ের সম্মেলন তাঁকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অন্যতম সহকারীতে পরিণত করেছে।

তিনি ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিন বছরের মধ্যে তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হন। তাঁর কাজকর্মের বিরুদ্ধে কোনো ত্রুটির অনুসন্ধান কেউ এখনও পর্যন্ত করতে পারেনি। তাকে ফ্যালাইনজিস নামে একটি বিশেষ দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই দলভুক্ত মানুষদের কাজ ছিল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আতঙ্ক ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গৃহযুদ্ধের সময় অপাসমুন্ডো নামে একটি গোপন সংগঠন তাকে ব্যবহার করেছিল।

আমরা যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, এতে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অনুমতি আছে তো?

ইয়েস স্যার।

কর্নেল, আপনার কাজকর্মের ওপর আমরা তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি। আপনার কার্যধারাতে আমরা খুশি হয়েছি।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার।

মাঝে মধ্যে আপনার হাতে আমরা গোপন কাজের দায়িত্ব তুলে দেব। কাজগুলো ভয়ংকর। একটু ভুল হলেই মৃত্যু অনিবার্য।

–আপনার কথা বুঝতে পারছি স্যার।

মনে রাখবেন, আমাদের অনেক গোপন শত্রু আছে। আমরা যে ধরনের কাজ করছি, জনগণ সেই কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। তারা মাঝে মধ্যেই বিরুদ্ধাচরণ করে।

–আমি জানি স্যার।

-কোনো কোনো সময় তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমরা এটা হতে দেব না।

না স্যার।

কর্নেল, আপনার মতো এক মানুষের দরকার। আশা করি আমরা পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি।

–হ্যাঁ, স্যার। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে, আমি নিজেকে সম্মানিত বলে মনে করব।

আমি চাইছি, আপনি আরও কিছুদিন এই আর্মির সঙ্গে যুক্ত থাকুন। আপনার সাহায্য আমাদের কাজকে ত্বরান্বিত করবে। মাঝে মধ্যে আপনাকে এই বিশেষ প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

এজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার।

কখনও অন্তরঙ্গ মহলেও এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন না।

–না, স্যার।

ডেস্কের অন্তরালে বসে থাকা মানুষটি আকোকার স্নায়ুপুঞ্জকে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত করে তুলেছিল। তাকে দেখেই বোঝা যায়, তিনি আতঙ্ক এবং শিহরণের প্রতীক।

সেই থেকে কর্নেল আকোকাকে মাঝে মধ্যে ডেকে পাঠানো হত। অপাসমুন্ডার জন্য তিনি বেশ কিছু গোপন কাজ করেছিলেন। এই কাজগুলো ছিল ভয়ংকর এবং গোপনীয় তার চূড়ান্ত পর্দা দিয়ে ঢাকা।

এমন একটি অভিযানে আকোকা একবার এক পরিবারের রূপসী যুবতীর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত তার সঙ্গিনীরা ছিলেন বাজারের বারাঙ্গনা অথবা ক্যাম্পে

বেড়াতে আসা কলগার্লরা। আকোকা তাদের সাথে নির্মম আচরণ করতেন। কেউ কেউ অবশ্য সত্যি সত্যি আকোকাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। আকোকার পৌরুষ তাদের আকৃষ্ট করেছিল। আকোকা কিন্তু কাউকে ভালোবাসা দেননি। এইসব বাজারি মেয়েছেলেদের জন্য তিনি শুধু ঘৃণা আর করুণা জমিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু সুসানা করিডিলা, সে ছিল এক অন্য জগতের বাসিন্দা। তার বাবা ছিলেন মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। সুসানার মা ছিলেন আইনজ্ঞ। সুসানা সপ্তদশী, তখনই পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠেছে। মুখখানি দেখলে মনে হয় সে বুঝি এক জলপরী। অথবা তাকে আমরা ম্যাডোনার সাথে তুলনা করতে পারি।

র‍্যামন আকোকা এই ধরনের মহিলার সংস্পর্শে আগে আসেননি। একদিকে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ, অন্যদিকে শিশু-সরলতা। ওই মেয়েটি বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন, কিন্তু মুখে ঝরছে অপূর্ব সরলতা। তাই বোধহয় কর্নেল আকোকা মেয়েটিকে পাগলের মতো ভালো বেসেছিলেন। এই ভালোবাসা যে কতদুর পৌঁছে গিয়েছিল, তিনি হয়তো তা বুঝতে পারেন নি। অবাক করা কথা, সুসানাও কিন্তু ভালোবাসার প্রতিদান দিতে ছিল উন্মুখ।

মধুচন্দ্রিমা, আকোকা তখনও পর্যন্ত আর কোনো মেয়েকে ভালোবাসেননি। কামনার সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসার সঙ্গে আবেগের এমন সম্মেলন, এ অভিজ্ঞতা আগে তার কখনও হয়নি।

বিয়ের পর তিন মাস কেটে গেছে। একদিন সুসানা জানাল, সে গর্ভবর্তী, এই খবর শুনে আকোকা বন্য উন্মাদনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তখন তারা আনন্দঘন মুহূর্ত

কাটাবার জন্য ক্যাসটিলবাংকা নামে একটা ছোট্ট গ্রামে এলেন। এই গ্রামটি বার্ক কাউন্টিতে অবস্থিত। ১৯৩৬ সালের শরৎকাল। গৃহযুদ্ধ তখন চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। একদিকে গণতন্ত্রপ্রেমীরা, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা, মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান।

এক শান্ত সমাহিত রবিবারের সকালবেলা। র‍্যামন আকোকা এবং তার নববধু ভিলেম প্লাজাতে বসে কফি খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখানে বার্কস সমর্থকদের দেখা গেল। তারা চিৎকার করছেন।

আকোকা বললেন আমি তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসি। মনে হচ্ছে কোনো একটা ঝামেলা হবে।

কিন্তু তোমার?

–আমার জন্য ভেবো না। নিজেকে বাঁচানোর মতো যথেষ্ট সাহস আছে আমার।

দেখা গেল উত্তেজিত জনতা চারপাশ ঘিরে ধরেছে।

র‍্যামন আকোকা তার নববধূকে নিয়ে ওই জনগণের কাছ থেকে চলে গেলেন। তাঁরা একটা কনভেন্টের দিকে চলে গেলেন। এই কনভেন্টটি স্কোয়ারের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। সুসানা সেখানে পৌঁছল। কনভেন্টের দরজা খুলে গেল। ভেতরে বসে ছিলেন সশস্ত্র বাসকোয়েস। সেখানে লুকিয়ে ছিলেন তিনি। তিনি বেরিয়ে এলেন। হাতে উদ্যত পিস্তল। আকোকা চোখের সামনে মৃত্যু দেখলেন। এক ঝাঁক বুলেট এসে তাঁর প্রিয়তমার

হৃদয় বিদীর্ণ করল। তখন থেকেই তিনি বাসকোয়েসের পরম শত্রুতে পরিণত হন। এই ঘটনার অন্তরালে চার্বাকেও দায়বদ্ধ করা যায়।

এখন আকোকা আভিলাতে বসে আছেন, আর একবিটল ভেনেন্টর বাইরে। এবার প্রতিহিংসা, শুধু প্রতিশোধ আর প্রতিশোধ।

***

কনভেন্টের ভেতর শেষ রাতের অন্ধকার। শেষ তারাটি এবার ঘুমোতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সিস্টার থেরেসা আরও কঠিন কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি দুটি হাত জোড় করলেন। বুকের ওপর ক্রুশের চিহ্ন আঁকলেন। মনে হল কেউ যেন উচ্চকিত কণ্ঠস্বরে বাইবেল থেকে কিছু পাঠ করছে। কিন্তু কে হতে পারে? তিনি চিৎকার করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে শব্দের নিষেধ। তাই আর্তনাদটা মনের মধ্যে রাখতে বাধ্য হলেন। যিশু, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমি যে পাপ করেছি, নিজেই সেই পাপের জ্বালায় পুড়ে মরছি। তোমার ক্ষমা না পেলে আমি বাঁচব কী করে? আমি শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করেছি। আমাকে আরও যন্ত্রণা দাও, আরও যন্ত্রণাদগ্ধ প্রহরের বাসিন্দা করে তোলো।

যন্ত্রণায় তিনি প্রায় অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন। এর আগে তিনি আরও অনেক বার নিজেকে এইভাবে কষ্ট দিয়েছেন। রক্ত বেরিয়ে এসেছে। তবুও উপশম করার চেষ্টা করেন নি। প্রতি মুহূর্তে তাকে এইভাবে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। চাবুকের আঘাত, চোখ

মুখ বন্ধ করে তাও সয়েছেন। চারপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, পাপের শাস্তি এভাবেই দিতে হয়।

সেদিন সকালে সিস্টার থেরেসার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত রূপান্তর দেখা দিয়েছিল। তিনি করিডরের একপ্রান্তে বসেছিলেন। চোখ দুটি বন্ধ। চোখ খুললেন। সিস্টার গ্রাসিলার দিকে চোখ পড়ে গেল। অবাক হলেন। সিস্টার থেরেসা তাকালেন সিস্টার গ্রাসিলার মুখের দিকে। সিস্টার থেরেসা বুঝতে পারলেন, কিছু একটা ঘটেছে। মহান মাদার বেটিনা এসে কথা বলবেন। তিনি এসে ভাষণ দেবেন। ডান হাতটি এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে নিয়ে যাবেন তিনবার, মনে হবে তিনি যেন চাবুক হাঁকাচ্ছেন। তার আঙুলের প্রান্তভাগ ধরা থাকবে অদৃশ্য ভঙ্গিতে।

সারা রাত বিছানাতে শুয়ে ছটফট করেছেন সিস্টার থেরেসা। সেই সুন্দর মুখটির কথা ভুলতে পারেননি। ওই দুটি উৎসুক চোখ কেন তাকে পর্যবেক্ষণ করছে? সিস্টার থেরেসা জানেন, তিনি কখনও ওই মেয়েটির সাথে কথা বলতে পারবেন না। ওই মেয়েটির দিকে আর কখনও এভাবে তাকাতে পারবেন না। যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে, তাহলে চরমতম শাস্তি পেতে হবে। এখানে নৈতিকতার বাঁধন অত্যন্ত কড়া। শারীরিক সম্পর্ক দূরে থাক, মানসিক দিক থেকে যাতে কেউ কারো কাছে আসতে না পারে তার জন্য একাধিক বিধি নিষেধ চালু আছে। এখানে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। দুজন সিস্টার পাশাপাশি কাজ করেন। একে অন্যের নীরব সাহচর্য উপভোগ করেন। মহান শ্রদ্ধেয়া মাদারের দৃষ্টি সব দিকে। যদি দেখেন এমন ঘটনা ঘটছে, তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করেন। দুজন সিস্টারকে পরপর দুদিন পাশাপাশি বসার অনুমতি দেওয়া হয় না। চার্চ এ ব্যাপারে নিজস্ব ধারা উপধারা

তৈরি করেছে। একজন উপাসিকা অন্য একজনের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না। এমন সম্ভাবনা থাকলে দুজনকেই কঠিন শাস্তির মুখে দাঁড়াতে হয়। এই নিয়ম ভাঙার জন্য সিস্টার থেরেসাকে কয়েকবার শাস্তি পেতে হয়েছে।

ঘণ্টা বেজে উঠেছে। সিস্টার থেরেসা সেই ধ্বনি শুনতে পেলেন। ঈশ্বর তাকে ডাকছেন, বলছেন, এখনই অনুশোচনা করতে হবে।

***

পাশের ঘরেও ঘণ্টাধ্বনি পৌঁছে গেছে। সিস্টার গ্রাসিলা এতক্ষণ স্বপ্ন-সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলেন। ঘণ্টাধ্বনি তার মনের গতিপ্রকৃতি একেবারে পালটে দিল। মনে হল, কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে উলঙ্গ অবস্থায় এক মুখ। তার পৌরুষ তাকে আকৃষ্ট করেছে। হাত দুটি সামনের দিকে প্রসারিত করে সে ছুটে আসছে।

সিস্টার গ্রাসিলা চোখ খুললেন। ঘুম ভেঙে গেল। বুকটা ধড়ফড় করছে। তিনি চার পাশে তাকালেন। আতঙ্কিত হলেন। ছোট্ট এই কক্ষে তিনি একা। ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

সিস্টার গ্রাসিলা বিছানা থেকে নামলেন। হাঁটু মুড়ে বসলেন –হে যিশু, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমাকে অতীত থেকে বর্তমানে নিয়ে এসেছ। তোমার আলোকে আমার জীবন আলোকিত হয়ে উঠেছে। আমি পৃথিবীর সর্বত্র তোমার করুণার কথা বলব। হে আমার প্রিয়তম, আমার প্রতি আরও ভালোবাসা প্রদর্শন করো। আমি যেন তোমার পবিত্র হৃদয়ের দিকে তাকাই। আমার দুঃখ ভুলে যাই।

সিস্টার গ্রাসিলা উঠে দাঁড়ালেন। বিছানা গুটিয়ে রাখলেন। তারপর? যোগ দিলেন সেই নীরব শোভাযাত্রায়, যে শোভাযাত্রা চ্যাপেলের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখনই মার্টিনস নামে প্রার্থনা সভা শুরু হবে। তিনি প্রজ্বলিত মোমের সুগন্ধ অনুভব করলেন। বুঝতে পারলেন, তার স্যান্ডেল পরিহিত পায়ের তলায় পাথরের টুকরো আছে। এলোমেলো পথ, এবড়ো খেবড়ো, চলে গেছে স্থির নির্দিষ্ট সীমারেখা ধরে।

যখন সিস্টার গ্রাসিলা প্রথম এই কনভেন্টে এসে প্রবেশ করেছিলেন, এখানকার নিয়মনীতি কিছুই বুঝতে পারেননি। মাদার প্রাওরেসের ভাষণ বুঝতে পারতেন না। তিনি ভাবতেই পারতেন না একজন রমণী কীভাবে সাধারণ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এভাবে বিসর্জন দেয়। তখন সিস্টার গ্রাসিলা এক চতুর্দশী, তিনটি বছর কেটে গেছে। আরও কত বছর কেটে গেল। সতেরো বছর। এখন তিনি সবই বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন, আত্মা কেন আবেগে অধীর হয়ে ওঠে। তিনি নীরবতার মধ্যে হেঁটে যেতে ভালোবাসেন। তার চোখ দুটিতে এখন এক অদ্ভুত শান্তি নেমে এসেছে।

হে মহান পিতা, আমি আমার ভয়ংকর অতীতকে ভুলতে পেরেছি। এর জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি সবসময় আমার পাশে দাঁড়িয়েছ। আমি তোমার ওপর আমার সবকিছু সমর্পণ করেছি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মার্টিনস শেষ হয়ে গেছে। উপাসিকারা তাদের নিজস্ব কক্ষে ফিরে আসছেন। এবার তারা আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবেন। পুব আকাশে সূর্য উঠবে, কর্মব্যস্ত দিনের জয় যাত্রা শুরু হবে। লাউডস নামে আর একটি প্রার্থনা সভার আসর বসবে।

***

বাইরে কর্নেল র‍্যামন আকোকা এবং তাঁর অনুগামীরা অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত চলাফেরা করছেন। ধীরে ধীরে তারা কনভেন্টের কাছে পৌঁছে গেলেন। কর্নেল আকোকা বললেন

জাইমে মিরো এবং তাঁর অনুগামীদের হাতে অস্ত্র আছে। তাই আমরা সামান্যতম সুযোগ দেব না।

তিনি কনভেন্টের সামনের দিকে তাকালেন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, এখানে থমথমে নীরবতা আছে। মনে হল, এই কনভেন্ট খুললেই বাসকোর সৈন্যদল বেরিয়ে আসবে। সুসানাকে একঝাক বুলেটের সামনে পড়তে হবে।

তিনি বললেন জাইমে মিরোকে আমি জীবিত অবস্থায় রাখব না। এটাই আমার শপথ।

অন্ধকার, তা না হলে আমরা দেখতে পেতাম, প্রতিহিংসার আগুনে কর্নেলের চোখ দুটি ধিকিধিকি জ্বলে উঠেছে।

***

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে জেগে উঠলেন সিস্টার মেগান। এটা একটা অন্য ধরনের নীরবতা। বাতাসের বুকে আলোড়ন। কয়েকটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হেঁটে যাচ্ছে। কোনো শব্দ নেই। কিন্তু কী যেন একটা শব্দ হচ্ছে। পনেরো বছর ধরে তিনি এই কনভেন্টের বাসিন্দা।

এমন শব্দের সমাহার আগে কখনও শুনতে পাননি। হঠাৎ তার মনে হল, কোথাও কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ভয়ংকর একটা ঘটনা, যার জন্য আপসোস করতে হবে।

অন্ধকারের মধ্যেই তিনি শান্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তার ছোট্ট ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। কী আশ্চর্য, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না, পাথরের তৈরি দীর্ঘ করিডরে একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। একটা বিশাল আকারের মানুষের মুখ হঠাৎ ভেসে উঠল। উনি মহান মাদারের সেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মাদারের দিকে তার উদ্যত বন্দুক। মেগান আহত আর্তনাদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। এটা কি একটা দুঃস্বপ্ন? মেগান ভাবলেন, বাইরের পুরুষ এখানে আসবে কী করে?

–আপনি ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? কর্নেল আকোকা জানতে চাইলেন।

মহতী মাদার বেটিনা অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন কর্নেলের দিকে। আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। উনি বললেন এভাবে কথা বলবেন না। এটা ঈশ্বরের মন্দির। এখানকার পরিবেশ নষ্ট করবেন না।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, মাদার বেটিনার কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

আপনারা এখনই এখান থেকে চলে যান।

সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় করে তিনি কোনোমতে বললেন।

কর্নেল শক্ত করে মাদারের হাত চেপে ধরেছেন। তিনি মাদারের শরীরটা নাড়াতে নাড়াতে প্রশ্ন করলেন সিস্টার, মিরোকে এখনই আমার হাতে সমর্পণ করুন। না করলে ফল ভালো হবে না।

না, এটা কোনো দুঃস্বপ্ন নয়, এটা একটা জ্বলন্ত বাস্তব।

অন্যান্য কক্ষের দরজা খুলে গেছে, একটি একটি করে। ধর্মযাজিকারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছেন। চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন ধরে তারা এখানে আছেন, কত ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু এমন পরিবেশ আর পরিস্থিতি? না, এর আগে এ অভিজ্ঞতা হয়নি তাদের।

কর্নেল আকোকা মাদার বেটিনাকে টানতে টানতে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্যাটরিসিও অ্যারিয়েটা। কর্নেল আকোকার বিশ্বস্ত সহচর। তিনি বললেন, এবার অনুসন্ধান শুরু কোর। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।

আকোকার মুখ থেকে শব্দগুলো বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অনুসন্ধান। চ্যাপেলের ভেতর তার অনুগামীরা ঢুকে পড়েছে। রিফ্ল্যাক্টরিতেও তারা পৌঁছে গেছে। প্রত্যেকটি সেলকে আলাদাভাবে দেখা হচ্ছে। কোন কোন জায়গাতে উপাসিকরা এখনও ঘুমিয়ে আছেন। তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হল। তাদের করিডরের ওপর এনে দাঁড় করানো হল। তারা কোনো প্রতিবাদ করতে পারলেন না। নীরবতার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে

গেলেন। মেগানের কাছে এই দৃশ্যের সাথে ফিল্ম শ্যুটিং-এর সাদৃশ্য ছিল। এই ভাবেই তো শ্যুটিং হয়, কিন্তু শব্দ ছাড়া হয় কি?

আকোকার অনুগামীরা চারপাশে আতঙ্কঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তারা সকলে ফ্যালানজির দলভুক্ত। তারা জানে কীভাবে চার্চ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে ছিল, গৃহযুদ্ধের সময়। তারা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সমর্থন করেছে বিরুদ্ধবাদীদের। এবার প্রতিহিংসার আগুন জ্বালতে হবে। প্রতিশোধের পালা এসে গেছে। ওই সন্নাসিনীদের শক্তি কতটুকু? তারা কী করতে পারবেন?

আকোকা একটি ছোট্ট ঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। আর্তনাদের শব্দ ভেসে এল। আকোকা দেখলেন, কী হচ্ছে? অনুগামীরা এক সন্ন্যাসিনীর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে? আকোকা চোখ বন্ধ করলেন। সামনের দিকে পা রাখলেন।

***

সিস্টার লুসিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে। বাইরে পুরুষের কণ্ঠস্বর, তিনি আতঙ্কের মধ্যে বসেছিলেন। পুলিশ আমাকে খুঁজে পাবে এটাই ছিল তার প্রথম চিন্তা। আমাকে এখুনি এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কনভেন্ট থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই। একটিমাত্র প্রবেশ পথ আছে, সেখান দিয়েই পালাতে হবে।

তিনি তাড়াতাড়ি করিডর দিয়ে হেঁটে গেলেন। এ কী? বিস্ময়ে আবিষ্ট হলেন তিনি। করিডর ভরতি একাগাদা পুরুষ কিন্তু তারা তো পুলিশ নন, তাদের পরনে সাধারণ

মানুষের পোশাক। কাঁধে অস্ত্র। তারা একটির পর একটি আলোকস্তম্ভ ভেঙে দিচ্ছেন। টেবিল তছনছ করছেন। কী ঘটনা ঘটেছে, সিস্টার লুসিয়া বুঝতে পারলেন না।

মাদার বেটিনাকে এককোণে দেখা গেল, তিনি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছেন। আহা, তাঁর প্রিয় কনভেন্টের এ কী অবস্থা। সিস্টার মেগান তার পাশে ছুটে গেলেন। একটু বাদে লুসিয়া সেখানে পৌঁছে গেলেন।

-কী হচ্ছে? এঁরা কারা? লুসিয়া ভয়চকিত কণ্ঠস্বরে জানতে চেয়েছিলেন।

কনভেন্টে প্রবেশের পর এই প্রথম তিনি কথা বলার অনুমতি পেলেন।

মহতী মাদার বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। যে চিহ্ন বোঝাল, এখন লুকিয়ে থাকতে হবে।

লুসিয়া অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে তাকালেন–আমরা এখন কথা বলতে পারি। এখান থেকে পালাতে হবে, ঈশ্বরের দোহাই।

প্যাটরিসিও অ্যারিয়েটা, কর্নেলের ডানহাত। আকাকোর দিকে এগিয়ে গেলেন কর্নেল, আমরা সব জায়গা খুঁজে দেখেছি। জাইমে মিরো অথবা তার অনুগামীদের কোনো চিহ্ন নেই।

–আর একবার খুঁজতে হবে, আকোকার কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতা।

মনে পড়ে গেল মাদারের এই কনভেন্টে একটা মহান মহার্ঘ্য সম্পত্তি আছে। তিনি অতি দ্রুত সিস্টার থেরেসার কাছে পৌঁছে গেলেন। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে

বললেন-তোমার ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করব। তুমি এখনই চ্যাপেল থেকে সোনার ওই ক্রুশটাকে সরিয়ে ফেলল। এটাকে নিয়ে মেনডাভিয়ার দিকে চলে যাও। তাড়াতাড়ি করতে হবে। হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।

সিস্টার থেরেসা এই কথাগুলো শুনে একবার মাত্র মাথা নাড়লেন। তিনি তাকিয়ে থাকলেন মহতী মাদারের দিকে। চোখে মুখে ভয়ের অভিব্যক্তি। সিস্টার থেরেসা গত তিরিশ বছর এই কনভেন্টের মধ্যে বসবাস করছেন। এই কনভেন্ট ছেড়ে কোনো দিন বাইরের পৃথিবীতে আসতে পারবেন, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি হাত তুললেন। বোঝ গেল, তিনি পারবেন না।

তাহলে? মাদারের চোখে মুখে ভয়ের অভিব্যক্তি।

–ওই ক্রুশ যেন এই শয়তানদের হস্তগত না হয়। হে যিশু, তুমি বলে দাও এখন আমি কী করব? . আলো এসে পড়ল সিস্টার থেরেসার মুখের ওপর। তিনি ইঙ্গিত করলেন, চ্যাপেলের দিকে তাকালেন।

সিস্টার গ্রাসিলাকে দেখা গেল, অন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মধ্যেও এক ধরনের বিভ্রান্তি জেগেছে।

আগন্তুকেরা আবার অসভ্য আচরণ করতে শুরু করেছে। চোখের সামনে যা পাচ্ছে, তাই ভেঙেচুড়ে দিচ্ছে। কর্নেল আকোকা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ওই পৈশাচিক অভিযানে তাঁর নীরব সমর্থন আছে।

লুসিয়া, মেগান এবং গ্রাসিলার দিকে তাকালেন। আমি আপনাদের দুজনকে জানি না, কিন্তু এখনই এখান থেকে পালাব। আপনারা কি আমার সঙ্গে যাবেন?

তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। উত্তর দেবার মতো মানসিক অবস্থা নেই।

সিস্টার থেরেসা অতি দ্রুত তাদের কাছে ছুটে এসেছেন। ক্যানভাসে মোড়া কিছু একটা হাতে রয়েছে তার। এবার আগন্তুকরা চলে গেছে রিফ্ল্যাকটরিতে।

লুসিয়া জিজ্ঞাসা করলেন আসবেন কি?

সিস্টার থেরেসা, মেগান এবং গ্রাসিলা এক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিলেন। তারপর তারা লুসিয়াকে অনুসরণ করলেন। তারা সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে তারা দীর্ঘ করিডরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেলেন। তারা দেখতে পেলেন, ওই বিরাট দরজাটাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

কোনো একজন সামনে এগিয়ে এল। বলল–হে মহিলারা, আপনারা কোথায় চলেছেন? কোথাও যাবেন না। আমার বন্ধুরা আপনাদের জন্য একটা সুন্দর পরিকল্পনা করেছে।

লুসিয়া হাসলেন আপনার জন্য একটি উপহার আছে।

তিনি ধাতুর তৈরি একটা বাতিদান হাতে ধরলেন, হলের টেবিলের ওপর এটা বসানো ছিল।

লোকটির চোখে মুখে কৌতূহল এটা নিয়ে আপনারা কী করবেন?

–এটা, লুসিয়া ওই বাতিদানটা দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন পুরুষটির মুখের ওপর। এক মুহূর্তের মধ্যে রক্ষী অচেতন হয়ে গেল।

বাকি তিনজন উপাসিকা পরস্পরের দিকে তাকালেন, আতঙ্ক এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টি ভঙ্গিতে।

–সামনে এগিয়ে চলুন। লুসিয়া বললেন।

এক মুহূর্ত কেটে গেছে। লুসিয়া, মেগান, গ্রাসিলা এবং থেরেসা কনভেন্টের বাইরে এসে পা রেখেছেন। না, আরও একটি পথ বাকি আছে। ওই বিরাট মাঠ, তখন সেখান দিয়ে তারা ছুটছেন। অন্ধকার রাত। কাছে-পিঠে কোনো শব্দ নেই।

লুসিয়া বললেন আমি আপনাদের ছেড়ে যাচ্ছি। সকলে একসঙ্গে থাকাটা উচিত হবে না। এখুনি তল্লাশি শুরু হবে। যে যার মতো প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করুন।

লুসিয়া এখন মুক্ত স্বাধীন। একটু আগেও তিনি এটা ভাবতে পারেননি। তিনি পাহাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। আমি কোথায় থাকব? পাহাড়ের চূড়ায় কোনো একটি গুহাতে লুকিয়ে থাকতে হবে। আগে তল্লাশি শেষ হোক। তারপর সুইজারল্যান্ডের দিকে যাত্রা করব। হায় আমার ভাগ্য, এই বেজন্মারা না এলে আমি এভাবে মুক্তি পেতাম না।

লুসিয়া এগিয়ে চলেছেন। তাকিয়ে দেখলেন চারপাশে। তিনজনকে দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে আরও দূরে তারা চলে যাচ্ছেন। তারা কোথায় যাচ্ছেন? আরও তাড়াতাড়ি হলে না হলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

***

ওঁরা কোথাও যেতে পারছেন না। মনে হচ্ছে কেউ যেন জাদুদণ্ড দিয়ে ওদের সমস্ত চেতনাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এইমাত্র যে ঘটনাটা ঘটে গেল, তার জন্য ওঁরা মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিলেন না। উপাসিকারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। চিন্তা হারিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই কনভেন্টের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী জীবন যাপন করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে দিন কাটিয়েছেন। এই কনভেন্ট তাদের কাছে নিরাপত্তার প্রতীক ছিল। এখন চার দেওয়ালের বাইরে এসে তারা ভয়ে কাঁপতে থাকলেন। মনের ভেতর বিভ্রান্তি জেগেছে। জেগেছে আতঙ্ক। তারা জানেন না কোথায় ঝবেন, কী করবেন। কনভেন্টের ভেতরের জীবন ছিল সুশৃঙ্খল, নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত। খাবার দেওয়া হত, শয্যা ছিল, কী করতে হবে তাও বলে দেওয়া হত। তারা একটা নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে জীবন কাটাতেন। এখন কোনো নিয়ম নেই। ঈশ্বর এখন আমাদের কাছ থেকে কী চাইছেন? এটা কি তাঁরই ইচ্ছা? অনেকক্ষণ তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। কথা বলতে পারছেন না। এত ভয় পেয়েছেন যে, একে অন্যের দিকে তাকাতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত সিস্টার থেরেসা আভিলার আলোর দিকে তাকালেন। ইঙ্গিত করলেন, ওই দিকে এগোতে হবে। তার মানে? এলোমেলো পদক্ষেপে তখন তারা অনাহুতের মতো শহরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

পাহাড়ের মাথা থেকে লুসিয়া তাকিয়ে থাকলেন। আঃ, ওখানে লুকোবার ভালো জায়গা নেই। এটাই আপনাদের সমস্যা। আপনাদের কথা আমি আর ভাবব না। নিজের সমস্যা নিয়েই এখন আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।

লুসিয়া সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। এখন কোথায় যাওয়া যায়? দেখতে পাওয়া গেল, তিনজন যাজিকা এলোমেলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছেন। নাঃ, ওঁরা বোধহয় আর বেঁচে থাকবেন না। লুসিয়া ক্ষণমুহূর্ত ভাবলেন।

তিনি পাহাড় থেকে নামার চেষ্টা করলেন। বললেন, থামুন-থামুন, আর একটু থামুন।

কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সিস্টাররা থেমে গেছেন।

লুসিয়া হাঁফাচ্ছিলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললেন– আপনারা ভুল পথে যাচ্ছেন। কেন ভাবছেন না, ওরা কিন্তু শহরেই খোঁজ খবর করবে। অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করুন।

নীরবতার মধ্যে তিনজন সিস্টার লুসিয়ার দিকে তাকালেন।

লুসিয়া অধৈর্যভাবে বললেন চলুন, আমরা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাই। আমাকে অনুসরণ করুন।

লুসিয়া পিছন ফিরলেন, আবার পাহাড়ের চূড়ার দিকে দৌড়োত থাকলেন। অন্যেরা তাকে নিরীক্ষণ করলেন। এক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর একে একে তারা লুসিয়াকে অনুসরণ করলেন।

ছুটতে ছুটতে লুসিয়া মাঝে মধ্যে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। ওঁরা কি আমাকে অনুসরণ করছেন? কিন্তু আমি কেন আমার নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারছি না, লুসিয়া ভাবলেন। ওঁদের কী হবে, সেটা দেখা তো আমার দরকার নেই। আমরা সকলে একসঙ্গে থাকলে সমস্যা বাড়তে পারে। লুসিয়া পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছেন। তখনও পর্যন্ত নজর রেখেছেন ওই তিন সিস্টারের ওপর।

ওঁরা কী করবেন? প্রতি মুহূর্তে ওঁদের গতি কমে আসছে। লুসিয়া বাতাসের বুকে শব্দ ছুঁড়ে দিলেন আরও তাড়াতাড়ি করুন, যিশুর দোহাই, জীবনটা এইভাবে নষ্ট করবেন না।

লুসিয়া মনে মনে ভাবলেন, সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্গ ছেড়ে মামাকে চলে যেতে হবে।

***

অ্যাবেতে অভিযান শেষ হয়ে এসেছে। হতভম্ব উপাসিকারা অবাক হয়ে গেছেন। দৈনন্দিন জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। সর্বত্র রক্তের ছাপ। তারা জানেন, আর কখনও আগের নিয়মনীতি, ফিরে আসবে না।

–এদের মাদ্রিদে নিয়ে যাও, আমার হেড কোয়ার্টারে, প্রত্যেককে আলাদাভাবে রাখবে। কর্নেল আকোকা আদেশ দিলেন।

-কী অভিযোগে?

–উগ্রপন্থীদের সাহায্য করেছে, এই অভিযোগে।

কর্নেল, প্যাটরিসিও অ্যারিয়েটা বলল, চারজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

.

কর্নেল আকোকা ঠান্ডা মাথায় বললেন এখুনি অনুসন্ধান শুরু হোক।

***

কর্নেল আকোকা মাদ্রিদে ফিরে এলেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পৌঁছে দিলেন– আমরা কনভেন্টে পৌঁছোবার আগে জাইমে মিরো সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মার্টিনেজ মাথা নেড়ে বললেন আমি শুনতে পেয়েছি।

তিনি তখনও চিন্তা করছেন, সত্যি সত্যি জাইমে মিরো ওই কনভেন্টে ঢুকেছিলেন কিনা? হয়তো ঢুকেছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত চিহ্ন কোথায়? কর্নেল আকোকার কাজকর্ম আর তার ভালো লাগছে না। কনভেন্টের ওপর এই যে আক্রমণ হল, গণমাধ্যম এর প্রতিবাদ করবে। জনগণ বিক্ষোভ দেখাবে।

প্রধানমন্ত্রী ধীরে ধীরে বললেন সাংবাদিকরা এসে গেছে, কনভেন্টে কী ঘটেছে, তা জানতে চাইছে।

–সাংবাদিকরা চাইছে এই সন্ত্রাসবাদী নেতাকে দেশের নায়কে পরিণত করতে। আকোকার কণ্ঠস্বর, মনে হয় গলায় পাথর জমেছে, আমরা কিন্তু কিছুতেই মাথা নত করব না।

কর্নেল, উনি একাই তো সরকারকে নাড়িয়ে দিচ্ছেন, আর ওই চারজন উপাসিকা। যদি তারা কথা বলতে শুরু করেন?

এ বিষয়ে চিন্তা করবেন না, তারা বেশি দূর যেতে পারবেন না, আমি তাদের ধরে ফেলব। মিরোকেও আমি গ্রেপ্তার করব।

প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন, এ ব্যাপারে আর কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না। তিনি বললেন কর্নেল, যে ছত্রিশজন সিস্টারকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের সকলের প্রতি ভালো ব্যবহার করা উচিত। আমি বলছি, মিরোকে খুঁজে বের করার জন্য আবার অনুসন্ধান শুরু হোক। আপনি কর্নেল সসটিরোর সঙ্গে একসাথে কাজ করুন।

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা আপনি ঠিক করে বলুন, কার ওপরে এই অপারেশনের দায়িত্ব দেবেন?

আকোকার চোখে বরফের শীতলতা।

ঢোক গিলে প্রধানমন্ত্রী বললেন–যেমন আপনার ওপর দায়িত্ব ছিল তেমনটিই থাকবে।

***

লুসিয়া এবং তিন সিস্টার ভোরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তারা পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব অংশে পৌঁছে গেছেন। আভিলা এবং কনভেন্ট থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছেন। সিস্টাররা নীরবতা বজায় রেখেছেন। কিন্তু মাঝেমধ্যে ছোটো ছোটো শব্দ হচ্ছে। শব্দ হচ্ছে তাদের আলখাল্লার খসখসানিতে। জুতোর মৃদুমন্দ আওয়াজে। চুলের দুলে ওঠা। দীর্ঘশ্বাস আরও কত কী। পথ উঁচু থেকে আরও উঁচুতে চলে গেছে।

শেষ অব্দি তারা গুয়ারডারমা পাহাড়ের একটি মালভূমিতে এসে পৌঁছোলেন। সামনে পাথরের প্রাচীর দেখা গেল। একদল মোষ আর ছাগল চরছে। সকাল হয়েছে। তারা ভিলা কাসটিন নামে একটি ছোটো গ্রামের প্রান্তসীমায় এসে পড়েছেন।

লুসিয়া মনে মনে ভাবলেন এখনই এই তিন সিস্টারের সঙ্গ ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। ঈশ্বরের হাতে ওনাদের ভবিষ্যৎ সমর্পণ করতে হবে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমার থেকে ভালোভাবে ওনাদের সামলাতে পারবেন। চিন্তাটার মধ্যে তিক্ততা ছিল। এখান থেকে সুইজারল্যান্ড অনেক দূর। আমার পকেটে কোনো পয়সা নেই, পাশপোর্ট নেই, আমাকে

দেখে কী মনে হচ্ছে? এক ভবঘুরে? তাহলে? আমি কোথায় যাব? এবার অনুসন্ধান শুরু হবে। আমাদের না পাওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান শেষ হবে না। তাহলে? খুব তাড়াতাড়ি অভিযানটা শেষ করতে হবে।

একটু বাদে একটা ঘটনা ঘটে গেল। ভবিষ্যৎ চিন্তা-ভাবনা একেবারে পালটে গেল।

সিস্টার থেরেসা গাছের তলা দিয়ে হাঁটছিলেন। এতক্ষণ ধরে তিনি একটা প্যাকেট সাবধানে বহন করছিলেন। হঠাৎ সেটা মাটিতে পড়ে গেল। ক্যানভাসের আবরণ খুলে গেছে। লুসিয়া তাকিয়ে থাকলেন। এ কী? ঝকঝক করছে সকালের সূর্যালোকে। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি ক্রুশচিহ্ন।

এটা আসল সোনা, লুসিয়া ভাবলেন। তাহলে? এই ক্রশই আমার উদ্ধার কর্তা হতে পারে। এর গায়ে সুইজারল্যান্ডের টিকিট লেখা আছে।

লুসিয়া দেখলেন, সিস্টার থেরেসা পরম মমতায় ওই ক্রশটিকে তুলে নিলেন। সেটিকে আবার ক্যানভাস কাপড় দিয়ে মুড়ে দিলেন। লুসিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন–অতি সহজেই এটা আমি ছিনিয়ে নিতে পারি। এই সিস্টাররা কিছুতেই বাধা দিতে পারবেন না!

***

আভিলা শহরের অবস্থা মুখে বর্ণনা করা যায় না। কনভেন্টের ওপরে জঘন্য আক্রমণের সংবাদ অতি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ফাদার বেরেনডো কর্নেল আকোকার সঙ্গে

প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামতে চাইছেন। ভদ্রলোকের বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। তিনি যে কোনো ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করতে পারেন। এখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

কর্নেল আকোকা তাকে একঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর ওই পাদরিকে তার অফিস ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন।

ফাদার বেরেনডো কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি বললেন আপনি এবং আপনার অনুগামীরা কোনো কারণ ছাড়াই কনভেন্ট আক্রমণ করেছেন। এটাকে আমরা উন্মত্ত আচরণ বলতে পারি।

–আমরা আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। কর্নেল শান্তভাবে বললেন। ওই কনভেন্টে জাইমো মিরো এবং তাঁর সন্ত্রাসবাদী অনুগামীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। সিস্টারদের জবানবন্দীতে এমন কথাই আছে। আমরা ওঁদের ধরে এনেছি আরও জিজ্ঞাসাবাদ করব বলে।

আপনি কি জাইমে মিরোকে ওই কনভেন্টে পেয়েছেন?

রাগের প্রশ্ন ছুটে এল পাদরির মুখ থেকে।

কর্নেল আকোকা শান্তভাবে বললেন না, আমরা সেখানে যাবার আগেই ওই শয়তান পালিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা ওকে ধরে ফেলবই। আর ওঁদের ওপর সুবিচার করা হবে।

কর্নেল আকোকা হাসলেন। সুবিচার, কে নির্ধারণ করবে? এখানে প্রধান বিচারপতির আসনটা আমাকেই অলংকৃত করতে হবে।

.

০৫.

সিস্টাররা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। জামাকাপড়ের অবস্থা শোচনীয়। স্যান্ডেল অত্যন্ত পাতলা। পাথুরে ভূমিখণ্ড থেকে পা-কে রক্ষা করতে পারছেন না। এভাবে দীর্ঘ পথ চলার অভ্যেস তাদের কোনোদিন ছিল না। সিস্টার থেরেসা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন। দুহাতে ওই মূর্তিটিকে ধরে থাকতে হয়েছে। মাঝেমধ্যেই গাছের শাখাপ্রশাখার আক্রমণ।

দিনের আলো পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতা শব্দটা কানের কাছে ঝমঝমিয়ে বাজছে। ভগবান কি এই সিস্টারদের বাইরে নিয়ে এসেছেন? ইডেন উদ্যানের বাইরে? জঘন্য পৃথিবীর ঘটনাবহুল আবর্তে? ভগবান কি এখন তাদের ওপর অসীম করুণা বর্ষণ করবেন? তারা কীভাবে জীবন কাটাবেন? কোথায় যাবেন? কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কোনো মানচিত্র নেই, কোনো কম্পাস নেই, উত্তর-দক্ষিণ ধরা যাচ্ছে না। কত দিন? কত দিন এভাবে থাকা যায়? নিরাপত্তার ওই প্রাচীরগুলো হারিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তারা বুঝি নগ্না এবং উন্মুক্তা। সর্বত্র বিপদের গন্ধ। আশ্রয় কোথায় পাবেন? এখানে তারা বিদেশী। বুঝতে পারা যাচ্ছে, দেশ জুড়ে এবার চরম বিতর্ক শুরু হবে। পতঙ্গের হাতছানি, পাখির কুজন, নীল আকাশ, সুন্দর প্রকৃতি কিন্তু ওই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কে দেখবে? ওঁদের মন এখন বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং আহত।

যখন ওনারা প্রথমে কনভেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, কেউ কারও মুখের দিকে তাকাননি, তখনও নিয়মনীতি মাথায় ছিল। অবশেষে তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকালেন। অনেক বছর নীরবতার মধ্যে সময় কেটে গেছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কথা বলার অভ্যেস নেই তো। অবশেষে ওনারা কথা বলতে শুরু করলেন। মনে হল, শব্দগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক পরিশ্রমে তাদের খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। মনে হল কথা বলা এমন একটা শক্তি যা বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি। নিজেদের কানের কাছে মুখ থেকে ছুটে আসা এই শব্দগুলো কেমন অদ্ভুত বলে শোনাল। লুসিয়া অবশ্য অন্য মনের। তিনি জানেন, ওই তিনজন সিস্টারকে এখুনি বশীভূত করতে হবে। আমার আচরণের মধ্যে কর্তৃত্বের ব্যঞ্জনা আনতে হবে। চারজনের এই দলে তিনিই হবেন সর্বাধিনায়িকা।

আগে পারস্পরিক আলাপটা সেরে ফেলা যাক। লুসিয়া বললেন, আমি সিস্টার লুসিয়া।

একটা অদ্ভুত নীরবতা। গ্রাসিলা ধীরে ধীরে লাজুক স্বরে জবাব দিলেন –আমি সিস্টার গ্রাসিলা।

আহা, সূর্যদীপ্ত গায়ের রং। ভারী সুন্দরী।

–আমি সিস্টার মেগান।

অল্প বয়সের ওই সোনালি চুলের কন্যাটি, চোখের তারায় নীলাভ দ্যুতি।

-আমি সিস্টার থেরেসা। আমাদের দলের মধ্যে প্রবীণা, কত বয়স? পঞ্চাশ অথবা যাট।

তারা গ্রামের পাশে একটি বনের ভেতর প্রবেশ করলেন।

লুসিয়া ভাবতে থাকলেন ওনারা হলেন পাখির শাবক। এই প্রথম নীড় ছেড়ে বাইরে উড়তে শিখেছে। কিন্তু এই অবস্থাটা বেশিক্ষণ থাকবে না। তার আগেই কাজ করতে হবে। ক্রুশটা হাতাতে হবে। ওটা নিয়ে সুইজারল্যান্ডে পালাতে হবে।

লুসিয়া পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। গাছের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট গ্রামটিকে দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। কিন্তু যারা কনভেন্টের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তাদের কাউকে চোখে পড়ছে না। এখন, লুসিয়া ভাবলেন, এখানেই আমাকে সুযোগ নিতে হবে।

তিনি অন্য তিনজনের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন– খাবার আনতে আমি গ্রামে যাচ্ছি। আপনারা এখানে অপেক্ষা করবেন। তিনি সিস্টার থেরেসার দিকে তাকিয়ে বললেন–আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন?

আহ্বানে সিস্টার থেরেসা অবাক হয়ে গেলেন। তিরিশ বছর ধরে তিনি মহতী মাদার বেটিনার আদেশ পালন করেছেন। এখন এই অচেনা অজানা সিস্টার মাদার বেটিনার আসন গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যা কিছু ঘটছে সব ঈশ্বরের আদেশানুসারে, সিস্টার থেরেসা ভাবলেন, ঈশ্বর আছেন, তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।

তিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বললেন এই সোনার ক্রুশটিকে নিয়ে মেনডাভিয়ার কনভেন্টে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

–ঠিক আছে, আমরা কখন সেখানে যাব? কীভাবে যাব?

তারা দুজন পাহাড় থেকে নীচে নামতে শুরু করলেন। ছোটো ওই গ্রামের দিকে এগিয়ে চললেন। লুসিয়া সমস্ত সমস্যার ওপর নজর রেখেছেন। আশেপাশে সন্দেহজনক কেউ আছে কি? না, কাউকে চোখে পড়ল না।

তাহলে কাজটা সহজ হবে, লুসিয়া ভাবলেন।

তারা ওই ছোট্ট গ্রামের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়ালেন। সেখানে একটা চিহ্ন রয়েছে– ভিলাকাসটিন। সামনে প্রধান পথ। বাঁদিকে ফাঁকা একটা রাস্তা।– ঠিক আছে, লুসিয়া ভাবলেন, এই ঘটনার কোনো সাক্ষী থাকবে না।

লুসিয়া বাঁদিকের ফাঁকা পথে ঢুকে পড়লেন আমরা এই পথ ধরে যাব। এখানে ধরা পড়ার আশঙ্কা কম।

সিস্টার থেরেসা মাথা নাড়লেন। লুসিয়াকে অন্ধের মতো অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন।

লুসিয়ার মনে এখন একটাই প্রশ্নের উতরোল, কীভাবে সোনার ক্রুশটা ছিনিয়ে নেব আমি?

আমি চট করে এটা কেড়ে নিয়ে ছুটতে পারি, লুসিয়া ভাবলেন। কিন্তু সিস্টার থেরেসা চিৎকার করবেন। অনেকের নজর আমার ওপর পড়ে যাবে। না, এমন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সিস্টার থেরেসা নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হন।

সামনে গাছের একটা ডাল পড়ে আছে। লুসিয়া একমুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন। গাছের ডালটা খুবই শক্ত। আঃ, এটা একটা ভালো অস্ত্র হতে পারে। তিনি একটু অপেক্ষা করলেন। সিস্টার থেরেসা কাছে এসে গেছেন।

-সিস্টার থেরেসা, লুসিয়া একবার ডাকলেন।

সিস্টার থেরেসা তাকালেন লুসিয়ার দিকে। আর এক মুহূর্ত, গাছের ডালটা গদার মতো আঘাত করবে সিস্টার থেরেসার কপালের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল। কণ্ঠের উৎস খুঁজে পাওয়া গেল না।

–সিস্টার, ঈশ্বর আপনাদের সহায় হবেন।

ভয় পেয়ে লুসিয়া চারপাশে তাকালেন। পালাবার চেষ্টা করলেন। একজন মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বা বাদামী রঙের আলখাল্লা তার পরনে। মাথার ওপর টুপি। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং শীর্ণ। মুখের ভেতর মধ্যযুগীয় ছাপ। বুঝতে পারা যায় তিনি এক মহান যাজক। লুসিয়া এমন মূর্তি কখনও দেখেননি।

ওই ভদ্রলোকের চোখ দুটিতে আলো জ্বলে উঠেছে। তার কণ্ঠস্বর কোমল এবং করুণায় ভরা।

–আমি ফ্রায়ার মিগুয়েল কারিলো। উনি থেমে থেমে বললেন।

লুসিয়ার মন ছুটে চলেছে। লুসিয়া চেয়েছিলেন, এখনই কথা থামিয়ে দিতে। কিন্তু তার উপায় নেই। লুসিয়া পরিস্থিতি বিবেচনা করে বললেন হায় ভগবান, শেষ পর্যন্ত আপনি আমাদের খুঁজে পেয়েছেন।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। তিনি জানতেন, এই সিস্টাররা কোথা থেকে এসেছেন।

–আমরা আভিলার কাছে সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট থেকে আসছি। লুসিয়া ব্যাখ্যা করলেন, গত রাতে কয়েকজন আততায়ী আমাদের কনভেন্টে চড়াও হয়েছিল। তারা সমস্ত সিস্টারকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। আমরা চারজন কোনোরকমে পালাতে পেরেছি।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, তার কণ্ঠস্বরে রাগ-বিরক্তি-ঘৃণা একই সঙ্গে ঝরে পড়ছে –আমি সেন্ট জেনেরোর মনাস্ট্রি থেকে আসছি। কুড়ি বছর ধরে আমি সেখানেই ছিলাম। পরশু রাতে আমাদের আশ্রমকে আক্রমণ করা হয়। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মনে হচ্ছে, ঈশ্বর বোধহয় আমাদের জন্য অন্য কোনো পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এখন আমাকে স্বীকারোক্তি করতেই হবে। আমি বুঝতে পারছি না, চারপাশে এমন ঘটনা ঘটছে কেন?

–ওই আততায়ীরা আমাদের সন্ধানে পাগল হয়ে উঠেছে। লুসিয়া বললেন। খুব তাড়াতাড়ি স্পেন থেকে অন্য কোনো দেশে চলে যেতে হবে। আপনি কি একটা উপায় : বাতলাতে পারেন?

ফাদার কারিলো হেসে ফেললেন মনে হচ্ছে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারব। সিস্টার, ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আপনারা আমাকে অনুসরণ করতে পারেন।

লুসিয়া ওই ভদ্রলোককেও তাদের দলভুক্ত করে নিলেন।

লুসিয়া বললেন ইনি হলেন ফ্রায়ার কারিলো, গত কুড়ি বছর ধরে তিনি একটা মনাস্ট্রিতে বসবাস করছেন। তিনি আমাদের সাহায্য করতে চাইছেন।

বাকি তিনজন সাধিকা ওই যাজককে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মনের ভেতর মিশ্র অনুভূতির জন্ম হয়েছে। গ্রাসিলা তার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে ভয় পাচ্ছেন। মেগান পরিষ্কার দৃষ্টিতে ভদ্রলোককে পর্যবেক্ষণ করলেন। চোখের তারায় কৌতূহলের আভাস। সিস্টার থেরেসার চোখে ইতিমধ্যেই উনি ভগবান প্রেরিত এক দেবদূত হিসেবে গণ্য হয়েছেন। উনি হয়তো মেনডাভিয়া কনভেন্টের পথ দেখাতে পারবেন।

ফ্রায়ার কারিলো বললেন কী জন্য ওরা আমাদের কনভেন্ট আক্রমণ করেছে? হয়তো কোনো উদ্দেশ্য ছিল। আর আপনারাও এখন নিরাপদ নন। ওরা নিশ্চয়ই হন্যে কুকুরের মতো আপনাদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই পোশাক পালটানো দরকার।

মেগান মনে করালেন পালটাবার মতো কোনো পোশাক তো আমাদের সঙ্গে নেই।

কারিলোর মুখে একটা রহস্যঘন হাসি ফুটে উঠল- মহান ঈশ্বরের হাতে মস্ত বড়ো ওয়ারড্রোব আছে। আপনারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমাকে অনুসরণ করুন। আমরা এখন শহরে যাব।

বেলা দুটো বেজেছে। কারিলো এবং চারজন সিস্টার প্রধান রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন। তারা গ্রামের পথেই চলেছেন। চারপাশ দেখছেন সতর্ক দৃষ্টিতে। অপরিচিত কোনো আগন্তুককে দেখা যাচ্ছে কি? দোকানগুলো বন্ধ। রেস্টুরেন্ট এবং বার খোলা আছে। সেখান থেকে সংগীতের শব্দ ভেসে আসছে। এলোমেলো কিছু আওয়াজ। উল্লসিত মানুষের চিৎকার।

ফাদার কারিলো সিস্টার থেরেসার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন –এ হচ্ছে রক অ্যান্ড রোল। তরুণ-তরুণীদের কাছে আদর্শ নাচের বাজনা।

দুজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন একটি বারের সামনে। সেবিকারা সেখান দিয়ে চলে গেলেন। তারা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। পরনে অদ্ভুত পোশাক। সিস্টাররা ভাবলেন, একজন এত ছোটো একটি স্কার্ট পরেছে, কোনোরকমে সেটি তার দেহের কিছু অংশকে ঢেকে রেখেছে। আর একজন লম্বা স্কার্ট পরেছে। কিন্তু সেটি মাঝখান থেকে বিসদৃশ ভাবে কাটা। তারা অন্তর্বাস পরেছে একদম চাপা। কোনো ফাঁকা নেই।

সিস্টার থেরেসা ভাবলেন, ঈষৎ চিন্তিত হয়ে একেই বোধহয় নগ্ন অভিব্যক্তি বলে।

দরজাতে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। চিত্র বিচিত্র সোয়েটার তার পরনে। জ্যাকেট আছে কিন্তু কলার নেই। গলাতে একটা পেনডান ঝুলছে।

এমন একটা গন্ধ নাকে এল, যা মনকে চঞ্চল করে তোলে। নিকোটিন এবং হুইস্কি, বোঝা গেল।

মেগান রাস্তার অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন।

কারিলো জানতে চাইলেন কী হয়েছে?

তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন।

মেগান দেখলেন, এক মহিলা একটি শিশুকে বহন করছে। কত দিন হয়ে গেল, তিনি কোনো শিশুর মুখ দেখেননি। কোনো ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। সেই অনাথ আশ্রমের কথা মনে পড়ে গেল, চোদ্দো বছর। অতর্কিত এই আক্রমণ মেগানকে জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলল। তার মানে এতদিন আমি বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নিঃসঙ্গ দ্বীপে অবস্থান করছিলাম।

সিস্টার থেরেসাও ওই বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্য কিছু ভাবছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, বাচ্চাটি বোধহয় ঈশ্বরেরেই সন্তান। বাচ্চাটি ক্ষিদেতে চিৎকার করছে। কেন? মনে হচ্ছে, আমি তাকে সাহায্য করতে পারছি না। তাই সে আকুল হয়েছে। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। তিরিশ বছর কেটে গেছে, সিস্টার থেরেসা তাকালেন, বাচ্চাটির কান্না তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে। তারা এগিয়ে চললেন।

তাঁরা একটা সিনেমা হলকে পেছনে ফেলে এলেন। পোস্টারে লেখা আছে–গ্রী লার্ভাস, দেখা যাচ্ছে স্বল্পবাস এক রমণী খোলা বুকের এক পুরুষকে আলিঙ্গন করছে।

-কেন? কেন সর্বত্র নগ্নতার ছড়াছড়ি।

সিস্টার থেরেসা বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

কারিলো ভুরু ভঙ্গিতে বিরক্তি এনে বললেন ঠিকই বলেছেন, এই ধরনের সিনেমা প্রদর্শনের অনুমতি পায় কী করে? এই ফিল্মটাকে আমরা এক সস্তা পর্ণগ্রাফি বলতে পারি। মানুষের জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ভাব-ভালোবাসার মুহূর্তগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এই ভাবেই আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের জন্তুতে পরিণত করি।

তারা একটা হার্ডওয়ারের দোকান পেরিয়ে গেলেন। একটা হেয়ার ড্রেসিং সেলুন চোখে পড়ল। ফুলের দোকান, মিষ্টির দোকান–সিয়েসটা উৎসবের জন্য সব বন্ধ আছে। প্রত্যেকটি দোকানের সামনে সিস্টাররা কিছুক্ষণ থমকে থেমেছিলেন। জানলার ভেতর দিয়ে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাচ্ছিলেন। সব জায়গাতেই জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। কিন্তু এসব জিনিস থেকে তারা কত বিচ্ছিন্ন।

তারা মহিলাদের পরিচ্ছদের দোকানে এলেন।

কারিলো বললেন- দাঁড়ান।

সামনের দরজা খুলে গেল। একটা আলো জ্বলে উঠল, বন্ধ হয়ে গেছে।

–এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করুন, কেমন?

চারজন ভদ্রমহিলা তাকিয়ে থাকলেন। ভদ্রলোক চোখের বাইরে চলে গেলেন। তারা সবাই শূন্য চোখে একে অন্যকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি কোথায় চলেছেন? উনি যদি না আসেন তাহলে কী হবে? আশঙ্কা এবং হতাশার অনুভূতি।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। তারা সামনে একটা শব্দ শুনলেন। কারিলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি বললেন তাড়াতাড়ি করতে হবে।

তারা সকলে দোকানের ভেতর চলে এলেন। ভদ্রলোক দোকানের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

লুসিয়া জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কী করে একাজ করলেন?

–যেমন সামনে দরজা আছে, তেমন পেছনে একটি দরজা আছে। ভদ্রলোক শান্তভাবে জবাব দিলেন। তার কণ্ঠস্বরে এমন এক ভয়, মেগান হেসে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভয় মেশানো শ্রদ্ধায় সিস্টাররা চারদিকে তাকালেন। অসংখ্য পোশাক থরে থরে সাজানো আছে। রং আর রং-এর খেলা। সোয়েটারের পাশাপাশি অন্তর্বাস, মোজাও চোখে পড়ল। হাইহিল জুতো এবং আরও কত ফ্যাশান সামগ্রী। এমন বস্তু অনেক বছর তারা চোখে দেখেননি। স্টাইল অনেকটা পালটে গেছে। অদ্ভুত কিছু স্টাইল। হ্যান্ডব্যাগও চোখে

পড়ল। রুমালও আছে। কিছু ব্লাউজ টাঙানো আছে। এত কিছু নেওয়া সম্ভব নয়। চারজন সিস্টার অবাক হয়ে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে, কারিলো মনে করালেন। খুব তাড়াতাড়ি এই দোকানটা ছেড়ে চলে যেতে হবে। সিয়েসটার শেষ হলে কিন্তু দোকান খুলবে। এবার আপনারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করুন। যেটা ঠিক হয়েছে বলে মনে হবে, সেটাই পরে নিন। দেখবেন, চেহারাটা একেবারে বদলাতে হবে। চট করে কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে।

লুসিয়া হেসে ফেললেন হায় ঈশ্বর, আমি শেষ পর্যন্ত আবার রমণীসুলভ পোশাক পরব? তিনি পোশাকের র‍্যাকের কাছে চলে গেলেন। পোশাক বাছতে শুরু করলেন। একটা সুন্দর স্কার্ট তার পছন্দ হল। ট্যান সিল্কের একটা ব্লাউজ। হ্যাঁ, এর সঙ্গে চলতে পারে। হয়তো খুব একটা ফ্যাশান দুরস্ত নয়, কিন্তু কী করা যাবে। তিনি একটা প্যান্টি বের করলেন। একটি ব্রা এবং কোমল বুট জুতো। যেখানে পোশাক আছে, তার আড়ালে চলে গেলেন, সম্পূর্ণ নগ্ন হলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পোশাক পালটে বেরিয়ে এলেন।

ইতিমধ্যে অন্য সিস্টাররাও উপযুক্ত পোশাক পরে নিয়েছেন।

গ্রাসিলা পছন্দ করেছিলেন সাদা স্মৃতির পোশাক। তার কালো চুলের সাথে তা মানিয়ে গেছে। সূর্যদীপ্ত তার গায়ের চামড়া, তাই সাদা পোশাকে তাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছিল। পায়ে একজোড়া স্যান্ডেল গলিয়ে দিয়েছেন।

মেগানের পছন্দ প্যাটার্ন করা নীল সুতির পোশাক। ফ্রকটা হাঁটুর নীচে নেমে গেছে। তিনি একটা প্লাটফর্ম হিলের জুতো পরলেন।

সিস্টার থেরেসা কী পোশাক পরবেন ভাবতেই পারছিলেন না। কিছু একটা পরতে তো হবে, এখানে যা আছে সবই খুবই উজ্জ্বল, সিল্ক আছে, ফ্লানেল আছে, কুইট এবং চামড়ার পোশাক। সুতিও চোখে পড়ল। টুইল এবং কোরুডয়। কোনোটাতে চেক, কোনোটাতে স্ট্রাইপ, কোনোটাতে প্লেট আছে। এসব পোশাক পরলে নিজেকে কেমন উদ্ভট বলে মনে হবে। সিস্টার থেরেসার মনে তখন একটিই চিন্তা, কীভাবে তিনি নিজেকে পালটে ফেলবেন? গত তিরিশ বছর ধরে সন্ন্যাসিনীর সাদা আলখাল্লা পরে থাকতেন। এখন তাকে নতুন পোশাক পরতে বলা হচ্ছে। হায় ভগবান, আমি এই বিশ্রী পোশাকগুলো কী করে পরব? শেষ পর্যন্ত তিনি একটিমাত্র লং স্কার্ট খুঁজে পেয়েছিলেন। পুরো হাতা, উঁচু কলার দেওয়া একটি সুতির ব্লাউজ।

ফ্রায়ার কারিলো বললেন তাড়াতাড়ি সিস্টাররা, খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

এবার পোশাকগুলো পরতে হবে। কিন্তু কী করে? আগের পোশাকগুলো খোলা দরকার।

কারিলো হেসে বললেন আমি অফিসে অপেক্ষা করছি, কেমন?

উনি দোকানের পাশে অফিসে চলে গেলেন।

সিস্টাররা এবার দ্রুত পোশাক পাল্টাতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা দুঃখদায়ক, কিন্তু কী করা যাবে। এখন সময় খুবই কম।

অফিসে বসে কারিলো বাইরের দিকে তাকালেন। ভাবলেন ওই সিস্টাররা এখন কী করছেন? মুহূর্তের মধ্যে চোখ সেদিকে পড়ে গিয়েছে। তিনি চিন্তা করলেন, কাকে প্রথম গ্রহণ করা যেতে পারে।

***

মিগুয়েল কারিলো তার জীবন শুরু করেছিল একজন চোর হিসেবে। তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। জন্ম হয়েছিল তার কোঁকড়ানো সোনালি চুল নিয়ে, দেবদূতের মতো সরলতা এবং নিষ্পপতা লুকিয়ে ছিল মুখের মধ্যে। এইজন্য সে বোধহয় তার ঈঙ্গিত পেশাটি সহজেই বেছে নিয়েছিল। শুরু করেছিল একেবারে নীচু থেকে। প্রথম প্রথম হাতব্যাগ চুরি করে পালাত। দোকান থেকে এটা সেটা তুলে নিত। তারপর বয়স বাড়ল। তার পেশা আরও বিস্তৃত হল। সে তখন মাতালদের পকেট হাতড়াচ্ছে। ধনী মহিলাদেরও আক্রমণ করছে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল তার। তাই প্রতিটি কাজে সে সফল হত। এবার সিঁদকাটা শিখে ফেলল। নিত্য নতুন আবিষ্কারে নিজেকে আরও দুরন্ত করে ফেলল। দুর্ভাগ্য, শেষ অভিযানটা মোটেই সার্থক হয়নি। আর সেবারই সে ধরা পড়ে যায়।

নিজেকে সে দূরবর্তী এক মনেস্ট্রির যাজকের ভূমিকাতে সাজিয়েছে। কারিলো এক চার্চ থেকে অন্য চার্চে ঘুরে বেড়ায়। মধ্য রাতের অভিযান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। সকাল হয়। প্রধান ধর্মযাজক এসে দরজা খুলে দেন। অবাক হয়ে দেখেন চার্চের অনেক মূল্যবান সামগ্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল সেগুলো? কিন্তু সব

সময় ভাগ্য কি এইভাবে সাহায্য করে? দু-রাতের আগের ঘটনা, আভিলার কাছে একটা ছোট্ট শহর বেনজা। ধর্মর্যাজক মাঝরাতে ফিরে এসেছিলেন। মিগুয়েল কারিলোকে পাওয়া গেল চার্চ ট্রেজারির মধ্যে বসে থাকতে। ধর্মযাজক ছিলেন অত্যন্ত শক্ত মনের মানুষ। তিনি কারিলোর সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত কারিলোকে ভয় দেখালেন, বললেন, এখনই পুলিশে ফোন করবেন। মাটির ওপর মস্ত বড় একটা রুপোর পাত পড়েছিল। কারিলো সেটাকেই তুলে নিল। সজোরে আঘাত করল ওই যাজকের মাথার ওপর। তখন কী হল? হয়তো আঘাতটা খুব গুরুতর হয়েছিল। কিংবা ধর্মর্যাজকের মাথার খুলিটা ছিল খুবই পাতলা। তিনি মরে গেলেন। রক্তের স্রোত বেরিয়ে এল। মিগুয়েল কারিলো পালিয়ে গেল। মনে আতঙ্ক জেগেছে। খুব তাড়া তাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে। সে আভিলার দিকে চলে গেল। কর্নেল আকোকা কনভেন্ট আক্রমণ করেছেন, এই খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। সে এই খবরটা পেয়েছিল। এখন ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। ভাগ্যই তাকে ওই চারজন পলাতকা যাজিকার সামনে নিয়ে এসেছে।

এখন তাকে অনুমানের ওপর ভর করে হাঁটতে হবে। ইতিমধ্যেই সে ওই চার সন্ন্যাসিনীর নগ্ন দেহ দেখে ফেলেছে। এখন কী হবে? কর্নেল আকোকা এবং তার আততায়ীরা নিশ্চয়ই কুকুরের মতো খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। এই চার মহিলাকে কর্নেল আকোকার হাতে তুলে দিতে হবে। তাহলে? কত টাকা পাওয়া যেতে পারে?

ছিঁচকে চোর মনে মনে একটা হিসাব করছিল। একমাত্র লুসিয়াই পোশাক পরিহিতা, বাকি তিনজন তখনও পর্যন্ত নতুন পোশাকে শরীর ঢাকতে পারেননি। তারা নগ্ন হয়ে

দাঁড়িয়ে আছেন। কারিলো নীচু চোখে সব কিছু দেখে নিল। ভাবল, নতুন এই পোশাকে তাদের কেমন দেখাবে? একটু বাদেই তাদের পোশাক পরা শেষ হয়ে গেল। তারা বোম লাগিয়ে দিলেন। ক্লিপ আটকে দিলেন। খুব তাড়াতাড়ি তাদের বাইরে আসতে হবে।

সময় এগিয়ে চলেছে। কারিলো ভাবল, সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। দোকানে পৌঁছে গেল। সিস্টারদের সামনে গিয়ে তাকাল। বলল ভারী সুন্দর হয়েছে। এই পৃথিবীর কেউ। আপনাদের আর যাজিকা বলে চিনতে পারবে না। মাথার ওপর স্কার্ফ লাগিয়ে নিলে ভালো হয়। সে সকলের জন্য আলাদা স্কার্ফ বের করল। চারজন সিস্টার মাথায় স্কার্ফ পরে নিলেন।

এবার মিগুয়েল কারিলো তার পথ ঠিক করল। গ্রাসিলাকে প্রথমে নিয়ে যেতে হবে। তিনি হলেন অত্যন্ত রূপবতী এক কন্যা। এমন রূপসী নারীর সাথে মিগুয়েল-এর আগে দেখা হয়নি। আহা, রক্ত মাংসের এই শরীর। ঈশ্বরের নামে একে নষ্ট করে কী লাভ? আমি মেয়েটিকে দেখাব, কীভাবে জীবনে আনন্দ পেতে হয়।

সে লুসিয়া, থেরেসা আর মেগানকে বলল মনে হচ্ছে, আপনারা সকলেই খুব ক্ষুধার্ত। আমরা একটা কাফেতে যেতে চাইছি। আপনারা তিনজন সেখানে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি চার্চে যাব। যাজকের কাছ থেকে কিছু টাকা ভিক্ষে করব, যাতে আমাদের খাবারের সংস্থান হয়।

তারপর সে গ্রাসিলার দিকে তাকিয়ে বলল–সিস্টার, অনুগ্রহ করে আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কি? আপনি গেলে কনভেন্টের ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিয়ে বলা যেতে পারে।

আপনার কথা শুনে হয়তো পাদরি সাহেব খুশি হবেন। আমার মুখ থেকে এসব কথা শুনলে উনি রাজী হবেন না।

-ঠিক আছে।

কারিলো অন্যদের বলল আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমার মনে হয়, আপনারা পেছনের দরজাটা ব্যবহার করতে পারেন।

সে লুসিয়া, থেরেসা এবং মেগানের দিকে তাকাল তিন সিস্টার শান্ত মনে এগিয়ে চলেছেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এবার সে গ্রাসিলার দিকে তাকাল। আহা, এমন রূপ যৌবন, সে ভাবল, মেয়েটিকে আমার রক্ষিতা করে রাখলে কেমন হয়? মাঝে মধ্যে ভাঙিয়ে খাব। ভবিষ্যতে সে হয়তো আমার পরম উপকারী বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

গ্রাসিলা তার দিকে তাকিয়ে বললেন আমি প্রস্তুত।

না, এখনও পোশাক সম্পূর্ণ হয়নি। কারিলো অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সিস্টারকে নিরীক্ষণ করল। না, এই পোশাকটা আপনাকে ঠিক মানাচ্ছে না। এটা খুলে ফেলতে হবে।

-কেন কী হয়েছে?

–এটা আপনার গায়ে ঢলঢল করছে। যে কোনো লোক দেখলেই বুঝতে পারবে। কারিলো চিন্তা করে বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনি এই পোশাক পরে লোকের মনে অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি করবেন।

গ্রাসিলা ইতস্তত করছিলেন। তারপর একটা র‍্যাকের পাশে চলে গেলেন।

তাড়াতাড়ি, সময় কিন্তু ক্রমশ কমে আসছে।

গ্রাসিলা পোশাক খুললেন। প্যান্টি এবং ব্রেসিয়ার পরা। ঠিক তখন কারিলো সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সব কিছু খুলতে হবে, কণ্ঠস্বরের মধ্যে জেগেছে ব্যক্তিত্ব।

গ্রাসিলা তার দিকে তাকালেন কী বলছেন? গ্রাসিলা আর্তনাদ করে উঠলেন –না না, আমাকে এভাবে বাধ্য হতে বলবেন না।

কারিলো ক্রমশ আরও কাছে এগিয়ে এসেছে সিস্টার, আমি কি আপনাকে সাহায্য করব?

হাত আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত দ্রুত সে ব্রেসিয়ার খুলে দিল। প্যান্টি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল।

না, আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। এটা আপনি করতে পারেন না। আপনি চলে যান।

কারিলো চিৎকার করছে– শুরু হবে, এখনই শুরু হবে। এটাকে ভালোবাসতেই হবে।

তারপর? দুটি সবল বাহু সামনের দিকে এগিয়ে আসে। আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। গ্রাসিলাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। উন্মত্ত পশুর মতো কারিলো তার পোশাক খুলতে ব্যস্ত এখন।

গ্রাসিলার মনে এখন কী চিন্তা? মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে, এক মুর বোধ হয় তাকে অপমান করছে। মৃত্যুর ঘণ্টা তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তার মায়ের আর্তনাদ ভেসে উঠছে।

গ্রাসিলা ভাবলেন না, আর নয়, কিন্তু কে শোনে কার কথা?

তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ওই নরদস্যুর সাথে লড়াই করতে। এই লড়াইতে তিনি কি জয়যুক্ত হবেন? পারছেন না। আবার সেই আর্ত চিৎকার।

কারিলো চিৎকার করে বলল শয়তান, তুই কতক্ষণ এভাবে আমার সঙ্গে লড়াই করবি?

চড়ের আঘাত, গালের ওপর। গ্রাসিলা পেছন ফিরে পড়ে গেলেন। অবাক হয়ে গেছেন তিনি।

বুঝতে পারলেন, তাঁকে সময়ের সাথে তাল রেখে চলতেই হবে।

তখন? তখন চারদিকে শুধুই অন্ধকার।

২. লাস লাভাস ডেল মারকোয়েস

০৬.

লাস লাভাস ডেল মারকোয়েস-স্পেন, ১৯৫০।

তখন সে ছিল পাঁচ বছরের বালিকা। মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে যায় একটা অদ্ভুত স্মৃতি। একটা নগ্ন পুরুষ দেহ, মায়ের খাটে এসে বসেছে। আবছা অন্ধকারে তার মুখ। তার শরীর, সব কিছু মনে পড়ে? একজন কি? নাকি অনেকজন।

মা বুঝিয়ে বলেছিলেন- এরা সবাই তোমার কাকু। তুমি এদের সকলকে ভালোবাসবে। সম্মান দেখাবে কেমন?

এইসব পুরুষেরা বিরাট আকারের। স্নেহ বিতরণ করতে জানে না। তারা রাত্রিতে থাকত, কখনও এক সপ্তাহ, কখনও বা এক মাস। তারপর বাতাসে ভর দিয়ে কোথায় হারিয়ে যেত। যখন তারা চলে যেত, ডলোরেস পিনেরো আবার একজন পুরুষের সন্ধান করতেন।

যৌবনকালে ডলোরেস ছিলেন অসামান্য রূপবতী। গ্রাসিলা মায়ের কাছ থেকে এই রূপের কিছুটা পেয়েছে। ছোটোবেলাতেই গ্রাসিলাকে দেখে অনেকে প্রেম নিবেদন করতে চাইত। আহা, অলিভ ফুলের মতো গায়ের রং, ঘন চকচকে কালো চুল, চোখের পাতার দিকে তাকালে মন কেমন করে। ছোটোবেলাতেই বোঝা গিয়েছিল, ভবিষ্যতে, সে পূর্ণ শশী হয়ে উঠবে। বছর কাটতে থাকে। ডলোরেস পিনেরোর শরীর তখন পৃথুলা হয়ে

গেছে। তার সুন্দর মুখের এখানে সেখানে মাংসের ছাপ লেগেছে। সময় এসে কপালে এঁকেছে দীর্ঘ বলিরেখা।

ডলোরেস পিনেরো আর এখন রূপসী নন। কিন্তু সহজে তাকে গ্রহণ করা যায়। ইতিমধ্যেই তিনি এক যৌন আবেদনময়ী শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে সুনাম লাভ করেছেন। অপরিচিত পুরুষের প্রেমে পড়া তার অন্যতম স্বভাব। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই কাজে ব্যস্ত আছেন। এইভাবেই শরীর বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন। এটা না হলে আর কী বা করবেন? তাই দেখা গেল, পুরুষ খদ্দেরের সংখ্যা তখনও বিশেষ কমেনি।

এই হল গ্রাসিলার মায়ের জীবনকথা। তিনি চেয়েছিলেন, মেয়েকেও এই পথের পথিক করতে। গ্রাসিলার বাবা ছিলেন এক তরুণ মেকানিক। একসময় তিনি সেদিনের তরুণী ডলোরেসকে ভালোবাসা অর্পণ করেছিলেন। দুজনের মধ্যে জমে উঠেছিল প্রেমের আসর, জানা গেল, বেচারী ডলোরেস গর্ভবর্তী, ভদ্রলোক কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডলোরেসকে এখন অভিশাপ একাই বহন করতে হবে।

ডলোরেস পিনেরো ছিলেন বদ স্বভাবের মহিলা। তিনি সমস্ত রাগ দুঃখ ঘৃণা ওই নবজাতিকার ওপর বর্ষণ করলেন। গ্রাসিলাকে দেখতে পারতেন না। বলা হত, সে নাকি তার বাবার মতো বোকা।

ছোটোবেলায় গ্রাসিলা এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে পালাতে চেয়েছিল। তার এই প্রয়াস সফল হয়নি। প্রত্যেক সকালে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত–ঈশ্বর, আজ মা

যেন আমাকে শারীরিক আঘাত না করতে পারে। আজ মাকে তুমি খুশি রেখো। মা যেন আমাকে একটুখানি ভালোবাসে।

যেদিনটা গ্রাসিলার ভালো কাটত, রাতে ভালো ঘুম হত তার। সেদিন মা তার দিকে ফিরেও তাকাতেন না। গ্রাসিলা নিজে ছোটো ছোটো হাতে তার খাবার তৈরি করত। জামাকাপড় পরিষ্কার করত। লাঞ্চের থালা সাজাত নিজেই। স্কুলের টিফিন বক্সে টিফিন ভরত। আর শিক্ষিকাকে বলত– আজ মা আমার জন্য পাউরুটি টোস্ট তৈরি করে দিয়েছে। মা জানে, আমি পাউরুটি খেতে কত ভালোবাসি।

অথবা, আমার পোশাক ছিঁড়ে গেছে। দেখুন ম্যাডাম, মা কীরকম যত্ন করে সেলাই করে দিয়েছে। মা আমার সব ব্যাপারে কত নজর দেয়।

অথবা, কাল আমি মাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাব।

এইসব শব্দগুলো শিক্ষয়িত্রীর মন ভেঙে দিত। আভিলার কাছাকাছি একটি ছোট্ট গ্রাম– লাস লাভাস ডেল মারকোয়েস, গ্রামের সবাই সবার হাঁড়ির খবর জানে। ডলোরেস পিনেরোর জীবনধারা গ্রামের আলোচ্য বিষয়। গ্রাসিলার ওপর তার প্রতিফলন পড়েছিল। অন্য কোনো মায়েরা তাদের ছোটো মেয়েদের সাথে গ্রাসিলাকে মিশতে দিতেন না। তারা ভাবতেন, ওই মেয়েটির সংস্পর্শে এলে নৈতিকতার অবমূল্যায়ন ঘটে যাবে। গ্রাসিলা পড়ত প্ল্যাজোলেটা ডেল ক্রিসটো স্কুলে। সেখানে তার কোনো বন্ধু ছিল না। ছিল না কোনো খেলার সাথী। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওই স্কুলে সে ছিল সবথেকে উজ্জ্বল ছাত্রী। কিন্তু

পরীক্ষার ফলাফল মোটেই ভালো হত না। কারণ সে কোনো ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারত না। ক্লান্তি এসে সবসময় তাকে অবসন্ন করে রাখত।

শিক্ষিকারা নিন্দা করে বলতেন তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবে গ্রাসিলা, যাতে ঠিকমতো কাজ করতে পারো।

অথচ গ্রাসিলা কিছুতেই তা করতে পারত না। কারণ তারা একটা ছোট্ট ঘরে থাকত। সে আর তার মা। ছোট্ট ঘরের কোচের ওপর ওই মেয়েটিকে ঘুমোতে হত। পাতলা পর্দা হাওয়াতে উড়ত। ওপাশে বেডরুম। গ্রাসিলা কী করে ঘুমোবে? কী করে মাকে বলবে, জেগে জেগে তাকে অশ্লীল কিছু শব্দ শুনতে হয়। সমস্ত রাত তার চোখের তারায় ঘুম আসে না। শুনতে হয়, তার মা সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পুরুষের সাথে ভালোবাসার গল্প বলছেন। বিছানাতে আহ্বান জানাচ্ছেন। শরীর মিলনের জন্য তীব্র আকুতি।

গ্রাসিলা যখন বাড়িতে তার প্রগতি পত্র নিয়ে আসত, মা চিৎকার করে বলতেন– এত কম নম্বর পেলে চলবে কী করে? তুই কি জানিস, তুই কেন এত খারাপ রেজাল্ট করিস? তুই মূর্খ, তুই বোকা। তোর মাথায় গোবর পোরা।

গ্রাসিলা তাই বিশ্বাস করত। তখন দুঃখে-কষ্টে কান্নাও ভুলে গেছে সে।

***

বিকেলবেলা স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, গ্রাসিলা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করত, ছোট্ট রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, দুপাশে একাশিয়া এবং সাইনামোর গাছের সারি। পাথরের ঘর চোখে

পড়ছে। কোথায় তার বাবা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করেন। গ্রাসিলার কয়েকজন বন্ধু ছিল, বাস্তবে নয়, কল্পনাতে। তারা সুন্দরী বালিকা, সুন্দর বালক, তারা মাঝে মধ্যে পার্টিতে গ্রাসিলাকে নিমন্ত্রণ করত। সেখানে সুন্দর কেক সরবরাহ করা হত। লোভনীয় আইসক্রিম। কাল্পনিক বন্ধুরা তাকে ভীষণ ভালোবাসত। তাদের সকলের চোখে গ্রাসিলা, আহা, এক বুদ্ধিমতী বালিকা। যখন মা কাছাকাছি থাকতেন না, গ্রাসিলা মনে মনে বন্ধুদের সাথে কথা বলত, মাঝে মধ্যে সে সত্যি সত্যি বানানো কথা বলত।

সে বলত–তোমরা কি আমাকে হোমওয়ার্কে সাহায্য করবে? গ্রাসিলা, আমরা তো জানি না, কীভাবে অঙ্ক করতে হয়। তুমি কত তাড়াতাড়ি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারো।

অথবা কেউ একজন বলত গ্রাসিলা, আজ রাতে আমরা কী করব? আমরা একটা সিনেমায় যাব। আমরা শহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে লেমনেট খাব।

অথবা তোমার মা কি তোমাকে অনুমতি দেবেন ডিনারে যোগ দিতে, গ্রাসিলা? সেখানে আমরা অনেক কিছু খাব।

অথবা মনে হচ্ছে, না মায়ের সাথে না থাকলে মা মনে মনে কষ্ট পায়, যদি মা রাজী হয়, তাহলে তোকে আমি নিশ্চয়ই জানাব।

রোববার গ্রাসিলার সকালে ঘুম ভাঙত। শান্তভাবে সে পোশাক পরত। মাকে জাগাত না, কারণ কোনো একজন কাকা তার পাশে শুয়ে আছে। সে একা একা হাঁটতে হাঁটতে সান জুয়ান বাউটিসকা চার্চে চলে যেত। ফাদার পিরেজ জীবনের কথা বলতেন। মৃত্যুর

পরবর্তী অনুভূতির কথা। যিশুর জীবনের গল্প। গ্রাসিলা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে চাইত না। সে যিশুকে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

ফাদার পিরেজ, চল্লিশ বছর বয়সের এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। তিনি গরীব এবং ধনীকে একই চোখে দেখেন। অসুস্থ এবং বলশালীর মধ্যে কোনো তফাত করেন না। তিনি লাস লাভাস ডেল মারকোয়েসে এসেছেন কয়েক বছর আগে। এই শহরের সব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন। ফাদার পিরেজ সব বাড়ির খবর জানতেন। তিনি জানতেন, গ্রাসিলা প্রতি রোববার চার্চে আসে। তিনি জানতেন, গ্রাসিলার পারিবারিক পরিস্থিতি কেমন। ডলোরেস পিনেরোর শয্যাসঙ্গিদের আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কেও তিনি খবর রাখতেন। তিনি জানতেন, এমন একটি বাড়ি কিশোরী কন্যা বেড়ে ওঠার পক্ষে মোটেই সুখদায়ক নয়। কিন্তু কী আর করা যাবে? মাঝে মধ্যে ওই ভদ্রলোক অবাক হতেন। ওই মায়ের এমন মেয়ে? গ্রাসিলা সহজ সরল। শান্ত স্বভাবের। কোনোদিন তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে পাদরির কাছে অভিযোগ করেনি।

পরিষ্কার পোশাক পরে গ্রাসিলা চার্চে আসত। পাদরি সাহেব জানতেন, এই পোশাকটা সে নিজের হাতে পরিষ্কার করে। ফাদার পিরেজ আরও জানতেন, এই মেয়েটি সকলের মধ্যে থেকেও একেবারে আলাদা। তিনি চেষ্টা করলেন, এই মেয়েটিকে আলাদা চোখে দেখতে। রোববারের বিশেষ প্রার্থনা সভার পর গ্রাসিলার জন্য একটু সময় দিতেন। মেয়েটার দুঃখ ভোলানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কখনও কখনও মেয়েটাকে নিয়ে কোনো কাফেতে চলে যেতেন। সামান্য কিছু খাবার। আহা, মহা আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাস হয়ে উঠেছে।

***

শীতকালে গ্রাসিলার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যেত। শীতকালগুলো তার কাছে। একঘেয়ে এবং বিষণ্ন কাতর বলে মনে হত। লাস লাভাস ডেল মারকোয়েস এমন একটি উপত্যকার ওপর অবস্থিত, যার চারপাশে ক্রাজ ভার্দে পর্বতের অবস্থান। এখানে ছমাস শুধুই শীতের ইশারা। হু-হুঁ করে বয়ে যাচ্ছে কনকনে বাতাস। বরং গরমকালের দিনগুলোে অনেক সহজ সরল। গরমে অনেক ট্যুরিস্ট সেই গ্রামে আসতেন। ওই ছোট্ট গ্রাম অথবা আধা শহরের বাতাসে তখন শুধুই হাসির উতরোল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তরুণ-তরুণীর একান্ত আলাপচারিতা। মনে হত এই প্রাণহীন শহর বুঝি কিছুদিনের জন্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ট্যুরিস্টরা মাঝে মধ্যে প্লাজা ডি ম্যানুয়েল এলগাটো ব্যারেটোতে যেতেন। সেখানে একটা সুন্দর ব্যান্ড-স্ট্যান্ড আছে। পাথর দিয়ে তৈরি, তারা অর্কেস্ট্রা তুলতেন। সারদানাতে গিয়ে আঞ্চলিক নাচের আসরে যোগ দিতেন। আহা, কত শতাব্দী ধরে এই লোকনৃত্যের আসর বসেছে। খালি পা, হাতে হাত, তারা এক বর্ণময় বৃত্ত রচনা করছেন।

গ্রাসিলা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত এইসব অচেনা আগন্তুকদের দিকে। তারা ফুটপাথে। বসে কফি পান করছে। যেখানে সেখানে পাগলের মতো জিনিসপত্র কিনছে। মাছের বাজারে গিয়ে দরদাম করছে। অথবা মাঝে মধ্যে তাদের দেখা যাচ্ছে, ওয়েসাইড পাবে। দুপুর একটা বেজেছে। প্রতিটি রেস্টুরেন্টে গমগম করছে মানুষ। কেউ মদ পান করছে, কেউ জুয়া খেলছে, কেউ বা সীফুডে মগ্ন, কেউ অলিভের দরদাম করছে, কেউ মুখে চিপ পুরে চুষছে।

গ্রাসিলার কাছে এটাই ছিল সব থেকে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। মাঝে মধ্যে সে বিকেলের দিকে তাকিয়ে থাকত। ছেলেমেয়েরা হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলেছে। প্লাজা মেয়রেই তাদের জোড়ায় জোড়ায় দেখা যাচ্ছে। ছেলেরা মেয়েদের অদ্ভুত চোখে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বাবা মায়েরা তাকিয়ে আছেন। চোখে চোখ পড়ছে। বন্ধুরাও। শকুনের মতো চোখ, কাফেতে ভিড়। আহা, এটাই বোধহয় কাছে আসার সময়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমন ঘটনাই ঘটে আসছে। গ্রাসিলার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে ভাবে, কবে ওই জনসমাগমে যোগ দেবে। কিন্তু মায়ের লাল চোখের ইশারা তার স্বপ্নটাকে মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দেয়।

মা চিৎকার করে বলতে থাকেন ছেলেদের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। তুমি কি বাজারের বেশ্যা হবে নাকি? ছেলেরা তোমার কাছ থেকে কী চায় বলো তো? ওই শরীরটা। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

মায়ের কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে তিক্ততা, বিরক্তি এবং বীতরাগ।

***

কখনও কখনও দিনগুলো সহনযোগ্য বলে মনে হত, রাতগুলো পরিপূর্ণ থাকত আর্তনাদে। মাঝে মধ্যে ওই হালকা পর্দাটা সরে যেত। গ্রাসিলার চোখের সামনে ভেসে উঠত নগ্ন দৃশ্যের মিছিল।

গোঙানির শব্দ। শিৎকার। দীর্ঘশ্বাস। আহা, এত অস্থিরতা?

–জোরে আরও জোরে?

–তুমি সুখী তো?

–ঠিক মতো ঢুকছে না?

–আমি কী করতে পারি?

দশ বছরের গ্রাসিলা স্পেনীয় ভাষার সব কটি খিস্তি খেউর শিখে নিল। তারা মাঝে মধ্যে ফিসফিস করে এইসব কথা বলত। গোঙানির শব্দ। শিৎকার। আরও কত কী। গ্রাসিলার মনের মধ্যে তখন একটা অদ্ভুত অবদমনের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে কী যেন একটা সত্তা এবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। গ্রাসিলা আকাঙ্খী হয়ে উঠল। একটুকরো প্রেম অথবা একবুক তিয়াসের জন্য!

***

গ্রাসিলা তখন চতুর্দশী। মুরের সঙ্গে দেখা হল। এত বড়ো মানুষের সাথে গ্রাসিলার এর আগে কখনও দেখা হয়নি। তার চামড়া ছিল সূর্যদীপ্ত। তার মাথায় এতটুকু চুল নেই। চওড়া দুটি কাঁধ, উপযুক্ত বুক, শক্ত দুটি হাত। মুর এসেছে মধ্যরাতে, গ্রাসিলা তখন ঘুমে অচেতন। ভোরবেলা মুরের সাথে দেখা হয়ে গেছে তার। পর্দা সরে গেছে। সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গ্রাসিলার বিছানার দিকে হেঁটে গেছে। তারপর মিলিয়ে গেছে উদ্যানের দিকে। গ্রাসিলা তার দিকে তাকিয়েছে। নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করেছে। অসাধারণ পৌরুষের প্রতীক। এই লোকটা আমার মাকে মেরে ফেলবে –গ্রাসিলা ভেবেছে।

মুর তার দিকে তাকিয়েছে–বাঃ-বাঃ, তাহলে? তোমার মতো একটা রত্ন এখানে লুকিয়ে আছে?

ডলোরেস পিনেরো চিৎকার করে উঠেছেন, বিছানায় বসে বসে আমার মেয়ে, সংক্ষেপে বলেছেন তিনি।

গ্রাসিলার সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত শিহরণ। সে মায়ের নগ্ন দেহ দেখে ফেলেছে। মুরের পাশে দেখেছে এবং শিহরিত হয়েছে।

মুর হেসেছে, হাসির মধ্যে সাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠেছে নাম কী খুকি তোমার?

সামনে নগ্ন পুরুষ দেখে গ্রাসিলার মুখে বেলা শেষের লালিমা। কথা আটকে গেছে তার।

–ও হল গ্রাসিলা, কেমন দেখছ ওকে?

–অসামান্যা রূপবতী। আমার মনে হয় না, তুমিও ওই বয়সে এমন সুন্দরী ছিলে?

–এখনও আমি তরুণী, ডলোরেসের মুখে খিল্লি হাসি, তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছেন –পোশাক পরে নাও, স্কুলের দেরী হবে।

–হ্যাঁ, যাচ্ছি মা।

মুর তখনও একদৃষ্টে গ্রাসিলার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে যেন সব কিছু গিলে খাবে।

এবার প্রবীণা ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন–এসো, বিছানাতে চলে এসো। খেলাটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

মুর বলল –পরে হবে। তখনও সে গ্রাসিলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

গ্রাসিলার মনে হল, মুরের চোখ থেকে লোভ ঝরে পড়ছে। বিষ তীর হয়ে আক্রমণ করছে বেচারী গ্রাসিলাকে।

***

মুর থেকে গেল। প্রত্যেক দিন যখন গ্রাসিলা স্কুল থেকে ফিরে আসে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, লোকটার কুৎসিত মুখ যেন না দেখতে হয়। কিন্তু সে জানে না, কেন সে এই পুরুষটিকে ভয় পায়। মুর কিন্তু ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এখনও অব্দি সে অশালীন আচরণ করেনি। কিন্তু মুরের চিন্তাই গ্রাসিলাকে শিহরিতা করে রাখে। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা অজানা কম্পন দেখা দেয়।

মায়ের প্রতি মুরের ব্যবহারের মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। একটা অন্যরকম উদাসীনতা। মুর এই ছোটো বাড়িতে সারাদিন থাকে। প্রচণ্ড মদ খায়, ডলোরেস পিনেরো যে টাকাটা আয় করেন, মুর সবটাই ছিনিয়ে নেয়। মাঝে মধ্যে মাঝরাতে ভালোবাসার খেলা চলতে থাকে। গ্রাসিলা শুনতে পায়, মুর মাকে আঘাত করছে,

সকালবেলা ডলোরেস পিনেরো শরীরে নানা চিহ্ন নিয়ে আবির্ভূত হন। বুঝতে পারা যায়, চোখের কোণে কালো দাগ, ঠোঁটের কোণে রক্ত ঝরছে, এসব হল মুরের শারীরিক আক্রমণের ফলশ্রুতি।

একদিন গ্রাসিলা জানতে চেয়েছিল, মা, তুমি ওই লোকটার সঙ্গে থাকো কেন?

মা জবাব দিয়েছিলেন বিষণ্ণভাবে –তুই বুঝতে পারবি না। ও সত্যিকারের পুরুষ। অন্যদের মতো মেনিমার্কা নয়। সে জানে, একজন মহিলাকে কীভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়। তাছাড়া ও সত্যি আমাকে ভালোবাসে। এই যে আমার সর্ব অঙ্গে দাগ দেখছিস, এ হল ভালোবাসার দংশন। তুই এখন বুঝবি নারে।

গ্রাসিলা বিশ্বাস করেনি। সে জানে মুর তার মাকে ব্যবহার করে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মা প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। কোনো কোনো সময় সে মায়ের রাগ দেখে অবাক হয়ে যায়। যখন ডলোরেস পিনেরো সত্যি রেগে যান, তার মধ্যে এক ধরনের উন্মাদনার জন্ম হয়। একবার তিনি গ্রাসিলাকে তাড়া করেছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি ছুরি। কারণ? গ্রাসিলা কী করেছে? সে কাকার জন্য আনা একটি চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। এই হল তার অপরাধ!

***

একদিন সকালবেলা, রবিবার, গ্রাসিলা তাড়াতাড়ি করছে, চার্চে যেতেহবে। মা আরও সকালে বাড়ি থেকে চলে গেছেন। হাতে সেলাই করা পোশাক খদ্দেরের বাড়ি পৌঁছে

দিতে হবে। গ্রাসিলা নাইট গাউন খুলল। পর্দা সরে গেল। মুর সামনে এসে দাঁড়াল। সে সম্পূর্ণ নগ্ন।

–তোমার মা কোথায় খুকি?

মা বাইরে গেছে, কিছু কাজ আছে।

মুর এক দৃষ্টে গ্রাসিনার উলঙ্গ দেহের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বলল–সত্যি, ভগবান তোমাকে কী দিয়ে তৈরি করেছেন।

এই প্রশংসা গ্রাসিলার মুখে লাল আভা এনে দিয়েছে। গ্রাসিলা জানে এখন তাকে কী করতে হবে। এখনই এই নগ্নতা ঢেকে দেওয়া উচিত। স্কার্ট এবং ব্লাউজ পরতে হবে। এখান থেকে চলে যেতে হবে কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সে যেতে পারল না। মনে হল কোনো এক জাদুকর বুঝি তাকে মাটির সঙ্গে আটকে রেখেছে। সে দেখতে পেল, মুরের পৌরুষ ক্রমশ জেগে উঠছে। চোখের তারায় একটা অদ্ভুত দীপ্তি।

শুনতে পাচ্ছে, কানের ভেতর, সেই অদ্ভুত শব্দ, আরও জোরে আরও জোরে, কী হচ্ছে কী? সবটা আমার ভেতর ঢুকিয়ে দাও।

গ্রাসিলা অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

মুরের গলা খসখসে তুমি এখন এক বালিকা, পোশাক পরে নাও। এখান থেকে চলে যাও।

গ্রাসিলা নিজেকে ফিরে পেল। পালাতে হবে, এই ভয়ংকর লোকটার হাত থেকে। সে সরে গেল, এগিয়ে গেল, কিন্তু এ কী? কী এক অজানা আকর্ষণ তাকে মুরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সে মুরের কোমরে হাত রাখল। বুঝতে পারল, একটা সবল পুংদণ্ড তাকে আঘাত করছে।

গ্রাসিলা গুঙিয়ে উঠল না, ঈশ্বরের দোহাই, আমি কিন্তু সব বুঝতে পারি। আমি এখন আর খুকিটি নই।

গ্রাসিলা এ ধরনের অনুভূতি কখনও পায়নি। একটা অচেনা আবেগ, বন্য উত্তেজনা, অসহনীয়। ভালোবাসার আনন্দ, উদ্বেগ, আকুলতা, বাসনা-কামনার আলোড়ন। সে মুরকে জড়িয়ে ধরেছে। আলিঙ্গনে কী সুখ! তার মুখ দিয়ে শিৎকারের শব্দ বেরিয়ে আসছে। মুর এবার শুরু করেছে তার খেলা। তৃপ্তির চরম অবস্থা, গ্রাসিলা ভাবল, তাহলে এই হল আসল জীবন রহস্য। শেষ অব্দি সে সব কিছু জানতে পারল। এটাই হল সৃষ্টির উৎস। এটাই হল জীবনের অঙ্গাঙ্গী অংশ। এই হল এমন একটা আনন্দ, যা লাভ করার জন্য আমরা তৃষিত তাপিত হয়ে অপেক্ষা করে থাকি।

-কী হচ্ছে? তোমরা করছ কী?

ডলোরেস পিনেরোর কণ্ঠস্বর আর্তনাদ, ভয়ার্ত হাহাকার। এক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল সময় যেন তুষারে আবৃত। ডলোরেস পিনেরো তাকিয়ে আছেন, বিছানার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে। ভাবতেও পারছেন না, তার অবর্তমানে মেয়ে এবং মুর শরীরের সেই খেলায় মেতে উঠবে।

গ্রাসিলা মার দিকে তাকাল। ভয় পেয়ে গেছে। মুখে কোনো শব্দ করতে পারছে না। ডলোরেস পিনেরোর চোখে জেগেছে বন্য উত্তেজনা।

কুকুরির বাচ্চা, তুই একটা কুকুরি।

–মা-মা, প্লিজ।

ডলোরেস পিনেরো হাতে তুলে নিয়েছেন লোহার অ্যাশট্রে। সেটাকে ছুঁড়ে দিয়েছেন মেয়ের মাথা লক্ষ্য করে।

এটাই হল শেষ অনুভূতি, যেটা গ্রাসিলার মনে পড়ে, আবছা-আবছা, চেতন এবং অচেতনের মাঝে একটি সরু সুতোর ওপর তা ভাসছে।

***

ঘুম ভেঙেছিল অনেকক্ষণ বাদে। হাসপাতালের শয্যা। অদ্ভুত কষ্ট। পাশাপাশি ছাব্বিশটি বেড সাজানো আছে। প্রত্যেকটি বেডে একজন করে পেশেন্ট। নার্সদের ছুটোছুটি এখানে সেখানে। প্রত্যেক পেশেন্টকে দেখতে হবে।

গ্রাসিলার মাথা ফেটে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা। যতবার সে পাশ ফেরার চেষ্টা করেছে, আগুনে নদী তাকে গ্রাস করেছে। সে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে আছে। অন্য রোগীদের আর্তনাদ এবং কান্না শুনেছে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। গোধূলির অস্তরাগ। অল্পবয়সী এক ডাক্তার তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিরিশ বছর বয়স হয়েছে কি? দেখলে মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত ভার নিয়ে তিনি বুঝি ভারাক্রান্ত। অকালে বুড়িয়ে গেছেন।

–তাহলে তোমার ঘুম ভাঙল?

আমি কোথায়? গ্রাসিলার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

–তুমি এখন আভিলার হসপিটাল প্রভিনশিয়ালের চ্যারিটি ওয়ার্ডে আছে। গতকাল তোমাকে এখানে এনে ভর্তি করা হয়েছে। তোমার অবস্থাঁ চোখে দেখা যাচ্ছিল না। তোমার কপালে সেলাই করতে হয়েছে।

ডাক্তার বলে চলেছেন আমাদের চিফ সার্জেন নিজে এই কাজটা করেছেন। তিনি । বলেছেন, তোমার দিকে তাকানো কষ্ট হয়। তুমি এত সুন্দর, ভাবতে খারাপ লাগছে তোমার কপালে একটা দাগ হয়ে গেল।

গ্রাসিলা ভাবল –খারাপ কী হবে? সারাজীবন আমাকে এই কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হবে।

***

দ্বিতীয় দিন ফাদার পিরেজ গ্রাসিলাকে দেখতে এলেন। নার্স চেয়ার এগিয়ে দিলেন। ওই পাদরি সাহেব গ্রাসিলার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। মুখখানা কেমন বিবর্ণ হয়ে

গেছে। চোখের তারায় ধূসর বিষণ্নতা। গ্রাসিলাকে এই অবস্থায় দেখে তার হৃদয় বিগলিত হয়েছিল। তিনি সব শুনতে পেয়েছেন। লাস লাভাস ডেল মারকোয়েসের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে এই গুজব। গুজব নয়, সত্যি কথা। কিন্তু তিনি কিছুই মনে করছেন না। অথচ, কেউ কেউ এই ঘটনাটাকে চেপে দেবার চেষ্টা করেছে।

যেমন ডলোরেস পিনেরো সকলকে বলে বেড়িয়েছেন– সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মেয়ের মাথা ফেটে গেছে।

এখন ফাদার পিরেজ প্রশ্ন করলেন- গ্রাসিলা, তুমি এখন কেমন বোধ করছো?

গ্রাসিলা মাথা নাড়ল, সে তাকাল ফাদারের দিকে।

–একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? সত্যি কথা বলবে? কী করে এমন ঘটনা ঘটল?

অনেকক্ষণ নীরবতা। শেষ পর্যন্ত গ্রাসিলা বলল– এটা নেহাতই একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

ফাদার গ্রাসিলার মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, তাই নাকি?

তিনি খুবই দুঃখ পেয়েছেন। দুঃখে তাঁর মুখ ভরে উঠেছে। তিনি বললেন–গ্রাসিলা, আমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলেছি।

গ্রাসিলা বলল– আমি বাড়িতে যাব না, আমার কি যাওয়া উচিত?

সূচিপত্র

না, আমার মনে হচ্ছে তুমি বাড়িতে যেও না। আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, তিনি এক হাত রাখলেন গ্রাসিলার হাতে। বললেন- কাল তোমাকে দেখতে আসব।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ফাদার।

ফাদার চলে গেলেন, গ্রাসিলা সেখানে অনেকক্ষণ শুয়েছিল, তারপর সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল- ভগবান, তুমি আমকে মেরে ফেলো, আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

সে এখন কোথায় যাবে? কোথাও যাবার তো তার জায়গা নেই। সে আর কোনোদিন বাড়িতে ফিরতে পারবে না। সে আর কখনও স্কুলে যেতে পারবে না। সে আর কোনোদিন তার ম্যাডামদের পরিচিত মুখ দেখতে পাবে না।

পৃথিবী এখন একেবারে শূন্য হয়ে গেছে তার কাছে। চারপাশে শুধুই অন্ধকার আর নিরাশা।

একজন নার্স জিজ্ঞাসা করল–তোমার কিছু কি লাগবে?

গ্রাসিলা নার্সের দিকে তাকাল। মুখে হতাশা। কী বলার আছে? সে নিশ্চুপ হয়ে থাকল।

***

পরের দিন ডাক্তার আবার এলেন।

তিনি বললেন- তোমার জন্য ভালো খবর আছে, তুমি আজ হাসপাতাল ছাড়তে পারবে। এটা একটা মিথ্যে কথা। বাকিটা হয়তো সত্যি। কারণ এই বিছানাটা আমাদের লাগবে। অন্য একজন রোগী এসে গেছে।

গ্রাসিলা বুঝতে পারল, তাকে এখন চলে যেতে হবে। কিন্তু সে কোথায় যাবে?

***

একঘণ্টা বাদে ফাদার পিরেজ আবার এলেন। তার সঙ্গে আরেক জন পাদরি ছিলেন।

–ইনি ফাদার বেরেনডো, আমার এক পুরোনো বন্ধু।

গ্রাসিলা বিষণ্ণ মুখে ওই ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। বলল–ফাদার?

–হ্যাঁ, ফাদার বেরেনডো ভাবলেন, সত্যিই সে অসামান্যা রূপবতী।

গ্রাসিলার কী হয়েছে, ফাদার পিরেজ সংক্ষেপে সব বলেছে। আরও বলেছেন, কীরকম পরিবেশের মধ্যে এই মেয়েটি বড়ো হয়ে উঠেছে। আছে জীবনের তিক্ততা, আছে নিজেকে অপমান করার ইচ্ছা, কিন্তু, মেয়েটির সরল মুখে তার কোনো ছবি নেই।

ফাদার বেরেনো বললেন– তোমার এই অবস্থার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে তুমি এগিয়ে চলেছ। হয়তো এই শব্দগুলোর আলাদা একটা মানে আছে। বেচারী গ্রাসিলা তা বুঝতে পারেনি।

ফাদার পিরেজ বললেন- গ্রাসিলা, আমি লাস লাভাস ডেলা মারকোয়েসে ফিরে যাব। তোমাকে ফাদার বেরেনডোর হাতে ছেড়ে যাচ্ছি কেমন?

এই কথা শুনে গ্রাসিলার মনের ভেতর উদ্বেগ আকুলতার জন্ম হয়েছিল। মনে হয়েছিল সে বোধহয় বাড়ির সঙ্গে শেষ সম্পর্ক ছিন্ন করল। সে চিৎকার করে বলেছিল–আমাকে এভাবে একলা ফেলে আপনি কোথাও যাবেন না।

ফাদার পিরেজ তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন– আমি বুঝতে পারছি, তুমি এখন নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করছ। কিন্তু তা ভাবছ কেন? আমাকে বিশ্বাস করো, তোমার দুঃখে আমার হৃদয় গলে গেছে। দেখো, ভবিষ্যৎ দিন কিন্তু এত খারাপ থাকবে না।

একজন নার্সকে দেখা গেল, বেডের দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাতে একটি বাণ্ডিল। সে ওই বাণ্ডিলটা গ্রাসিলাকে দিয়ে বলল– এ হল তোমার জামা-কাপড়। এখনই তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

গ্রাসিলার মনে আরও আতঙ্ক– এখনই?

দুজন পাদরি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

–তুমি পোশাক পরে নাও, আমাদের সঙ্গে চলে এসো, ফাদার বেরেনডো বললেন– আমরা কথা বলব।

পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। ফাদার বেরেনডো গ্রাসিলার হাতে হাত রেখেছেন। গ্রাসিলা হাসপাতালের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। উজ্জ্বল সূর্যের আলোে, সামনে একটা সুন্দর বাগান। আহা, রং-বেরঙের ফুল ফুটেছে। কিন্তু গ্রাসিলার মন এতই ভারাক্রান্ত যে, ফুলের সৌন্দর্য তাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারল না।

***

এবার অফিসে তারা পৌঁছে গেছেন। ফাদার বেরেনডো বললেন ফাদার পিরেজ আমাকে সব বলেছেন, এই পৃথিবীতে তোমার থাকার কোনো জায়গা নেই।

গ্রাসিলা মাথা নাড়ল।

–কোনো আত্মীয়?

না, মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

–মাদার পিরেজ বলেছেন, তুমি নাকি প্রতি রোববার চার্চে যেতে?

-হ্যাঁ, যেতাম আমি। কী সুন্দর ছিল রবিবারের ওই সকালগুলো। চার্চের পরিবেশ খুবই ভালো লাগত। সে যিশুর সাথে দেখা করার জন্য উদগ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করত ক্ষণকালের জন্য ভুলে যেত জীবন যন্ত্রণা।

গ্রাসিলা, তুমি কখনও কনভেন্টে থাকার কথা ভেবেছ? না, এই চিন্তাধারা কখনও গ্রাসিলাকে আক্রান্ত করেনি।

.

–আভিলাতে একটা কনভেন্ট আছে, মিশনারীদের কনভেন্ট। তুমি সেখানে থাকতে পারো। নিরাপত্তার অভাব হবে না।

চিন্তাটা আতঙ্কঘন জানি না, কনভেন্ট সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।

কনভেন্ট সকলের জন্য। ফাদার বেরেনডো বলেছিলেন, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। সেখানে গেলে অনেক কঠিন অনুশাসন পালন করতে হয়। একবার তুমি যদি গেট দিয়ে ওখানে প্রবেশ করো, আর শপথ গ্রহণ করো, তাহলে তুমি আর কখনও কনভেন্ট থেকে বাইরের পৃথিবীতে আসতে পারবে না। কারণ তোমাকে ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে হবে। এই শপথ ভাঙা যায় না।

গ্রাসিলা সেখানে বসে ছিল। তার মনে পরস্পর বিরোধী ভাবনার অনুরণন। সে জানলা দিয়ে আকাশ দেখছিল। পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে? বন্দী জীবন কাটাবে? এছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে সে? পৃথিবীতে কোথাও তার জন্য এক টুকরো নিরাপদ আশ্রয় আছে কী? যন্ত্রণা এবং অবিশ্বাস। অসহনীয় এবং দুঃখজনক। মাঝে মধ্যে সে আত্মহননের কথা চিন্তা করে। কিন্তু কনভেন্টের জীবন তাকে নতুন আশা দেবে। হতে পারে বন্দী জীবন, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাকে তো রিক্ত বিবিক্ত হতে হবে না।

ফাদার বেরেনডো বললেন আমি বুঝতে পারছি, তুমি এখন কী চিন্তা করছে। যদি তুমি রাজী থাকো, আমি তোমাকে মহতী মাদার প্রাওরেসের সঙ্গে দেখা করাব।

.

গ্রাসিলা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়েছিল- ঠিক আছে আমি রাজী।

***

মাদার একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন এই কিশোরী কন্যার মুখের দিকে। অনেক অনেক দিন আগে তিনি দৈববাণী শুনেছিলেন– এক কিশোরী কন্যা আসবে তোমার কাছে। তুমি তাকে নিরাপত্তা দিও।

-তোমার বয়স কত?

–চোদ্দো। ।

মেয়েটি যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, কতদিন আগে মহামান্য পোপ ঘোষণা করেছিলেন, বারো বছর হয়ে যাবার পর কোনো কিশোরী কন্যাকে আর সেবিকা হতে দেওয়া হবে না।

গ্রাসিলা মাদার বেটিনাকে বলেছিলেন- আমার ভীষণ ভয় করছে।

***

এই শব্দগুলো বেটিনার মনে প্রতিধ্বনি তুলেছে আমার ভীষণ ভয় করছে।

কত কত বছর হয়ে গেল। তিনি জানেন না, কোথায় এই ডাক? ফাদার? আমি ভীতা সন্ত্রস্তা।

বেটিনা, ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার প্রথম সংযোগ কখন হবে? যখন তুমি বিপদের মধ্যে পড়বে।

বেটিনা ভাবছিলেন, আমার ডাক কি এসেছে? এই মেয়েটিকে আমি কি করে সাহায্য করব?

ধর্ম সম্বন্ধে তার কি ধারণা ছিল? ছোটোবেলায় তিনি রবিবার চার্চে যেতেন না। মনে পড়ে যায় কিশোরী বেলার কথা। ভালোম পোশাক পরতেন, ছেলে বন্ধু ছিল অগুণতি। মাদ্রিদ শহরের একাধিক ছেলে তখন তাকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া। কিন্তু কেন? এই জীবন কী করে এল? অনেক কিছু ভাবতে থাকেন তিনি। কখনও তিনি এই সন্ন্যাসিনী জীবনের কথা ভাবেননি। উনিশ বছর বয়স, এমন একটা ঘটনা ঘটল, জীবনটা একেবারে পালটে গেল।

তিনি বিছানাতে শুয়ে ছিলেন, ঘুমিয়ে ছিলেন, একটা কণ্ঠস্বর তাকে বলল, বেটিনা, ওঠো জাগো, বাইরে যাও।

তিনি চোখ মেলে দিলেন, উঠে বসলেন, ভয় পেয়েছেন। আলো জ্বেলে দিলেন, বেডসাইড ল্যাম্প। তিনি একা, কী অদ্ভুত স্বপ্ন।

কিন্তু ওই শব্দটা তিনি শুনেছেন। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুমের রাজত্বে পা দিতে পারলেন না।

বেটিনা উঠে বাইরে যাও। এটা আমার অবচেতন মন, উনি ভাবলেন। আমি এখন মধ্যরাতে বাইরে গিয়ে কী করবো?

তিনি আলো নিভিয়ে দিলেন। আবার আলো জ্বালালেন।

ড্রেসিং গাউন পরলেন। স্লিপার পরলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে আছে।

কিচেনের দরজা খুলে দিলেন। একটা অদ্ভুত ভয়ের অনুভূতি তাকে আক্রমণ করেছে। তিনি বুঝতে পারছেন, তাকে এখন পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে হবে। তিনি অন্ধকারের দিকে তাকালেন। তার চোখ পড়ল চাঁদের ধূসর আলোর দিকে। দেখা গেল একটা পুরোনো রেফ্রিজারেটার দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এখন ভাঙা জিনিসপত্র রাখা হয়।

বেটিনা জানতে পারলেন, কেন তিনি এখানে এসেছেন। তিনি ওই রেফ্রিজারেটারের দিকে এগিয়ে চলেছেন। মনে হল কেউ যেন তাকে সম্মোহিত করেছে। আহা, তিনি রেফ্রিজারেটারের ঢাকনা খুললেন। তিন বছরের ভাইকে সেখানে পাওয়া গেল, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

এটাই হল প্রথম ঘটনা। কোনো কোনো সময় বেটিনা এই ঘটনাটিকে বোঝবার চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভাবেন। আমি শুনেছিলাম, কে যেন আমাকে

ডাকছে। আমি জানতাম পুরোনো রেফ্রিজারেটারটা ওখানেই আছে। আমি জানতাম এর ঢাকনা এখুনিই খুলতে হবে।

পরবর্তী অভিজ্ঞতাটা খুব সহজে বলা যায় না। একমাস পরের ঘটনা।

ঘুমন্ত অবস্থায় বেটিনা আবার শুনতে পেয়েছেন দৈববাণী– আগুনটা নিভিয়ে দাও।

বেটিনা উঠে পড়লেন, ঘুম ভেঙে গেছে। নাড়ির গতি দ্রুত হয়েছে। আবার, আবার কী তিনি ঘুমোতে পারবেন? তিনি ড্রেসিং গাউন পরলেন, স্লীপার পায়ে গলিয়ে দিলেন। চলে গেলেন বাইরে, কোনো ধোঁয়া নেই, কোনো আগুন নেই। তিনি মা-বাবার বেডরুমের দরজা খুললেন। সবকিছু ঠিক আছে। ভাইয়ের বেডরুম? আগুনের শিখা আছে কি? সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। প্রত্যেকটা ঘর ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। কোথাও আগুনের চিহ্ন নেই।

বেটিনা ভাবলেন, আমি একটা বোকা, এটা নেহাতই একটা স্বপ্ন।

তিনি বিছানাতে ফিরে গেলেন। আর তখনই বাড়িতে একটা বিস্ফোরণ হল। প্রচণ্ড শব্দ, ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভেঙে পড়েছে। তিনি এবং তার পরিবারের সকলে পালাতে পেরেছিলেন। কোনোভাবে ফায়ার ব্রিগেডের মানুষরা এসে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিল।

একজন ফায়ারম্যান ব্যাপারটা ব্যাখা করলেন- বেসমেন্টেই আগুনের ফুলকি দেখা যায়, বয়লার ফেটে যায়।

পরবর্তী ঘটনা ঘটল তিন সপ্তাহ বাদে। এটা কিন্তু কোনো স্বপ্ন নয়।

বেটিনা পড়ার ঘরে বসেছিলেন, পড়ছিলেন, মনে হল কে যেন হেঁটে চলেছে বাগান দিয়ে। ভদ্রলোক বেটিনার দিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য? এ কে? বেটিনা ওই মানুষটির ছবি কখনও মন থেকে মুছতে পারেনি।

তিনদিন কেটে গেছে, বেটিনা একটা অফিস ঘরে বসে আছেন, বাইরে এলেন, লিফটের জন্য অপেক্ষা করছেন। লিফট এসে গেল। দরজা খুলে গেল। বেটিনা ভেতরে পা দিতে যাবেন, হঠাৎ তাকালেন লিফট অপারেটারের মুখের দিকে। বুকের ভেতর ধক করে উঠল। এই মুখটি তিনি বাগানে দেখেছেন। বেটিনা ভয় পেয়ে পেছন দিকে ফিরে এলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লিফট ওপরে উঠে গেল। এক মুহূর্ত পরে লিফট হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। সকলেই মারা গেল।

পরের দিন রোববার, বেটিনা চার্চে গেলেন।

হে ঈশ্বর, আমি জানি না কেন আমাকেই এইসব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমাকে কী করতে হবে? অনুগ্রহ করে সঠিক পথ বাতলে দিন। বলুন কোথায় গেলে আমি শান্তি পাবো।

উত্তর ভেসে এলো মধ্যরাতে, ঘুমন্ত বেটিনার কানে কানে কে যেন বলে দিল– আরও, আরও বেশি ত্যাগ, আরও তিতিক্ষা এবং ধ্যান।

বেটিনা ভাবলেন সমস্ত রাত্রি ধরে, সকাল হল, তিনি যাজকের কাছে গেলেন। ভদ্রলোক মন দিয়ে বেটিনার সব কথা শুনেছিলেন।

–ও, তুমি সেই ভাগ্যবতীদের একজন, তোমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

–কী জন্য?

–তুমি কি ঈশ্বরের জন্য তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করতে চাও?

–আমি জানি না, আমার ভয় করছে।

শেষ পর্যন্ত তিনি কনভেন্টে যোগ দিয়েছিলেন।

আমি আমার জীবনের সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি। মহতী মাদার বেটিনা চিন্তা করলেন, এত আনন্দ, আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

***

এখন এই চতুর্দশী কিশোরী কন্যাটি বলছে– আমি ভয় পেয়েছি।

মহতী মাদার গ্রাসিলার হাতে হাত দিলেন– সময় নাও গ্রাসিলা, ভগবান তোমার সঙ্গে আছেন। তুমি ভেবো না, তুমি একা। পৃথিবীর সর্বত্র তিনি ছড়িয়ে আছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাকে চোখে দেখতে পাই না।

www.bengaliebook.com

কী চিন্তা? আমি আছি, আমি সবখানে আছি। গ্রাসিলা ভাবল। তারপর? নীরবতা, নৈঃশব্দ, আমি বিচ্ছিরি শব্দ শুনেছি। গ্রাসিলা মাদারের মুখের দিকে তাকাল। বলল- হ্যাঁ, এবার আমি নীরবতার জগতে প্রবেশ করব।

***

সতেরো বছর কেটে গেছে, তখন থেকে গ্রাসিলা এক অনাস্বাদিত আনন্দের সম্মুখীন হয়েছেন। জীবনে প্রথম তিনি এই আনন্দের সন্ধান পেলেন। তার জীবনটাকে ভগবানের চরণতলে উৎসর্গ করেছেন। অতীতের দৃশ্য আর কোনোভাবে তাকে তাড়িত করতে পারে না। সেই আতঙ্কঘন মুহূর্তগুলোকে তিনি ভুলে গেছেন। তিনি এখন যিশুর পরম প্রিয়াতে পরিণত হয়েছেন। জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে, তিনি যিশুতেই মিলে যাবেন।

বছর এগিয়ে গেছে নীরবতার মধ্যে, মাঝে মধ্যে নৈশকালীন দুঃস্বপ্ন। ভয়ংকর শব্দ, এছাড়া, আর কোনো স্মৃতি নেই। গ্রাসিলা জানেন, ধীরে ধীরে ওই অতীতটা একেবারে মরে যাবে।

.

সিস্টার গ্রাসিলাকে অনেক কাজ দেওয়া হল। বাগানের কাজ করতে হল। বাগানের কাজ করতে তিনি ভালোবাসেন। আহা, ঈশ্বরের, এই অসাধারণ সৃষ্টি। ছোটো ছোটো ফুলগুলি। কোনো পাপ করতে জানে না। চারপাশে উঁচু পাঁচিল। বাইরের পৃথিবীর শব্দ এখানে আসে না। মনে হয়, এটা বুঝি পাথরের তৈরি পাহাড়। গ্রাসিলার কখনও একা মনে হয় না, মনে হয় তিনি বোধহয় এই জগতে নিজেই রানী হয়ে বসে আছেন।

***

কনভেন্টের জীবন শান্তি এবং স্তব্ধতায় ভরা। হঠাৎ আবার সেই দুঃস্বপ্নের রাত ফিরে এসেছে। দুঃস্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠেছে। পৃথিবীটা বর্বর জাতিতে ভরে গেছে। তারা গ্রাসিলাকে এই অঞ্চল থেকে বাইরে নিয়ে আসবে। যে পৃথিবী থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন, আবার তাকে সেই পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে। সমস্ত পাপগুলো ফিরে এসেছে, আতঙ্কঘন পরিবেশ। মুর ফিরে এসেছে। মুরের মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। মুরের সাথে লড়াই করে তিনি পারবেন কি? গ্রাসিলা চোখ খুললেন। আহা, লোকটি তার ভেতর নিজেকে প্রবেশ করাচ্ছে। পৌরুষের দ্বন্দ্ব। সে বলছে– আমার সাথে লড়াই কোরো না সিস্টার, এটাকে ভালোবাসার চেষ্টা করো। দেখবে, তুমি এমন আনন্দ পাবে, বাকি জীবন ভুলতে পারবে না।

গ্রাসিলা চিৎকার করলেন মা, মা, আমাকে সাহায্য করো!

.

০৭.

লুসিয়া কারমাইনের মনের ভেতর একটা অদ্ভুত ধারণা। তিনি এগিয়ে চলেছেন রাস্তা দিয়ে। মেগান এবং থেরেসার সঙ্গে। হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। আহা, কতদিন বাদে চলার সাথে সিল্কের খসখসানি শব্দ। তিনি অন্য দুজনের দিকে তাকালেন। তাদের আচরণের মধ্যে একধরনের স্নায়বিক দুর্বলতা ফুটে উঠেছে। নতুন পোশাক তারা মোটেই

পছন্দ করছেন না। অনভ্যস্তের মতো হাঁটছেন। আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন। বুঝতে পারা যাচ্ছে, এই স্কার্ট এবং মোজা পরে তাদের খুবই অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তারা বোধহয় ভিনগ্রহের বাসিন্দা। তাঁরা এই পৃথিবীর কেউ নন। লুসিয়া ভাবলেন, বোধহয় তাদের আচরণের ভেতর একটি মাত্র আবেগের অনুরণন আমাদের ধরে ফেলল।

সিস্টার থেরেসাকে সব থেকে খারাপ অবস্থায় মনে হচ্ছে। ত্রিশ বছর কেটে গেছে, কনভেন্টের মধ্যে, একধরনের শালীনতা বোধের জন্ম হয়েছে তার আচরণের মধ্যে, এখন সেই শালীনতাবোধ ভেঙে যাচ্ছে খান খান হয়ে। ব্যাপারটা তিনি মোটেই পছন্দ করছেন না। এখন তাকে যে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই পৃথিবীর ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেকে মানাতে পারছেন না। কনভেন্টের সব কিছুই তার কাছে চরম বাস্তব। তিনি আবার একটি কনভেন্টে ফিরতে চাইছেন। নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে ঢুকতে চাইছেন।

মেগান চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল। সকলে চোখ দিয়ে তাকে গিলে খাচ্ছে। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন। মুখে লজ্জার আভা লেগেছে। তিনি এমন একটি জগতে বাস করেছেন, যেখানে শুধুই মেয়েদের একাধিপত্য। পুরুষ মানুষ কেমন দেখতে তা ভুলে গিয়েছিলেন। এখন এত পুরুষ দেখে মনটা তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিজনক, আবার উত্তেজকও বটে। চারপাশের মানুষরা মেগানকে দেখে কী ভাবছেন? কবরের অন্ধকার থেকে তিনি উঠে এসেছেন? অনেক বছর বাদে তিনি তার নারীত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠলেন।

তাঁরা পার্কে চলে গেলেন। আবার উত্তেজক কথাবার্তা শোনা গেল। রাম এবং গানের আন্দোলন। কারিলো কী করছে? রক অ্যান্ড রোল? হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন। তরুণ

তরুণীরা এই গানের তালে তালে নাচতে ভালোবাসে। ব্যাপারটা আমাদের আকৃষ্ট করবে কী?

মেগানের মনে হল, সত্যিই তো, এর মধ্যে জীবন আছে, যৌবনের উন্মাদনা আছে। ওঁরা একটা সিনেমা হলের পাশ দিয়ে গেলেন। ওই পাদ্রীসাহেব বলেছিলেন কি ধরনের সিনেমা এখন দেখানো হচ্ছে। ভাবলে অবাক হতে হয়। এই সিনেমাকে কি আমি একটি পর্ণগ্রাফি বলতে পারি? জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ছবিগুলোকে সকলের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।

মেগানের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে। কারিলো গত কুড়ি বছর ধরে একটি মনাস্ট্রিতে জীবন কাটাচ্ছেন? তা হলে? তা হলে তিনি রক গান সম্পর্কে এত কথা কোথায় জানলেন? এই সিনেমাতে কী দেখানো হয় তাই বা কী করে জানলেন? কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।

তিনি লুসিয়ার দিকে তাকালেন। থেরেসার দিকেও তাকালেন। বললেন- এখুনি দোকানে ফিরতে হবে।

তারা এগিয়ে গেলেন। মেগান ছুটতে শুরু করেছেন, খুব তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি ওই বন্ধ দরজার ভেতর পৌঁছোতেই হবে।

***

গ্রাসিলাকে মেঝের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রাসিলা তখন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন নিজের নারীত্ব বাঁচানোর জন্য। কারিলোকে আঁচড়ে কামড়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

-কী হচ্ছে? এরকম করলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব।

কারিলোর মুখে নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি।

সে একটা শব্দ শুনতে পেল। তার মাথার ভেতর বিস্ফোরণ। সে দেখতে পেল হিলতলা একটা জুতো দ্রুত ছুটে আসছে মাথার কাছে। তারপর? এটাই বোধহয় শেষ ঘটনা যেটা সে মনে রেখেছিল।

মেগান ইতিমধ্যেই শিহরিত গ্রাসিলাকে টেনে নিয়েছেন। তাকে জড়িয়ে ধরেছেন–ঠিক আছে, আমরা এসে গেছি। শয়তান আপনার খুব ক্ষতি করতে পারেনি তো?

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে, গ্রাসিলা কোনোরকমে বলেছেন- ওঃ, ওঃ, ভাগ্যিস আপনি এসেছেন, তা না হলে কী যে হত? লুসিয়া ও থেরেসাও ওই দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ব্যাপারটা কী ঘটেছে লুসিয়া এক লহমাতে বুঝে নিয়েছেন।

বেজন্মার বাচ্চা!

তিনি অচেতন অর্ধনগ্ন ওই মূর্তিটার দিকে তাকালেন। গ্রাসিলা মেঝেতে শুয়ে আছে। অন্যরাও ভালোভাবে দেখলেন। লুসিয়া এককোণ থেকে বেল্ট নিয়ে এলেন। মেগান

কারিলোর হাত দুটি বেঁধে দিলেন পিছমোড়া করে। তারপর বললেন- থুঃ থুঃ, তিনি বললেন মেগানকে, ভালোভাবে বাঁধুন তো। মেগান কাজ করতে লেগে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত লুসিয়া খুশি হলেন। ঠিক আছে, বিকেলবেলা দোকান খুলবে, তখন এই লোকটি বলবে এখানে সে কী করছিল?

লুসিয়া গ্রাসিলার দিকে তাকিয়ে বললেন– আপনি ঠিক আছেন তো?

গ্রাসিলা হাসার চেষ্টা করছিলেন- হ্যাঁ।

–এখন এখান থেকে যেতে হবে, মেগান বললেন, পোশাক পরে নিন তাড়াতাড়ি।

যখন তারা বেরোতে যাবেন, লুসিয়া হঠাৎ বললেন- এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।

তিনি ক্যাশ লিস্টারের দিকে চলে গেলেন। একটা চাবি হাতে পেলেন। পাওয়া গেল, কয়েকশো পেস্টার, ভেতরে ছিল। তিনি অতি দ্রুত সেগুলো তুলে নিলেন। কাউন্টার থেকে একটা পার্স নিলেন। টাকাটা ওই পার্সের মধ্যে পুরে দিলেন। দেখা গেল, এই কাজটা থেরেসা মানতে পারছেন না। তাঁর মুখ রাগে থমথম করছে।

লুসিয়া বললেন- ব্যাপারটা এইভাবে ভাবুন সিস্টার, ভগবান আমাদের হাতে টাকা তুলে দিয়েছেন। যদি তিনি সাহায্য না করতেন, তাহলে আমরা এই পেস্টার সন্ধান পেতাম কি?

***

তারা কাফেতে বসে আছেন। সংক্ষেপে আলোচনা করছেন।

সিস্টার থেরেসা বলছেনপ্রথমে এই পার্সটা মেনডাভিয়া কনভেন্টে দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সেখানে গেলে আমরা সবাই আবার নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারব।

লুসিয়া ভাবছেন, না, আমি কখনওই কোনো কনভেন্টে যাব না। আমার নিরাপত্তা লুকিয়ে আছে সুইস ব্যাঙ্কের মধ্যে। আগের কাজ আগে করতে হবে। দেখা যাক কীভাবে এই পার্সটা হাতাতে পারি।

–এখান থেকে কোন দিকে গেলে মেনডাভিয়াতে পৌঁছোব? উত্তর দিকে তো?

–হ্যাঁ।

–ওই শয়তানগুলো সর্বত্র আমাদের অনুসন্ধান করছে। আজ রাতে পাহাড়ের ওপর থাকাটাই ভালো।

মনে হচ্ছে, কেউ বোধহয় লুসিয়ার কথা শুনছেন না।

একজন ওয়েট্রেস এল, টেবিলের ওপর মেনুকার্ড রাখল।

সিস্টাররা মেনুকার্ড ভালোভাবে দেখলেন। তাদের আচরণের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব জেগেছে। লুসিয়া বুঝতে পারলেন, কী খাওয়া যেতে পারে? অনেক দিন বাদে তারা মেনুকার্ড দেখছেন। কনভেন্টে তাদের সাধারণ খাবার দেওয়া হত। সেখানে বাছ বিচারের

কোনো ব্যাপার ছিল না। এখন তারা অচেনা অপরিচিত খাদ্য তালিকা দেখে অবাক হয়েছেন।

সিস্টার থেরেসা বললেন আমি কফি খাব, দু-তিন টুকরো পাউরুটি তাতেই হবে। সিস্টার গ্রাসিলা বললেন আমিও তাই নেবো।

মেগান বললেন–অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। আরও বেশি কিছু খেলে ভাল হয়, ডিম খাওয়াটাই ভাল।

লুসিয়া নতুন চোখে তাকালেন, আহা, লুসিয়া ভাবলেন, সিস্টার মেগান ঠিকই বলেছেন, আপনারাও তাই খান। সত্যি, আবার কখন খাওয়া জুটবে কে জানে।

তিনি কমলালেবুর টুকরো অর্ডার দিলেন। দিলেন শুয়োরের মাংস, হট রোল, জ্যাম এবং কফি।

তিনি বললেন ওয়েট্রেসকে আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।

বিকেল চারটে ত্রিশ। সিয়েস্টা শেষ হয়ে গেছে। ঘুমন্ত শহরের ঘুম ভাঙছে। তিনি চাইলেন, এখান থেকে দ্রুত চলে যেতে।

কারিলোর অর্ধনগ্ন অচেতন শরীর আবিষ্কৃত হবার আগে।

খাবার এসে গেছে। সিস্টাররা তাকিয়ে আছেন।

লুসিয়া বলতে থাকেন- তাড়াতাড়ি শুরু করুন।

খাওয়া শুরু হয়ে যায়, প্রথমে ইতস্ততভাবে, তারপর অত্যন্ত দ্রুত। বোঝা গেল, তাঁরা ক্ষুধার্ত। মনের ভেতর অপরাধ প্রবণতা। সেটাকে জয় করতে হবে।

সিস্টার থেরেসার একটা সমস্যা আছে। তিনি এক টুকরো খাবার মুখে দিলেন। তারপর বললেন, না না, এভাবে বসে আমি খেতে পারব না। সবাই ড্যাবড্যাব করে দেখছে।

মেগান বোঝাবার চেষ্টা করলেন–সিস্টার, আপনি কি কনভেন্টে ফেরত যাবেন, তা হলে? হারানো শক্তি সঞ্চয় করুন। তা হলে এতটা পথ হাঁটবেন কী করে।

সিস্টার থেরেসা শান্তভাবে বললেন, ঠিক আছে, আমি খাচ্ছি, কিন্তু এই খাবার খেতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

লুসিয়ার মুখের ভেতর একটা অদ্ভুত অনুভূতি। লুসিয়া বললেন সিস্টার, খাবারগুলো কিন্তু সত্যিই সুস্বাদু।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। লুসিয়া বিল দিলেন। দ্য হিলস্টার থেকে যে টাকা পাওয়া গেছে, তার কিছুটা খরচ হল। তারা এখন উত্তপ্ত সূর্যালোকের মধ্যে হেঁটে চলেছেন। রাস্তাগুলোতে প্রাণস্পন্দন ফিরে এসেছে। দোকানগুলো খুলে গেছে। এখন বোধহয় মিগুয়েল কারিলোর দেহটা আবিষ্কৃত হয়েছে। লুসিয়া ভাবলেন।

লুসিয়া এবং থেরেসা শহর থেকে বাইরে যাবার জন্য উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। গ্রাসিলা এবং মেগান শান্তভাবে হাঁটছেন। তারা চারপাশের দৃশ্য দেখছেন। শহরের নানা গন্ধ নাকে ঢুকছে।

শেষ পর্যন্ত তারা শহরের বাইরে পৌঁছে গেলেন। এবার পাহাড়ের দিকে পথ এগিয়ে গেছে। সেখানে পৌঁছে লুসিয়া একটু নিরাপদ বোধ করলেন। তারা উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছেন। পথ ক্রমশ খাড়াই হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, উচ্চতা খুব একটা কম নয়। লসিয়া সিস্টার থেরেসাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কি ওই প্যাকেটটা বইবেন? নাকি তার হাতে প্যাকেটটা দেওয়া হবে। আহা আপনার বয়েস হয়েছে, এতটা পথ আপনি প্যাকেটটা বইছেন। কষ্ট হচ্ছে না তো?

শেষ পর্যন্ত হাইল্যান্ড চোখে পড়ল। চারপাশে গাছের সমারোহ। লুসিয়া বললেন, আজ রাতে এখানে থাকতে হবে। সকালবেলা আমরা মেনডাভিয়া কনভেন্টের দিকে এগিয়ে যাব।

লুসিয়ার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বাকি তিনজন সায় দিলেন।

.

নীল আকাশে সূর্য, ধীরে ধীরে চারপাশ শান্ত হয়ে আসছে, গরমকাল, একটা অদ্ভুত শব্দ তারপর? রাত্রি এসে গেল।

সবুজ ঘাসের ওপর মেয়েরা শুয়ে পড়েছেন।

লুসিয়া শুয়েছেন, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। আরও–আরও ঘন নিরাপত্তা চাই। নীরবতা এবং নৈঃশব্দ্য। যখন তিনজন সিস্টারের চোখের তারায় ঘুম নামবে, তখন লুসিয়াকে কাজ করতে হবে।

সিস্টার থেরেসা কিন্তু ঘুমোতে পারছেন না। যখনই ঘুমোতে যাচ্ছেন, অনেকের কথা মনে পড়ছে। আকাশের তারা গুনছেন। পাশে আরও সিস্টাররা শুয়ে আছেন, এতদিন কেউ কাউকে চিনতেন না। আজ সকলের নাম জেনেছেন, সকলের মুখ চোখে পড়ছে। তিনি ভাবছেন, ভগবান তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন, তিনি কনভেন্টের নিয়মনীতি ভেঙেছেন। নিজেকে হারিয়ে ফেললেন তিনি।

সিস্টার মেগান, তার চোখেও ঘুম আসছে না। সারাদিন যে ঘটনা ঘটে গেছে, সেই ঘটনাগুলো তাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। আমি কী করে জানব, পাদ্রী বেশে আসা ওই লোকটা একটা শয়তান। তিনি ভাবলেন। আবার ভাবলেন, সিস্টার গ্রাসিলাকে রক্ষা করার মতো সাহস আমি কোথায় পেলাম। ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি। তিনি জানেন না, কতখানি খুশি হয়েছেন, আহা, এটা একটা পাপ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন সিস্টারের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রাসিলা ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারা দিনের ঘটনা তাকে ক্লান্ত করেছে। তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছেন। এমন স্বপ্ন যার কোনো আদি নেই অন্ত নেই, যে স্বপ্নটা অন্ধকার লম্বা শেষহীন করিডর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

লুসিয়া কারমাইন তখনও ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন শিকারী বিড়ালীর মতো। দুঘণ্টা কেটে গেল, তারপর? তিনি অন্ধকারের দিকে তাকালেন। সিস্টার থেরেসার দিকে তাকালেন। এবার ওই প্যাকেটটা নিতে হবে। এখান থেকে অদৃশ্য হতে হবে।

ধীরে ধীরে তিনি সিস্টার থেরেসার কাছে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, ওই মহিলা এখনও জেগে আছেন। হায় ভাগ্য, লুসিয়া তাড়াতাড়ি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

লুসিয়া শুয়ে পড়লেন। ঘুমোবার ভান করলেন। আহা, থাকার চেষ্টা করলেন। সিস্টার থেরেসা সমস্ত রাত ধরে কী প্রার্থনা করতে পারবেন, একসময় তার চোখের তারায় ঘুম আসবে। তখনই সুবর্ণ সুযোগ।

লুসিয়া ভাবলেন– ক্যাশ ফ্রিজটা থেকে যে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন, সেটা দিয়ে তিনি টিকিট কাটবেন, ট্রেন অথবা বাসে করে মাদ্রিদ শহরে পৌঁছোবেন। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আহা, হাতে ওই সোনার ক্রশটা থাকলে আমাকে আর পায় কে? কোথায় এটা বিক্রি করা যেতে পারে? এমন কোনো দোকান আছে কি? হয়তো কেউ ভাববে এটা চুরি করে আনা হয়েছে? আরে তাতে আমার কী যায় আসে। অনেককেই পাওয়া যাবে, যারা এটি কিনতে আগ্রহী। কার সঙ্গে দেখা করব? পরিচিত কোনো দালাল তো নেই!

এটার জন্য আমি তোমাকে এক হাজার পেস্তা দেব।

–আহা, এক হাজার, কাউন্টার থেকে আপনি এটা নিয়ে নেবেন। তারপর? নিজেকে বিক্রি করবেন।

কত পাওয়া যাবে? মাত্র পঞ্চাশ হাজার পেস্তা।

–আমি এটাকে গলাবার চেষ্টা করব, তারপর? আর কী?

দু লক্ষ পেস্তা? এই আমার শেষ আদেশ।

আপনি কি আমাকে চোর ভেবেছেন? ঠিক আছে আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি।

দালাল বলবে।

না, একটা শর্ত আছে।

কী? আমার পাসপোর্ট তৈরি করতে হবে। আপনি কি জানেন যে আমাকে একটা নকল পাশপোর্ট বানিয়ে দেবে?

আহা, তখনও আমি হাত দিয়ে আগলে রাখব ওই সোনার ক্রুশটিকে।

দালাল ইতস্তত করবে। তারপর বলবে– হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু আছে যে এই কাজে পারদর্শী।

ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। এবার আমি এগিয়ে চলেছি সুইজারল্যান্ডের দিকে, ওখানে গেলেই স্বাধীনতা আমার মুঠোবন্দী হবে। পিতার কথা মনে পড়ল– মাঝে মধ্যে টাকা তোমার জীবনসীমা দশগুণ বাড়িয়ে দেবে।

চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আহা, অর্ধ অচেতন অবস্থা। মনে হয়, কোথায় যেন চার্চে ঘন্টা ধ্বনি বেজে উঠেছে। দূরবর্তী কোনো একটি গ্রামের মধ্যে। স্মৃতি, স্মৃতির সমুদ্রে তোলপাড়, অন্য কোনো একটা জায়গা, অন্য একটা সময়...

.

০৮.

টারমিনা, সিসিলি ১৯৬৮

রোজ সকালে চার্চ অফ সান ডেমিংগোর শব্দে তার ঘুম ভাঙত। ঘণ্টা বেজে উঠেছে। এই চার্চের অবস্থান পেলোভিটানির মাথার ওপর। আহা, তিনি একটা বিড়ালিনীর মতো হেঁটে যেতেন, ধীরে ধীরে। তিনি চোখ বন্ধ করতেন, তিনি জানতেন, ভালো কিছু দেখতে হবে চোখের সামনে। এখন কী? এই প্রশ্নটা সব সময় তার মনকে উদ্বিগ্ন করে রাখত। তিনি এদিক ওদিক তাকাতেন। কোন্ দিকে যাবেন বুঝতে পারতেন না। হঠাৎ তার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। তিনি লুসিয়া মারিয়া কারমাইন, অ্যানজেলো কারমাইনের কন্যা। পৃথিবীতে সমস্ত লোককে সুখী করাই অ্যানজোলার জীবনের একমাত্র কাজ।

তারা একটা মস্তবড় ভিলায় বাস করতেন। এতজন চাকর বাকর, পঞ্চদশী লুসিয়া গুনে শেষ করতে পারতেন না। একজন বডিগার্ড তাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন। রোজ সকালবেলা। একটা সুন্দর লিমুজিনে করে। তিনি সবথেকে সুন্দর পোশাক পরতে ভালোবাসতেন। সিসিলির সবথেকে দামী খেলনা নিয়ে অবহেলায় খেলতেন। স্কুলের সহেলীরা তার দিকে ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন।

কিন্তু? বাবাকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা আবর্তিত। তার চোখে বাবা ছিলেন পৃথিবীর সবথেকে সুপুরুষ, তাঁর মতো ধনী এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মানুষ আর কেউ ছিলেন না। তিনি খর্বাকৃতি, সুন্দর চেহারা, শক্তিশালী, চোখ দুটি বাদামী, সবসময় শরীর থেকে একটা অদ্ভুত শক্তি বিকিরিত হচ্ছে। লুসিয়া ছাড়াও দুজন পুত্র সন্তান ছিল তার আরমালডো এবং ভিক্টর। কিন্তু কন্যাকেই বেশি ভালোবাসতেন অ্যানজেলো কারমাইন। লুসিয়া পিতাকে ঈশ্বরের মতো সেবা করতেন, চার্চে পাদরি সাহেব মাঝে মধ্যে ভগবানের কথা বলতেন। তখন লুসিয়ার মনে পড়ত বাবার পরিচ্ছন্ন মুখখানি।

সকালবেলা বাবা বিছানার পাশে আসতেন। বলতেন, ওঠো, ওঠো আমার ছোট্ট পরী, স্কুলে যাবার সময় হয়েছে।

সবসময় অবশ্য লুসিয়া স্কুলে যেতেন না। আর লুসিয়াকে দেখতে কেমন ছিল? না, খুব একটা সুন্দরী তিনি ছিলেন না। অবশ্য তার মধ্যে একটা আলগা চটক ছিল। মাঝেমধ্যে আয়নার সামনে দাঁড়াতেন। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। হ্যাঁ, তাকে রূপসী বলা যেতে পারে। একটি কিশোরী কন্যা ধীরে ধীরে যুবতী হয়ে উঠেছে। ডিমের মতো মুখ,

উজ্জ্বল চকচকে ত্বক, আর সাদা দাঁত, সুন্দর সাজানো চিবুক। দেখলে মনে হয়, যৌন আবেদনময়ী, ঠোঁট দুটিতে অনেক লাস্য। কালো চোখের তারা। মনে হয়, তার মুখখানি শুধু সুন্দর নয়, তার শরীরটা যথেষ্ট সুন্দর। পনেরো বছর, লুসিয়া ইতিমধ্যেই এক যুবতী হয়ে উঠেছেন। স্তন দুটি তার সুগঠিত আকার ধারণ করেছে, কোমর ক্রমশ সরু হচ্ছে। পশ্চাৎদেশে মাংস জমেছে। প্রতিটি পদক্ষেপে তরঙ্গের হিল্লোল।

–আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার বিয়ে দেব, বাবা পেছনে লেগেছেন– তুমি তোমার মনের মতন মানুষকে নিয়ে যাবে এগিয়ে জীবন পথে।

-বাবা, আমি তোমার মতো কাউকে বিয়ে করব। কিন্তু আমার দুভার্গ্য, এই পৃথিবীতে তোমার মতো পুরুষ একটিও নেই।

বাবা হাসছেন- ঠিক আছে, তোমার জন্য এক রাজকুমার খুঁজে আনব। তুমি যখন জন্মেছিলে, আকাশে শুভ নক্ষত্র দেখা গিয়েছিল। তুমি একদিন জানতে পারবে, কীভাবে এক পুরুষকে আলিঙ্গন করতে হয়। কীভাবে তাকে জীবনের সব ভালোবাসা উজাড় করতে হয়।

লুসিয়ার গালে রক্তিম আভা- হ্যাঁ বাবা আমি তা জানব।

তখনও পর্যন্ত লুসিয়া ভালোবাসা সম্পর্কে কোনো অনুভূতি জাগাতে পারেন নি। গত বারো ঘণ্টা কেটে গেছে, বেনিটো পাটাস, তার একজন বডিগার্ড, সবসময় তার কাছে চলে আসে, যখন বাবা বাড়িতে থাকেন না। বেনিটোকে ভালোবাসলে কেমন হয়?

অসাধারণ উন্মাদনা, লুসিয়া জানতেন, বাবার কানে এখবর পৌঁছোল বাবা দুজনকেই হত্যা করবেন। বাবা ভীষণ একরোখা স্বভাবের মানুষ।

***

বেনিটোর বয়স কত? সবে মাত্র ত্রিশে পা দিয়েছে। তার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অ্যানজেলো কারমাইনের এই অসামান্য কিশোরী কন্যাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

-তুমি কি এটা ভেবেছিলে? প্রথমবার শয্যাতে শুয়ে বেনিটো জানতে চেয়েছিল।

–আঃ ভালো লাগছে, লুসিয়া জবাব দিয়েছিলেন।

লুসিয়া ভেবেছিলেন–মারিওর মতো সে হয়তো এত সুন্দর নয়, টনি কিংবা এনরিকোর মতো। তবে রবারটো কিংবা লিওর থেকে সে অনেক শক্তিশালী তা আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি। বাকি নামগুলো তিনি আর মনে রাখতে পারেননি।

তেরো বছর বয়েস, লুসিয়ার মনে হল, এখনও পর্যন্ত তিনি কুমারী রয়ে গেছেন। চারপাশে তিনি তাকালেন, দেখলেন, অনেক ভালো ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমেই পাওলো কসটেলো, অ্যানজেলো কারমাইনের ডাক্তারের ছেলে, সতেরো বছর বয়েস, লম্বা এবং সুপুরুষ, স্কুলের এক বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। লুসিয়া তাকেই ভালোবাসলেন। পাওলোর সাথে প্রথম দর্শনেই প্রেম। মাঝেমধ্যে তার সাথে বেড়াতে বেরোতেন। পাওলো ব্যাপারটাকে ভালোভাবে নিয়েছিলেন। তিনি অ্যানজেলো কারমাইনের এই সুন্দরী কিশোরী কন্যাকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। আগস্টের একটি

নিদাঘতপ্ত দিন, লুসিয়া ঠিক করলেন, তিনি আর অপেক্ষা করবেন না। তিনি পাওলোকে ফোন করলেন।

-পাওলো, আমি লুসিয়া কারমাইন বলছি। আমার বাবা তোমার সঙ্গে কোনো একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চান। তুমি কি তার সাথে আমাদের পুড হাউসের পেছনে দেখা করবে?

এই কথা শুনে পাওলল অবাক হয়েছিলেন। অহংকারীও হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জানতেন, অ্যানজেলে কারমাইনের মেজাজ কেমন। তিনি জানতেন না, মা ফিওসের মতো একজনও এই ব্যাপারটা জানতেন। পাওলো বলেছিলেন– আমি খুশি হলাম, কখন যাব বলো?

–বিকেল তিনটে।

সিয়েস্টার সময়, সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। পুড হাউসের অবস্থান একেবারে বাইরে। বিশাল সম্পত্তির এক কোণে। বাবা সেখানে ছিলেন না। ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল না।

পাওলো এসেছিলেন ঠিক সময়। দরজাটা খোলাই ছিল, পাওলো ধীরে ধীরে হেঁটে গেলেন, পুড হাউসে পৌঁছে গেলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল, তিনি শব্দ করলেন- সিনেট্রা কারমাইন? আমি কী ভেতরে ঢুকব?

–কোনো শব্দ নেই। পাওলো ঘড়ি দেখলেন। সাবধানে দরজা খুললেন। ভেতরে ঢুকলেন। ঘরটা অন্ধকার।

–সিনেট্রা কারমাইন?

একটা আবছা ছায়া শরীর সরে গেল। পাওলো?

তিনি লুসিয়াকে চিনতে পারলেন। লুসিয়ার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারলেন।

–লুসিয়া, তোমার বাবা কোথায়? উনি কি এখানে আছেন?

লুসিয়া আরও কাছে চলে এসেছেন। পাওলো অবাক হয়ে দেখলেন, লুসিয়া সম্পূর্ণ নগ্ন।

–হ্যায় ঈশ্বর, পাওলো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কী করছ তুমি?

আমি তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসব। তুমি কি আমাকে সেই সুযোগ দেবে না পাওলো?

–এমন ছেলেমানুষী করো না, তুমি একটা ছোট্ট বালিকা। আর আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

পাওলো বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন।

–তুমি যাও, আমি আমার বাবাকে বলব তুমি আমাকে ধর্ষণ করেছ।

না, তা তুমি কোরো না।

না, তুমি যেও না। পাওলো থমকে থেমে গেলেন। লুসিয়া যদি সত্যি সত্যি এই কথাটা বলে দেয় তাহলে কী হবে? পাওলো জানেন তাহলে তার ভাগ্য কেমন হবে।

তিনি ভেতরে এলেন, লুসিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। লুসিয়া প্রিয়তমা আমার, শোনো এভাবে অবুঝের মতো কাজ করো না।

–তুমি কখন আমাকে আদর দেবে?

না লুসিয়া, ব্যাপারটা ভয়ংকর। যদি বাবাকে একথা বলো তাহলে তিনি আমাকে মেরে ফেলবেন।

আমি জানি।

পাওলো আমতা আমতা করতে থাকেন আমার বাবাও অখুশি হবেন। আমার সমস্ত পরিবারের কী অবস্থা হবে বলো তো?

–আমি জানি।

আশা শেষ হয়ে গেছে।

তুমি কী চাইছ?

–তুমি আমার সাথে সঙ্গমের খেলা খেল।

না, এটা অসম্ভব। তোমার বাবা জানতে পারলে আমাকে মেরে ফেলবেন।

আর যদি তুমি এখান থেকে চলে যাও, তাহলেও তোমাকে মরতে হবে। তোমার কাছে এখন আর কোনো সুযোগে নেই পাওলো। তুমি আমার ফাঁদে পা দিয়েছ।

পাওলো তাকালেন, আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর আমাকে তুমি কেন এভাবে ফাসালে লুসিয়া?

–আমি তোমাকে ভালোবাসি পাওলো।

লুসিয়া পাওলোর হাতে হাত রাখলেন। তার পায়ের ওপর সেই হাত বোলাতে লাগলেন। দেখো, দেখো, আমি একটা পরিপূর্ণ যুবতী হয়ে উঠেছি। তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

আবছা আলোয় পাওলো দেখতে পেলেন, দুটি স্তনবৃন্ত, বাদামী বৃন্ত দুটি শক্ত হয়ে উঠেছে। তারপর? দুটি পায়ের ফাঁকে ঘন চুলের আবরণ।

–হ্যায় যিশু, পাওলো ভাবলেন, এখন আমি কি করব?

মেয়েটি কৌচে শুয়ে পড়েছেন, ধীরে ধীরে ছেলেটিকে উন্মুক্ত করে দিলেন। ট্রাউজারস– এবং শার্ট খুলে দিলেন। তারপর? তিনি হাঁটু মুড়ে বসলেন। পুংদণ্ডটি মুখের ভেতর নিলেন। ধীরে ধীরে চুষতে থাকলেন। পাওলো ভাবলেন- মেয়েটি অভীজ্ঞা, ব্যাপারটা এত সুন্দর করছে। তারপর? মেয়েটির অবস্থান নীচে, ছেলেটি ওপরে, ইতিমধ্যে পুংদণ্ড ঢুকে গেছে, যোনির অভ্যন্তরে। হাত দুটো নিতম্বদেশে খিমচি কাটছে। নিতম্বদেশ এত

লোভনীয় হয়ে উঠেছে। শুরু হয়ে গেছে সেই খেলা। পাওলো মনে মনে ভাবলেন- হায় ঈশ্বর, মেয়েটি এত যৌনবতী?

লুসিয়া তখন স্বর্গে পৌঁছে গেছেন। তিনি ভাবছেন– এই ঘটনা কেন বার বার ঘটে না। তিনি জানেন কীভাবে একজন পুরুষকে খুশি করতে হয়। তার সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলছে। মনে হচ্ছে, তিনি যেন ধীরে ধীরে সেই সর্বোচ্চ অবস্থানের দিকে চলে যাচ্ছেন। আঃ, আরও উঁচুতে, আরও উঁচুতে। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটে গেল। তিনি শিকার করলেন। সেই শিৎকারের মধ্যে আনন্দ আর স্বৈরিনীর অনুভূতি। তারপর? তারা দুজন নগ্ন হয়ে পাশাপাশি শুয়ে রইলেন।

লুসিয়া শেষ পর্যন্ত কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন– পাওলো, আবার এসো, এইখানে ঠিক এইসময়ে কেমন!

লুসিয়া তখন ষোড়শী। অ্যানজেলো কারমাইন ঠিক করলেন, মেয়েকে নিয়ে পৃথিবী দর্শনে বেরোবেন। কোথায় যাওয়া যেতে পারে? বৃদ্ধা আন্ট রোজার কাছে? লুসিয়া ক্যাপরি আর ইসচিয়াতে তার স্কুল জীবনের ছুটির প্রহরগুলি কাটিয়েছিলেন। কখনও ভেনিস কখনও রোম। আরও অনেক ভালো ভালো জায়গায়।

–তোমাকে আরও সহবত শিখতে হবে। গেঁয়ো মেয়ে হয়ে থাকলে চলবে না। তোমার বাবার মতো। পৃথিবীর নানা জায়গায় যেতে হবে। ক্যাপরিতে যাও, আন্ট রোজা সেখানে থাকে। তার সাথে কারথুসিয়ান মনাস্ট্রিরিতে যাবে। সেন্ট জেমসে। চ্যাপেল অফ সান মাইকেলে যেও। প্যালজা এ মেয়ারে।

–হ্যাঁ বাবা।

–ভেনিসে গেলে সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকা যাবে ডাগস প্যালেস। চার্চ অফ সান জরজিও, অ্যাকাভেমিয়া মিউজিয়াম।

–হ্যাঁ বাবা, যাব।

রোমকে আমরা পৃথিবীর অসাধারণ শহর বলতে পারি। রোমে গিয়ে তুমি সিটা ভ্যাটিক্যানোতে যেও, ব্যাসিলিক অফ সামটা ম্যারিয়া ম্যাগোরি, গ্যালেরিয়া বরগিজ অবশ্যই যাবে।

নিশ্চয়ই যাব।

–মিলানো, সেখানে গিয়ে কনজারভাটোরিওতে যেও। আমি লা স্কালার টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখছি। তুমি এবং তোমার আন্ট রোজা, তোমরা মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম অফ হাফে যাবে। এই শহরে আরও অনেক চার্চ এবং মিউজিয়াম আছে।

বাবা, নিশ্চয়ই যাব। এইভাবে সুন্দর একটা পরিকল্পনা করা হল। লুসিয়া এইসব জায়গাতে যায়নি, কাকি রোজা সিয়েস্টারে যেতেন। প্রত্যেকদিন বিকেলে। তার ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত।

–তুমি বিশ্রাম করো।

হা, কাকি রোজা।

রোজা ঘুমিয়ে পড়তেন, লুসিয়া কুইমিনাইন ক্যাপরিতে নাচের আসরে যোগ দিতেন। একা একা কোথায় চলে যেতেন। একদল কলেজ ছাত্রের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল, মারিনা পিনাকোলোতে, বাগমিতে পিকনিক করতে গেলেন। অ্যানাপাপরি থেকে ঘুরে এলেন। সেখানে ফরাসী যুবকদের সাথে, ভাব জমালেন। পিয়াজা উমারটলে গিয়ে মদ খেলেন।

ভেনিসে দেখা হয়েছিল এক ছেলের সঙ্গে, ডিসকোতে, জনৈক ছেলের হাত ধরে চলে গেলেন চিগোগিয়াতে। তখনও আন্ট রোজা ঘুমিয়ে আছেন।

রোমে গিয়ে অন্য অভিজ্ঞতা। অ্যাপুলাতে মদ্য পান, আহা, ম্যারটে এবং র‍্যানিডারির মতো রেস্টুরেন্ট বসে খাওয়া।

যেখানে তিনি যেতেন, লুসিয়া নতুন আনন্দ খুঁজে পেতেন। ছোটো ছোটো বার এবং নাইটক্লাবে দেখা হত রোমান্টিক স্বভাবের পুরুষদের সঙ্গে। তিনি ভাবতেন, বাবা ঠিকই বলেছিলেন, দেশ ভ্রমণ না করলে আমাদের পড়াশোনা শেষ হয় না।

বিছানাতে শুয়ে শুয়ে তিনি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতেন। তিনি ভাবতেন, আহা, এই বয়সে আমি কত অভীজ্ঞা হয়ে উঠেছে।

লুসিয়া আবার টারমিনাতে ফিরে এলেন। প্রিয়তম সহেলীদের বলেছিলেন– আমি নেপলসে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়েছিলাম, আর সালেরমোতে প্রস্তর প্রতিমা হয়ে যাই। ডুরামডসে আমার খিদে পেয়েছিল, লুক্কাতে আমি পিঁপড়ে হয়েছিলাম!

লুসিয়ার বান্ধবীরা জানে, এই মেয়েটির কথা বলার মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই।

সিসিলিকে আমরা এক অসাধারণ জায়গা বলতে পারি। এখানে গ্রেসিয়ান যুগের মন্দির আছে, আছে রোমান বাইজানটাইন অ্যাম্ফি থিয়েটার, চ্যাপেল, আরব দেশের পানাগার এবং সোয়াবিয়ান ক্যাসেল। লুসিয়া কালেরমোকে অত্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় পেয়েছিলেন। কালসাতে ঘুরে বেড়ালেন। পুরোনো আরব কোয়ার্টারে গেলেন। অপেরা ডেই পুপিতে গেলেন। পুতুল নাচের আসর। টারমিনা, যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, তখনও তাকে আকর্ষণ করত। মনে হত, আয়ত্তমিয়োর সমুদ্রের পাশে এ বুঝি এক স্বপ্নের শহর। পর্বত আছে, আছে বিশুদ্ধ বাতাস। এই শহরে এতগুলো ড্রেসের দোকান, গয়নার দোকান, বার এবং ছোটো ছোটো স্কোয়ার। বর্ণ রঙীন হোটেল, এক্সলেয়ার প্যালেস, সান ডোমেনিকো।

নেকোসেকসিকো, ছোটো ছোটো পট, লুসিয়া কারমাইনকে তাঁর পঞ্চদশ জন্মদিনে একটা গাড়ি দেওয়া হল। তিনি ট্রাফিক নিয়ম নীতি মেনে চলছেন। কখনও কোথাও থামছেন, না। শেষ অবধি তিনি অ্যানজেলো কারমাইনের সত্যিকারের সুখী কন্যাতে পরিণত হয়েছিলেন।

এবার আমরা অনুসন্ধান করব, অ্যানজেলো কারমাইনের ব্যবসা, তিনি সম্পত্তিরো নিয়ে ব্যবসা করেন। সত্যি কথা বলতে গেলে, কারমাইনের পরিবার টারমিনাতে একটা বিরাট ভিলা পেয়েছিলেন। লেক কোমোতে ছিল আরেকটি বাড়ি। গেস্টাডে একটি লজ। রোমেতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট। রোমে একটা মস্ত বড়ো ফার্ম ছিল। অ্যানজেলো কারমাইন আরও কয়েকটি অন্য ব্যবসা করেছিলেন। তিনি একডজন ওয়্যার হাউসের মালিক ছিলেন। দুটি জুয়া খেলার ক্যাসিনোতেও ছিল তার মালিকানা। ছটি জাহাজ ছিল।

কলম্বিয়াতে ছিল কোকেন চাষের আসর। আবার ধার দেওয়ার ব্যবসা করতেন। অ্যানজেলো কারমাইনকে আমরা অন্যতম ধনী মানুষ বলতে পারি। তার জীবনটা ছিল উত্তেজনায় ভরা। তিনি বলেছিলেন, একজন গরীব সিসিলিয়ান চাষী কীভাবে জীবনে বাঁচবে। প্রত্যেকটি আশায় দিন চলতে হবে। অর্থ ছাড়া এ জীবনে আর কিছুই থাকে না।

অ্যানজেলো কারমাইন দুষ্টু ছেলে হিসেবে তার জীবন শুরু করেন। বারো বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। পনেরো বছর বয়সের মধ্যে জগতকে দেখে ফেলেন, ষোলো বছর বয়সে প্রথম হত্যাকাণ্ডে হাত পাকান। ধীরে ধীরে আরও সাহসী হয়ে ওঠেন। লুসিয়ার মায়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, অ্যানা, পরবর্তী বছরগুলোতে অ্যানজেলো কারমাইন অতিদ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে গেছেন। বিশ্বাসঘাতক সেজেছেন। একদল মৃত অন্ধ শত্রুর জন্ম দিয়েছেন। বয়েস বেড়েছে। অ্যানা তখনও পর্যন্ত এক সহজ সরল অশিক্ষিতা গ্রাম্য কন্যাই। থেকে গেছেন। তিন তিনবার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু অ্যানজেলোর জীবনে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। তিনি জানতেন, এই পরিবার তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তিনি মারা গেলেন। তার মৃত্যু পরিবেশকে শোকাবহ করতে পারেনি।

আরনালডো এবং ভিক্টর বাবার সাথে ব্যবসায় যোগ দিলেন। তখন লুসিয়ার বয়স খুবই কম। তিনি বাবা এবং ভাইদের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা শুনতেন। কীভাবে তারা শত্রুদের হারিয়ে দিয়েছেন সেই কৃতিত্বের গল্প শুনতেন। বুদ্ধির লড়াইতে জয়, লুসিয়া আনন্দে নেচে উঠতেন। লুসিয়ার কাছে বাবা ছিলেন মধ্যযুগীয় এক নাইট, যার হাতে উজ্জ্বল অস্ত্রের সমাহার। বাবা এবং ভাইদের এই কাজে তিনি খারাপ কিছু দেখতেন না। বরং তারা অনেক মানুষের মুখে অন্নের সংস্থান করছেন, এই ব্যাপারটা লুসিয়াকে খুশি করত।

মানুষ যদি জুয়া খেলার আসরে যোগ দিতে চায়, আমি কেন সেখানে বাধার সৃষ্টি করব। মানুষ যদি টাকা দিয়ে নারী মাংস কিনতে চায়, কেন তাকে সাহায্য করব না। বাবা এবং ভাইয়েরা চড়া সুদে মানুষদের হাতে টাকা তুলে দেন, এটাও তো ভালো কাজ, তা না হলে মানুষ যাবে কোথায়? লুসিয়ার কাছে তার বাবা এবং ভাইয়েরা ছিলেন আদর্শ নাগরিক। বাবার বন্ধুদের সাথেও মাঝে মধ্যে দেখা হত। প্রতি সপ্তাহে অ্যানজেলো কারমাইন বাড়িতে একটা বিশাল ডিনার পার্টির ব্যবস্থা করতেন। কারমাইনের টেবিলে কারা আসতেন? মাঝে মধ্যে শহরের মেয়র আসতেন, কয়েকজন অলডারম্যান ছিল নিয়মিত অতিথি। মাননীয় বিচারপতিরা আসতেন। পাশাপাশি বসে থাকতেন চিত্রাভিনেত্রীরা। অপেরা নায়িকারা দেখা করত, কোনো কোনো সময় পুলিশের প্রধান আসতেন। একবার গভর্ণরও সেখানে এসেছিলেন। একবার না, বেশ কয়েকবার।

এইভাবে লুসিয়া অভিজাত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। জীবনটা পার্টিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দামী দামী জামাকাপড়, হীরে মুক্তোর অলংকার, একটির পর একটি বাড়ি গাড়ি, চারপাশে চাকর ঝিদের ভিড়। শক্তিশালী বন্ধু বান্ধবদের দল। ফেব্রুয়ারী মাস, তেইশ বছরের জন্মদিন, সবকিছু হঠাৎ শেষ হয়ে গেল।

অথচ কোথাও কোনো বিপদ সংকেত ছিল না। দুজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন। জুদাতে, একজন তাদের পুরোনো বন্ধু। পুলিশ প্রধান, অন্যজন তার লেফটেন্যান্ট।

আমাকে ক্ষমা করবেন, পুলিশ প্রধান বলেছিলেন, এটা হল নেহাতই একটা রুটিনের ব্যাপার, কমিশনার আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি কি দয়া করে আমার সঙ্গে যাবেন পুলিশ স্টেশনে? সেখানে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমি দেখব যাতে আপনি যথাসময়ে ফিরে এসে আপনার মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিতে পারেন।

অ্যানজেলো কারমাইন হাসতে হাসতে বলেছিলেন– কোনো সমস্যা নেই, আমি তো বেশ বুঝতে পারছি, আপনারা সরকারের চাকরী করেন। দায়িত্ব পালন তো করতেই হবে। এই নতুন কমিশনারকে বোধহয় প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেছেন তাই না? উনি কাজ দেখাতে চাইছেন তাই তো?

–আমার তাই মনে হচ্ছে, পুলিশ প্রধান দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই, খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে ফিরিয়ে আনব। আমি কথা দিচ্ছি।

অ্যানজেলো কারমাইন আর সেদিন পার্টিতে ফিরে আসতে পারেননি। পরের দিনও নয়। আসলে তিনি আর কখনো তার বাড়িতে ঢুকতে পারেননি। সরকার তার বিরুদ্ধে একশোটা মারাত্মক অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি অনেককে হত্যা করেছেন। ড্রাগের ব্যবসা করেন। বেশ্যাবৃত্তিতে মেয়ে ভাড়া খাটান। খুন জখম রাহাজানি আরও কত অভিযোগ। বেল দেওয়া হল না। কারমাইনের একটা বিরাট সংগঠন আছে, নিষিদ্ধ সংগঠন। তাকে বলা হল, তিনি সিসিলিতে মাফিয়াদের সঙ্গে যুক্ত, নিয়ে যাওয়া হল রোমে, আটকে রাখা হল রেজিনা কোয়ালিতে, প্রিন্স অফ হেডেন নামে একটি বন্দীশালায়। ছোট্ট একটি সেলুলার কক্ষে তার দিন কাটত।

এখানে বন্ধ জানলা আছে, আছে একটা রেডিওটার, ছোট্ট খাট, একটি টয়লেট, জীবন অধৈর্য হয়ে উঠল।

প্রথম দিকে অ্যানজেলো কারমাইন ভাবতেন, তার উকিল টম নাচোস কমটনো তাকে সাহায্য করবেন। আজ অথবা আগামীকাল তিনি এই কারাকক্ষ থেকে মুক্তি পাবেন।

কমটনো তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। গুরুমের অতিথি ঘরে বসে থাকতেন। কারমাইন মাঝেমধ্যে রাগে ফেটে পড়তেন– কী হচ্ছে? আমার সব ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ এত খবর জানল কী করে? কিছু একটা করুন। দেখুন তো, কে এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আছে।

কমটনো বলতেন– আমরা বের করব, আপনার শত্রুকে চিহ্নিত করবো। আপনি এত ভেঙে পড়বেন না।

ধীরে ধীরে আশার আলো নিভে গেল। দেখা গেল, সরকার পক্ষ আরো উঁদে উকিল নিয়োগ করেছে। শুরু হল বিচার। একে একে সাক্ষী এসে দাঁড়াতে লাগল। ভয়ে অ্যানজেলোর মুখ শুকিয়ে গেল।

বিচার শুরু হবার দুদিন আগে অ্যানজেলো কারমাইন এবং মাফিয়া দলের সকলকে অন্য জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে নিরাপত্তার দারুণ বাড়াবাড়ি। রোম শহর থেকে বারো মাইল দূরে। একশো সাতজন মাফিয়া সদস্যকে সেখানে রাখা হয়েছে। তাদের মাটির তলার টানেলে রাখা হয়। হাত এবং পায়ে চেন বাঁধা হত। ছোটো ছোটো খাঁচার

মধ্যে তাদের ঢুকিয়ে রাখা হয়। খাঁচাগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরী। বুলেট নিরোধক গ্লাসের আচ্ছাদন। সশস্ত্র প্রহরী আছে চারপাশে, যাতে কোনো সমস্যা না হয়।

অ্যানজেলো কারমাইনকে কোর্টরুমে নিয়ে আসা হল। তার মন আনন্দে ভরে উঠেছে। আহা, জজের আসনে কে বসেছেন? জিওভানি বাসকেট্রা, গত পনেরো বছর ধরে কারমাইনের সাথে তার সুন্দর সম্পর্ক। কারমাইনের সান্ধ্য আসরে তিনি কতবার যোগ দিয়েছেন। অ্যানজেলো কারমাইন জানেন, শেষ পর্যন্ত তিনি সুবিচার পাবেন।

বিচার শুরু হল। অ্যানাজেলো কারমাইন প্রথমদিকে খুবই আনন্দে ছিলেন। তাকে শপথ নিতে হল। ধীরে ধীরে আনন্দ পালটে গেল। দেখা গেল, সরকার পক্ষে যিনি প্রধান সাক্ষী হিসেবে এসেছেন, তিনি হলেন বেনিটো পাটাস, বডিগার্ড। বেনিটো পাটাসের সাথে কারমাইন পরিবারের অনেক দিন ধরে ওঠাবসা। কারমাইন তাকে খুবই বিশ্বাস করতেন। মাঝেমধ্যে ওই ভদ্রলোক শোবার ঘরে ঢুকে পড়তেন। এখানে ব্যবসার গোপন আলোচনা হত। ব্যবসাটা সম্পূর্ণ অনৈতিক। পুলিশের চোখে, জাতির চোখে। পাটাস একটি একটি করে সব সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। এখন সবকিছু উগরে দিয়েছেন। পুলিশ পাটাসকে নানা প্রশ্ন করেছে। পাটাস বলেছেন, কীভাবে কারমাইন ঠান্ডা মাথায় মানুষকে হত্যা করেছেন। কীভাবে তিনি একটির পর একটি মেয়েকে বেশ্যাতে পরিণত করেছেন। নানারকম ভয় দেখিয়ে, মানুষের মুখ চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। পাটাস আরও অনেক গোপন খবর দিয়েছিলেন। অ্যানজেলো কারমাইনের অবিশ্বাস তখন আকাশ ছুঁয়েছে। নিয়ম মতো তাকে কোর্টরুমে আসতে হচ্ছে। তিনি শুনতে পাচ্ছেন। পাটাস কীভাবে তার দুর্নীতির ছবিগুলো তুলে ধরেছেন।

প্রত্যেক দিন লুসিয়া কোর্টে আসতেন, একজনের সওয়াল জবাব শুনতেন। সেই মানুষটিকে তিনি মোটেই ভালোবাসতেন না। যিনি তাঁর পিতা এবং ভাইদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছেন।

বেনিটো পাটাসের কথাগুলো বন্যার উন্মুক্ত জলতরঙ্গের মতো ভেসে এল। কমিশনারের অনুসন্ধান শুরু হল। আরও অনেক মানুষ এসে দাঁড়ালেন। সকলেই অ্যানজেলো কারমাইনের বিরুদ্ধে বিষ উদগার করছেন। কীভাবে অ্যানজেলোর গুণ্ডারা তাদের জীবন দুর্বিসহ করেছে, সবিস্তারে তা বর্ণনা করছেন। মাফিয়ারা সমাজের ক্ষতচিহ্ন, তারা কালো পথের পথিক, তারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। তারা সাধারণ মেয়েকে পথের বেশ্যা বানায়। প্রিয়তমকে হত্যা করে। মেরে পঙ্গু করে দেয়। শিশুদের ড্রাগ আসক্ত করে তোলে। আতঙ্কের শেষ নেই। অপরাধ মিছিল করে এগিয়ে চলেছে।

শেষ অবধি বোঝা গেল, অ্যানজেলো কারমাইন বোধহয় আর ছাড়া পাবেন না।

লুসিয়া তখন বাবার সঙ্গে দেখা করছেন, কারাকক্ষের অন্ধকারে।

প্রথমদিকে বাবা লুসিয়াকে আনন্দের সঙ্গে আহ্বান জানাতেন- লুসিয়া, ভয় পাস না, বিচারক আমার খুবই পরিচিত। তিনি হলেন আমার তুরুপের তাস। তিনি আইনের মারপ্যাঁচ জানেন। তিনি জানেন, কীভাবে একজন দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হয়। তুই কিছু ভাবিস না, আমরা শীগগিরি ছাড়া পাব।

অ্যানজেলো কারমাইন তখনও জানতেন না, তার ভাগ্যে কী লেখা আছে।

জনমানসে ব্যাপক বীত-রাগের সৃষ্টি হয়েছে। মাফিয়ার অত্যাচারে সকলেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। শেষ পর্যন্ত বিচার শেষ হল। জিওভানি তার রায় দিলেন, তিনি মাফিয়া সদস্যদের দীর্ঘদিন কারাদণ্ড দিলেন। অ্যানজেলো কারমাইন এবং তার দুই সন্তানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। আঠাশ বছর তাদের রুদ্ধকারার অন্তরালে থাকতে হবে।

অ্যানজেলো কারমাইনের কাছে এটা মৃত্যুদণ্ডের সামিল।

ইতালির মানুষজন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সুবিচার কথা বলেছে। লুসিয়ার কাছে এটা একটা দুঃস্বপ্ন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তার ভাগ্যে এই বিপর্যয় ঘটে যাবে। যে তিনজন পুরুষকে তিনি সবথেকে বেশি ভালোবাসতেন, তারা এখন নরকের বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

আরও একবার লুসিয়াকে অনুমতি দেওয়া হল, বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন নির্জন কারাকক্ষে। এক রাতের মধ্যে বাবা একেবারে পাল্টে গেছেন। মাত্র কয়েকটা দিন, বাবার বয়স একলাফে বেড়ে গেছে। তার চেহারা ভেঙে গেছে, আহা, কোথায় হারিয়ে গেছে সেই উজ্জ্বলতা।

–ওরা আমাকে নষ্ট করে ফেলল, আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, উনি গুঙিয়ে উঠলেন- ওরা সকলে, এমন কি স্বয়ং বিচারক পর্যন্ত, লুসিয়া, আমি ভদ্রলোককে কত টাকা দিয়েছি তুই কি জানিস? উনি এইভাবে আমার সাথে প্রতিশোধের খেলা খেললেন?

পাটাস, পাটাস আমার কাছে ছিল নিজের সন্তানের মতো। সারা পৃথিবীর কাছে মুখ দেখাতে পারব না। কী হল আমার বল তো?

লুসিয়া বাবার মুখের দিকে তাকালেন। নীচু কণ্ঠস্বরে বললেন- বাবা, প্রতিশোধ নিতেই হবে, আমি শপথ নিচ্ছি, আমি এর প্রতিশোধ নেবই।

–আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। বাবা বললেন, কিন্তু তোর সামনে বিশাল জীবন পড়ে আছে। আমার জুরিখে ব্যাংক অ্যাকউন্ট আছে, ব্যাংক লিউতে। এই টাকাটা পেলে তুই দশটা জীবন পায়ের ওপর পা রেখে কাটাতে পারবি।

তিনি কানে কানে গোপন সংখ্যাটা বলে দিয়েছিলেন–ইতালি ছেড়ে চলে যা। টাকাটা তুলে নে। জীবনের দিনগুলো আনন্দে থাকিস।

লুসিয়া বলেছিলেন- বাবা।

আর কিছু তিনি বলতে পারেননি। আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

যদি কোনো বন্ধুর দরকার হয়, ডোমিনিক ডায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করিস। আমরা দুই ভাইয়ের মতো ছিলাম। ডোমিনিক ফরাসী দেশের বেরিকে একটা বাড়ি করেছে। স্প্যানিশ সীমান্তের কাছে।

-মনে রাখব।

–ইতালি ছেড়ে চলে যাস মা, কেমন?

–হ্যাঁ বাবা, যাব। যাবার আগে কিছু একটা করবো।

এইভাবে আগুন জ্বলে উঠল, প্রতিশোধের আগুন। কী করে এই কাজে সফল হবেন তিনি? লুসিয়া তখন একা, কাজটা করা খুব একটা সহজ না। একটা ইতালীয় প্রবাদ তাঁর। মনে পড়ে গেল- আস্তে আস্তে এগোতে হবে। তবেই আমরা পথের শেষপ্রান্তে পৌঁছোতে পারবো।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, বাবা এবং ভাইদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য। লুসিয়া কারমাইন জজসাহেবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। জজসাহেব নিজেই দরজা খুলে দিলেন।

তিনি অবাক চোখে লুসিয়ার দিকে তাকালেন। কারমাইনের বাড়িতে যখন তিনি আসতেন, শনিবারের সান্ধ্য আসরে, তখন এই মেয়েটি কত সময় সামনে আসত। কিন্তু এই মেয়েটির সাথে খুব একটা বেশি পরিচিত হননি তিনি।

লুসিয়া কারমাইন? তুমি এখানে কী করছ? তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।

–আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।

জজসাহেব সন্দিহান চোখে তাকালেন কীজন্য ধন্যবাদ?

লুসিয়া তার চোখের তারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন আমার বাবা এবং ভাইদের আসল চেহারাটা আপনি জগৎবাসীর সামনে খুলে ধরেছেন। আমি সরল জীবন কাটিয়েছি। এই

বাড়িতে আতঙ্কঘন পরিবেশের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছি। আমি জানতাম না জীবন্ত দৈত্য কেমন হয়।

লুসিয়া ভেঙে পড়লেন, কান্নাতে তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বিচারক ভদ্রলোক ভেবে পাচ্ছেন না এখন কী করবেন। তিনি লুসিয়ার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন–এসো এসো, চা খাবে কি?

-না না, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারা ভেতরে ঢুকলেন, লিভিংরুমে বসলেন। জজসাহেব বললেন– আমি জানি না বাবা সম্পর্কে তোমার কী মনোভাব। কিন্তু তোমার চোখ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি বাবাকে খুবই ভালোবাসতে তাই তো?

–হ, আমি তো জানতাম না বাবা এবং ভাইয়েরা কোন অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। যখন আসল সত্যাটা আমি জানতে পারলাম- লুসিয়া কথা শেষ করতে পারলেন না।

–এখন বাবাকে আমি ঘেন্না করি। লুসিয়া বললেন, আমি এখান থেকে চলে যাব, কিন্তু কীভাবে যাব?

ভদ্রলোক বললেন- আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি তোমাকে ভুল বুঝেছি?

–আমি বাবাকে ভয় পাই,

লুসিয়ার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এসেছে।

জজসাহেব বুঝতে পারলেন, আহা, কী সুন্দরী এই কন্যাটি। কালো পোশাক পরেছে, তার কামনাময়ী শরীরের অনেকখানি প্রকাশিত হয়েছে, ভদ্রলোক অবাক চোখে লুসিয়ার প্রস্ফুটিত দুটি উন্নত স্তনের দিকে তাকালেন, আরেকটু বড়ো হলে মেয়েটি আরও যৌনবতী হয়ে উঠবে, বিচারক সাহেব ভাবলেন।

ভারী ভালো লাগল, বিচারক সাহেব ভাবছেন, অ্যানজেলল কারমাইনের কন্যার সাথে। শুলে কেমন হয়? এখন অ্যানজেলো কিছুই করতে পারবে না, সে তো জেলের অন্ধকারে পচে মরছে। বুড়ো বেজন্মার এমনই হয়েছে। আমি এখন কী করব? মনে হচ্ছে লুসিয়া এখনও কুমারী, অস্পর্শিতা, আমি ইচ্ছে করলে এখনই তাকে বিছানাতে নিয়ে যাব। এমন শিক্ষা দেব, যা সে কখনও ভুলতে পারবে না।

এক বৃদ্ধ পরিচারক এসে দাঁড়াল, ট্রেতে চায়ের কাপ এবং বিস্কুট। সে টেবিলের ওপর ট্রেটা রাখলল। বলল, স্যার, আমি কি ঢেলে দেব?

লুসিয়া বলল- না, আমি ঢেলে দিচ্ছি।

তার কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা ফুটেছে, আর কিছু আনুগত্য।

জজসাহেব লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তুমি পারবে? তাহলে তুমি চলে যাও।

পরিচারিকা চলে গেল।

-হ্যাঁ, আমি পারব স্যার।

লুসিয়া ছোট্ট টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে চা ঢেলে দিলেন। তারপর জজসাহেবের হাতে একটি কাপ তুলে দিলেন। নিজে একটি নিলেন।

–আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি না কি লুসিয়া?

জিওভানি বাসকেট্রা জানতে চেয়েছিলেন।

লুসিয়ার ঠোঁটে আমন্ত্রণী হাসির ইশারা- হ্যাঁ, যদি আপনি অনুমতি করেন।

–বসো।

জিওভানি, লুসিয়া হাতে কাপখানি তুললেন, তারপর? আসুন আমরা ওই শয়তানদের মৃত্যু কামনায় পান করি।

হাসিমুখে বাসট্রো কাপ তুলে নিলেন। আবার উচ্চারণ করলেন– ওই শয়তানদের মৃত্যু।

তিনি ধীরে ধীরে পান করলেন, আঃ, চাটা তেতো লাগছে কেন?

-বড্ড তেতো?

—না না আমার তো ভালো লাগছে।

লুসিয়া আবার কাপ তুললেন আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক।

তিনি আবার চায়ে চুমুক দিলেন।

বিচারক সাহেব খাচ্ছেন।

বাসকেট্রো কিন্তু টোস্টে কামড় শেষ করতে পারেননি। সমস্ত শরীরে একটা উত্তেজনা। মনে হল, কে যেন ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে তার বুকের মধ্যে। তিনি বুকে হাত দিয়ে পড়ে গেলেন। এখুনি ডাক্তারকে ডাকতে হবে।

লুসিয়া সেখানে বসেছিলেন। ধীরে ধীরে চা খেলেন। দেখলেন, কীভাবে জজসাহেবের মৃত্যু হল। একটু বাদে শরীরটা নিস্পন্দ হয়ে গেল।

তারপর? লুসিয়া চোখ বন্ধ করলেন? বললেন–বাবা, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো? আমি কীভাবে আমার প্রথম অভিযানটা শেষ করলাম!

লুসিয়ার ঠোঁটে তখন শয়তানির হাসি খেলা করছিল।

বেনিটো পাটাস, আনন্দে উদ্বেল, জেলার সাহেব বললেন একজন আগন্তুক এসেছেন দেখা করতে।

বেনিটো, তাকে এক ইনফরমার হিসেবে বেশ খাতির করা হচ্ছে। তাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যখন তখন কেউ এসে তার সাথে দেখা করতে পারে। পাটাসের

অন্তত জনা ছয়েক বান্ধবী ছিল। মাঝেমধ্যেই তারা আসে। পাটাস জানেন না, আজ কার পালা।

তিনি আয়নাতে মুখ দেখলেন। মাথায় খানিকটা কমেট মেখে নিলেন। তারপর? প্রহরীকে অনুসরণ করলেন। ছোট্ট করিডর, প্রাইভেট পথ পাশাপাশি।

প্রহরী তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। পাটাস ঘরে গিয়ে বসলেন। মনে প্রশ্ন, কে এসেছে?

লুসিয়া, হায় ঈশ্বর, তুমি এখানে কেন এসেছ? তুমি এলে কী করে?

লুসিয়া হাসতে হাসতে বললেন- বেনিটো, আমি ওদের বলেছি, আমি তোমার বাগদত্তা।

অসাধারণ রূপবতী দেখাচ্ছে লুসিয়াকে। রক্ত লাল সিল্ক ড্রেস তার পরনে। শরীরের খাজগুলো স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

বেনিটো পাটাস বললেন- বেরিয়ে যাও।

যদি আপনি চান, কিন্তু আপনার জন্য কিছু ভালো খবর আছে। যখন আপনাকে আমি স্ট্যান্ডে ডেকেছিলাম, আমার বাবা এবং ভাইদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আপনাকে আমি ঘৃণা করেছিলাম। আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম।

লুসিয়া আরেকটু কাছে এগিয়ে এলেন, বেনিটো পাটাস এবার প্রসাধনের গন্ধ পাচ্ছেন কিন্তু যখন দেখলাম আপনি সাহসের কাজ করেছেন, আপনি সত্যের জয়পতাকা উর্বে

তুলেছেন, আমার বাবা এবং ভাইয়েরা অত্যন্ত খারাপ মানুষ, আপনি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন

–বিশ্বাস করো লুসিয়া, বেনিটো বললেন পুলিশ আমাকে একথা বলতে বাধ্য করেছে।

না না, আপনাকে আর ভালোভাবে বলতে হবে না। লুসিয়া বললেন আমাকে, আমরা ভালোবাসতে পারি না কি? আমার মনে হচ্ছে, আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। ভবিষ্যতে আমি আপনার অনুগত থাকব।

লুসিয়া, আমি তো বুঝতে পারছি না এখন আমার কী করা উচিত।

–যা ঘটে গেছে তা ভুলে যান। এখন আপনি আর আমি বেঁচে আছি। আমাদের সম্পর্ক বেঁচে থাকবে।

লুসিয়া আরেকটু কাছে এলেন। তাঁ, ঘাম মেশানো প্রসাধনের গন্ধ। কেমন একটা ঘোর ঘোর অনুভূতি। বেনিটো অবাক হয়ে গেছেন। তিনি আমতা আমতা করতে থাকেন– তুমি কী বলছ?

আমরা জীবনটা একসঙ্গে কাটাব। আপনি কি জানেন আমি কেন এখানে আজ এসেছি? শুধু একথা বলতে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। এটা কিন্তু কথার কথা নয়।

লুসিয়ার আঙুল খেলা করছে, ধীরে ধীরে তিনি নিজের মনকে প্রস্তুত করলেন। এবার নাটকের চরম দৃশ্যটা অভিনীত হবে। একমুহূর্তের মধ্যে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে গেল।

বেনিটোর অবাক চোখের তারায় তখন লুসিয়ার নগ্ন মূর্তি। স্বপ্ন, না সত্যি? তিনি দেখলেন, সত্যি সত্যি লুসিয়ার পোশাক মাটিতে পড়ে গেছে। লুসিয়া একেবারে নগ্না। লুসিয়া বললেন- আপনি কি এখন আমাকে বিশ্বাস করছেন?

হায় ঈশ্বর, মেয়েটি এত সুন্দরী। হ্যাঁ আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। বেনিটো নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারলেন না।

লুসিয়া অতি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে এসেছেন। দুটি শরীর মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। লুসিয়া ফিসফিসিয়ে বললেন– তাড়াতাড়ি করুন, খুব তাড়াতাড়ি, আপনাকে এখনই উলঙ্গ হতে হবে। হাতে কিন্তু খুব একটা বেশি সময় নেই।

পাটাস পোশাক খুললেন, লুসিয়া সন্তর্পণে তাকিয়ে থাকলেন। পাটাস এখন সম্পূর্ণ নগ্ন। পাটাস লুসিয়ার হাতে হাত রাখলেন। ঘাড়ে একটা ছোট্ট খাঁজ রয়েছে। পাটাসের মন এখন দুঃসাহসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একমুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। লুসিয়া নীচে এবং পাটাস ওপরে। লুসিয়ার পা-দুটোকে জোড় করে ফাঁক করে দিলেন। তারপর, তারপর অহংকারের পুংদণ্ড ঢুকে গেল ধীরে ধীরে। পাটাসের মুখে বন্য হাসির টুকরো।

পাটাস বললেন– মনে হচ্ছে আগের দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে, তাই না লুসিয়া? তুমি কি সেইসব সুখী সম্পৃক্ত মুহূর্তগুলিকে ভুলতে পারছ না?

লুসিয়া কানের কাছে মুখ এনে বললেন- না, আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। আমি কি আপনাকে ভুলতে পারি?

-না, আমাকে সত্যি করে বলো তো?

আমি একজন সিসিলিয়ান, আমার বাবার মতো।

ইতিমধ্যে লুসিয়ার একটি হাত মাথায় পৌঁছে গেছে। তিনি দীর্ঘ তীক্ষ্ণ কাঁটাটা মাথার চুল থেকে বের করেছেন।

বেনি পাটাসের মনে হল, কে যেন বুকের ভেতর কী বিঁধিয়ে দিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা, রক্তের রেখা, তিনি আর্তনাদ করার জন্য মুখ খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। কারণ, কারণ লুসিয়ার আগ্রাসী দুটি ঠোঁট তখন তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে। বেনিটো কথা বলতে পারছেন না। একটু বাদে শরীরটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। তারপর? লুসিয়া ঠিক তখনই চরম রতির প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছেন।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে, লুসিয়া চট করে পোশাক পরে নিলেন। আততায়ী পিনটাকে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হল। বেনিটোর শরীরটা ঢেকে দেওয়া হল কম্বল দিয়ে। বেনিটোর চোখ দুটো বন্ধ। লুসিয়া দরজায় আঘাত করলেন। দরজা খুলে গেল। প্রহরীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন– ও এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রহরী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে এই সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকাল। তার মুখে হাসি। মনে হচ্ছে তুমি ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছ, তাই না সুন্দরী?

লুসিয়া ঘাড় নেড়ে বললেন- হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।

দু-দুখানা দুঃসাহসিক হত্যা, ইতালিতে ঝড় তুলেছে। কারমাইনের সুন্দরী কন্যা এইভাবে পিতা এবং দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন। ইটালির কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষ খুবই খুশি হয়েছে। তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, আততায়ী মেয়েটা যেন নিরাপদে এই দেশ থেকে পালাতে পারে। সঙ্গত কারণে পুলিশ আরও তৎপর হয়ে উঠেছেন। পালিয়ে যাবার সবকটি জায়গাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। লুসিয়া কারমাইন এক মাননীয় বিচারপতিকে হত্যা করেছেন। আর জেলখানায় গিয়ে কারাকক্ষের মধ্যে আরও একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ কর্তারা অবাক হয়ে গেছেন। এমন দু-দুটি দুঃসাহসী, হত্যাকাণ্ড কী করে ঘটল? পুলিশ এবং প্রশাসনকে বোকা বানিয়ে! খবরের কাগজের পাতায় বড়ো বড়ো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

পুলিশ কমিশনার তার ডেপুটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করেছেন মেয়েটাকে যে করেই হোক ধরতে হবে আজকের মধ্যে। আমি কোনো ওজর আপত্তি শুনব না।

শুরু হল অনুসন্ধান। কে কোথায় আছে সব দেখা হল। পুলিশকে আরও তৎপর করা হল। ইতিমধ্যে লুসিয়া পৌঁছে গেছেন বাবার প্রিয় সহকর্মী সালভাডোরের কাছে। এই ভদ্রলোক পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখনও পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বজায় রাখতে পেরেছেন। তাঁর সাহসের প্রশংসা করতেই হবে। প্রথমদিকে লুসিয়া ভেবেছিলেন কী করে ওই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এখন তাঁর মনে অন্য চিন্তা। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এর জন্য ধরা পড়তে হয় তাহলেও পরোয়া নেই। তিনি আত্মবলিদানের জন্য মনকে প্রস্তুত করেছিলেন। তাই নির্ভয়ে নির্ভীক চিত্তে জেলখানায় হেঁটে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এই মুহূর্তে তার মনে অন্যতর চিন্তাধারা, এখন বাঁচতে হবে, হ্যাঁ, পৃথিবীটাকে অন্য চোখে দেখতে হবে। কিন্তু কী করে?

জীবনটা আগের মতো দামী হয়ে উঠেছে। না, আগের থেকে আরও বেশি দামী, আমি কখনই ওদের হাতে ধরা পড়ব না, লুসিয়া নিজেকে নিজেই বোঝাবার চেষ্টা করলেন। না, কখনওই নয়।

সালভাডোর এবং তার স্ত্রী সম্ভব মতো চেষ্টা করলেন, লুসিয়াকে ছদ্মবেশে লুকিয়ে রাখতে। তার চুলের রং পালটে দেওয়া হল। দাঁতের ওপর হালকা কালো ছোপ দেওয়া হল। বাজার থেকে মস্ত বড় চশমা কিনে আনা হল। ছেঁড়া ফুটি ফাটা পোশাক পরানো হল তার শরীরে। সালভাডোর এই সুচারু শিল্পকর্মের দিকে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

তিনি বললেন, খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু আরেকটু কিছু করতে হবে। তোমাকে এখনই ইতালি থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেব। বিশ্বের যে কোন জায়গায় তুমি চলে যেও, কিন্তু দেখো, তোমার ছবি যেন কোনোদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা না হয়। কয়েক মাস কোনো একটা জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হবে। এমন একটা জায়গা যেখানে গোয়েন্দারা কখনও হানা দেবে না।

লুসিয়ার মনে পড়ল তোমার যদি কোনো বন্ধুর দরকার হয়, তুমি ডোমিনিক ডারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমরা ভাইয়ের মতো। সে ফরাসী দেশের সীমান্তের কাছে বেডিয়াসে একটা বাড়িতে থাকে।

–আমি জানি কোথায় আমি যাব, লুসিয়া বলেছিলেন, আমার শুধু একটা পাসপোর্ট দরকার।

আমি তার ব্যবস্থা করছি।

.

চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, লুসিয়া রোমান নামে একটি পাসপোর্ট, নতুন ছদ্মবেশে লুসিয়ার ছবি সেখানে সাটানো আছে।

-তুমি কোথায় যাবে?

ফরাসী দেশে আমার বাবার একজন বন্ধু আছেন, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

সালভাডোর বললেন- তুমি কি চাও আমি তোমাকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেব?

ওঁরা দুজনেই জানেন ব্যাপারটা খুব একটা সুবিধার নয়। যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ার আশঙ্কা। সালভাডোর এক ঘৃণিত অপরাধী।

লুসিয়া তাই বললেন না সালভাডোর, আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। বাকিটুকু আমাকে এবার একলাই করতে হবে। পরের দিন সকালবেলা, সালভাডোর একটি ফিয়াট ভাড়া করলেন লুসিয়া রোমান নামে। লুসিয়ার হাতে চাবি তুলে দিলেন।

তিনি বললেন–সাবধানে যেও কিন্তু। তুমি নিরাপদে বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত আমার মন দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

–ভাববেন না, আমি যখন জন্মেছিলাম, আকাশে তখন নতুন একটা তারার জন্ম হয়েছিল। আপনি কি তা জানেন?

হ্যাঁ, বাবা তো আমাকে একথাই বলেছিল। জানি না বাবার কথার কতটা সত্যি।

ইটালি ও ফরাসী সীমান্ত। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা লাইন পড়ে গেছে। প্রত্যেকটা গাড়িকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা হবে। বৈধ কাগজপত্র আছে কিনা দেখা হবে। তবেই সীমান্ত পার হওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হবে। লুসিয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন অফিসের দিকে। অত্যন্ত স্নায়ুকাতর হয়ে উঠেছেন তিনি। মনের ভেতর অজানা আতঙ্কের শিহরণ। শেষ পর্যন্ত আমি ধরা পড়ে যাব নাকি? দুদুটো হত্যাকাণ্ড? বিচারে আমার ফাঁসি তো হবেই, তা হলে? তা হলে ওদের মুখে বিধ্বংসী হাসি লেগে থাকবে। না, আমি কখনওই তা হতে দেব না। লুসিয়া জানেন, এই দেশ থেকে বেরোবার সবকটি পথের ওপর পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি আছে। তারপর? না, এমন ঘটনা ঘটলে আমি নিজেকে হত্যা করব। লুসিয়া ভাবলেন। এটাই ছিল তার অন্তিম ভাবনা।

তিনি এগিয়ে গেলেন অফিসারের দিকে।

–পাসপোর্ট ম্যাডাম?

লুসিয়া তার কালো পাসপোর্টটি গাড়ির জানলা দিয়ে বের করে দেখালেন। অফিসার পাসপোর্টটি হাতে নিলেন। তিনি লুসিয়ার দিকে তাকালেন। অন্তর্ভেদী চাহনি। লুসিয়ার হৃদয় শুকিয়ে গেছে। জল পিপাসা পেয়েছে। তিনি দেখলেন, ওই ভদ্রলোকের চোখে

একটা অদ্ভুত দৃষ্টি। ভদ্রলোক পাসপোর্টের দিকে তাকালেন, আবার লুসিয়ার মুখের দিকে তাকালেন। এবার অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, আপনি লুসিয়া কারমাইন, তাই নয় কি?

.

০৯. লুসিয়া কারমাইন

লুসিয়া চিৎকার করে বলেছিলেন না, সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হয়েছে। তখন– তিনি পালাবার পথের সন্ধান করছিলেন। না কোনো পথ নেই। হঠাৎ মনে হল, এ কি, প্রহরীর মুখে হাসি কেন? তিনি লুসিয়ার দিকে এগিয়ে এলেন। হাতটা নীচু করলেন, ফিসফিস করে বললেন– সিনোরিয়া, আপনার বাবা আমাদের পরিবারকে অনেক করেছেন। আপনি চলে যান, সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে থাকুক।

লুসিয়া হতভম্বের মতো বলেছিলেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

লুসিয়া একসিলেটরের ওপর উঠে গেলেন। এবার পঁচিশ গজ দূরবর্তী ফরাসী সীমান্ত দেখা যাচ্ছে। ফরাসী অফিসার আবার পরীক্ষার মেজাজে বসে আছেন। এখনও পর্যন্ত কোন সুন্দরী মহিলার সাক্ষাৎ তিনি পাননি। যারা ইতিমধ্যে সীমান্ত পার হয়েছে, তাদের কুৎসিত বলা যেতে পারে। ভদ্রমহিলার মাথায় একরাশ চুল, চোখে কালো চশমা, দাঁতে ছোপ ছোপ দাগ, না, পোশাকটাও মোটেই ভালো নয়।

ইতালীয় মহিলারা কেন ফরাসী দেশের মহিলাদের মতো সুন্দরী নয়। উনি মনে মনে ভাবলেন। উনি লুসিয়ার পাসপোর্টের ওপর স্ট্যাম্প মেরে দিলেন। পথ দেখিয়ে দিলেন।

কয়েক ঘণ্টা পড়ে লুসিয়া বেডিয়াসে এসে অবতরণ করলেন।

***

প্রথমবার শব্দ হতেই ফোনটা কে যেন ধরেছেন। পুরুষ কণ্ঠস্বর– হ্যালো।

ডোমিনিক ডারেল?

আমি ডোমিনিক ডারেল বলছি, কে কথা বলছেন জানতে পারি কি?

লুসিয়া কারমাইন, আমার বাবা বলেছেন

লুসিয়া, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা এবং স্বাগত সম্ভাষণ–আমি তোমার ফোনের জন্যই বসে আছি।

–আমি আপনার সাহায্য চাইছি।

–তুমি আমার ওপর পুরো বিশ্বাস করতে পারো।

লুসিয়ার মনের ভেতর আশার আলো জ্বলে উঠল। অনেক দিন বাদে তিনি একটা ভালো খবর শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এখন তার মানসিক অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

–আমাকে এমন একটা জায়গার সন্ধান দিতে পারেন যেখানে আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারব?

–কোনো সমস্যা নেই। আমি এবং আমার বউ দুজনে মিলে একটা পরিকল্পনা ঠিক করেছি। আমরা তোমাকে এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখব, যেখানে পুলিশের বাবাও ঢুকতে পারবে না।

ব্যাপারটা ভাবতে লুসিয়ার ভীষণ ভালো লেগেছিল।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

–তুমি এখন কোথায় আছো লুসিয়া?

–আমি...।

তখনই লুসিয়ার মনে হল, একটা খরখরে শব্দ ভেসে আসছে। তা হলে? পুলিশ কি এখানেও আমার ওপর নজর রেখেছে নাকি? নাকি সর্টেড রেডিওর শব্দ।

ফোনটা সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেটে দিলেন।

লুসিয়া?

মাথার ভেতর অসংখ্য ঘণ্টার ধ্বনি।

লুসিয়া?

তুমি এখন কোথায়? আমি তোমাকে নিতে আসছি।

উনি কেন বাড়িতে একটা রেডিও রেখেছেন? এটা তো পুলিশের ব্যবহার করা রেডিও।

তার মানে? টেলিফোনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উনি ধরেছেন। ব্যাপারগুলো মিলে যাচ্ছে। তার মানে? উনি বোধ হয় আমার ফোনের অপেক্ষায় বসেছিলেন।

লুসিয়া তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

লুসিয়া জানেন, জানেন কেন, এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন, ওই ভদ্রলোক আর কেউ নন, উনি হলেন একজন ছদ্মবেশী পুলিশ। তাহলে? এখানে থাকাটা আর উচিত হবে না। এখুনি পুলিশ এখানে আসতে পারে।

লুসিয়া? লুসিয়া রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। অতি দ্রুত টেলিফোন বুথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরক্ষণেই মনে মনে তিনি ভাবলেন, না, এখনই আমাকে ফ্রান্স দেশকে গুডবাই জানিয়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

লুসিয়া তাঁর গাড়িতে এসে বসলেন। গ্লোব কমপার্টমেন্ট থেকে একটি ম্যাপ কিনে আনলেন। কিছু দূরেই ট্রেনের সীমান্ত। তিনি ম্যাপটা যথাস্থানে রেখে দিলেন, গাড়ি

চালানো শুরু হল। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছেন, ফ্রান্স সেবাসতিয়ান তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

স্পেনীয় সীমান্তে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাগুলো আয়ত্তের বাইরে চলে গেল।

***

–অনুগ্রহ করে পাসপোর্ট দেখাবেন?

লুসিয়া স্পেনীয় অফিসারের হাতে তার পাসপোর্ট তুলে দিলেন। তিনি ভালোভাবে পাসপোর্টটা পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কেমন একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটে উঠেছে তার আচরণে। তিনি লুসিয়ার দিকে আবার তাকালেন। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের ভাব পালটে গেল।

এক মুহূর্তের মধ্যে লুসিয়ার মনে হল, উনি বোধহয় আমাকে চিনতে পেরেছেন। এখন কী করা যায়? তিনি দেখতে পেলেন, ভদ্রলোক ছোটো অফিস কিয়সের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পাসপোর্টটি তিনি আর একজন অফিসারকে দেখালেন। দুজন উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন। এখনই পালাতে হবে, লুসিয়া ভাবলেন। তিনি ড্রাইভারের দিকের দরজা খুললেন। বাইরে বেরিয়ে এলেন। একদল জার্মান ট্যুরিস্ট মনের আনন্দে হৈ চৈ করছে। এইমাত্র তাদের হাতে কাস্টমসের ছাড়পত্র মিলে গেছে। তারা লুসিয়ার গাড়ির পাশে একটি ভ্যানে গিয়ে উঠবে। সামনে লেখা আছে মাদ্রিদ।

গাইড হাসিমুখে ডাকছেন চলে আসুন, চলে আসুন, এবার যাবার সময় হয়েছে।

লুসিয়া সেদিকে তাকালেন। মুহূর্তের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

উঠে পড়লেন ওই ভ্যানের মধ্যে। তারপর? সীমান্ত পার হয়ে ভ্যান এগিয়ে চলেছে মাদ্রিদের পথে।

***

জার্মান ট্যুরিস্টরা মনের আনন্দে গান ধরছেন। ধরবেন নাই বা কেন? তাদের কারোর মাথায় তো আর লুসিয়ার মতো বিপদ নেই। পুলিশ তো ওদের কাউকে তাড়া করছে না। ওরা এখন আনন্দে গান তো গাইবেই।

লুসিয়া মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। দুটি দৃশ্য ফুটে উঠল তার মনের ক্যানভাসে। ওই হলেন বিচারক, তার সঙ্গে কাটানো সংক্ষিপ্ত প্রহর। উনি বলেছিলেন লুসিয়া, সব বিবাদ ভুলে এসো, আমরা ভালো বন্ধু হই। তারপর? তারপর নীরব মৃত্যুর ছায়া।

এবং বেনিটো পাটাস- এসো, এসো লুসিয়া, পুরোনো দিনের মতো আবার শুরু করা যাক।

আর একটি মৃত্যু।

বাস এগিয়ে চলেছে।

গাইড বলল এবার আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দেব। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। মিনিট পনেরো এখানে থাকব।

লুসিয়া ভাবলেন, মাদ্রিদে পৌঁছোনোর পর ঠিক করব, আমি কোথায় যাব।

***

এটি হল প্রাচীর ঢাকা শহর আভিলা। সবাই নেমে গেছে। লুসিয়া কিন্তু সিটে বসেছিলেন। তিনি যাবেন কোথায়?

গাইড বললেন-ফয়েলিন, আপনি যাবেন না?

লুসিয়া ইতস্তত করছেন। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছুক ভাবে উঠলেন। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

গাইডের দুচোখে বিস্ময়–ফয়েলিন, আপনি তো এই দলভুক্ত নন।

লুসিয়া হাসলেন উষ্ণতার হাসি না, আমার গাড়িটা ভেঙে গেছে, সান সেবাস তিয়ানে। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি মাদ্রিদে যেতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে...

-না-না, তা হবে না। এটা একটা প্রাইভেট টুর।

লুসিয়া বললেন দেখুন আমি জানি, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন—

–আপনি মিউনিখে গিয়ে কোম্পানির হেড কোয়াটারের সঙ্গে কথা বলুন।

–এখন কী করে যোগাযোগ করব? বলেছি তো, আমার খুব তাড়া আছে।

না-না, আপনি আমাকে সমস্যায় ফেললেন। এখনই বাস থেকে নেমে যান, না হলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।

লুসিয়া কোনো কথা বলতে পারলেন না। কুড়ি মিনিট কেটে গেল। লুসিয়ার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে বাস সামনের দিকে এগিয়ে গেল। লুসিয়া সেখানে পড়ে রইলেন, একা, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। কোথায় যাওয়া যায়? স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিরাট বড়ড়া বাড়ি, পাথরের তৈরি প্রাচীর, এক-একটা জানালাতে এক-একটা শহরের নাম লেখা আছে। পাশেই কাফেটেরিয়া। কত কিছু জিনিস বিক্রি হচ্ছে। ধূমায়িত কফি কাপের দিকে তাকিয়ে লুসিয়ার মনে হল, অনেকক্ষণ তার পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু হাতে গোনা মাত্র কটি পয়সা আছে মানিব্যাগের মধ্যে। এখন তিনি কিছু কিনবেন না। বাসের টিকিটের দাম কত তাও দেখতে হবে।

মাদ্রিদ লেখা জানলার দিকে লুসিয়া এগিয়ে গেলেন। ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ ছুটো ছুটি করছে। একজনের হাতে একটি ফটোগ্রাফ। এক দরজা থেকে অন্য দরজার দিকে তারা চলেছে।

লুসিয়ার মনে হল, ওরা বোধহয় আমাকেই খুঁজছে। তার মানে? বাস ড্রাইভার সব কথা বলে দিয়েছে?

এসপ্লাটরের ওপর একদল মানুষ হেঁটে চলেছে। একটি পরিবার। লুসিয়া তাদের মধ্যে মিশে গেলেন। তারপর আভিলার রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। ধীরে সুস্থে হাঁটছেন যাতে কারোর সন্দেহ না হয়। ক্যালে ডে লা মাদ্রে সোলোভের দিকে গেলেন। গ্রানাইট পাথরে তৈরি বাড়ি। রট আয়রনের ব্যালকনি। পৌঁছে গেলেন প্লাজা ডে লা সানটাতে। পার্কের দিকে তাকালেন। কয়েকজন মহিলা পার্কে বসে আছে। দম্পতিরা গল্প করছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটি দিনের অবসান।

লুসিয়া বসলেন, পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছে। দুজন পুলিশ নেমে এল। তারা একলা বসে থাকা একটি মহিলাকে প্রশ্ন করছে।

লুসিয়ার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে।

তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। দূর থেকে আরও দূরে চলে যাবার চেষ্টা করলেন। পরবর্তী রাস্তাটার নাম কী? লুসিয়া অবাক হলেন। এই রাস্তার নাম হল স্ট্রিট অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ। লুসিয়া ভাবলেন, জানি না আমার ভাগ্যে কী লেখা আছে?

হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। চার্চ থেকে ভেসে আসছে। তিনি সামনের দিকে তাকালেন। পাহাড়ের ওপর একটা মঠ চোখে পড়ছে কি? লুসিয়ার চোখের তারায় বিস্ময় এবং সামান্য কিছু উদ্বিগ্নতা।

***

তুমি কেন এখানে এসেছ? মাদার বেটিনা জানতে চাইলেন।

আমার কোনো আশ্রয় নেই মাদার।

–তুমি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নেবে?

ঠিকই বলেছেন, লুসিয়া বলার চেষ্টা করলেন। ছোটো থেকেই আমার মনে হয়েছে, এই জীবনটা আমি ঈশ্বরকে দান করব।

-কে বলতে পারে, কখন কোন্ নির্দেশ আমাদের কাছে আসে, তাই না কন্যা?

যিশু, সত্যি সত্যি তুমি কি আছে? লুসিয়া ভাবলেন।

মাদার বললেন তোমাকে মনে রাখতে হবে, এখানকার বিধি নিষেধ খুবই কড়া। এখানে প্রবেশ করার পর বাইরের পৃথিবীর দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

মাদারের মুখ থেকে ছিটকে আসা এই কথাগুলো লুসিয়ার মনে বাজনা বাজিয়ে দিয়েছে।

চার দেওয়ালের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে তুমি কিন্তু আর বাইরে বেরোতে পারবে না। আমার মনে হয়, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। শান্ত মনে সবকিছু চিন্তা করো। কাল না হয় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো।

লুসিয়ার মনে হল, সুসময়টা হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। তিনি অধৈর্য হয়ে বললেন– না, মাদার। আমি সব চিন্তা করেছি। আমি এই বন্দী জীবন কাটাতে চাই।

মাদার অবাক হয়ে গেছেন। এই তরুণীর হাবভাবের মধ্যে কেমন একটা চঞ্চলতা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যেন মানসিক দিক থেকে সুস্থ নয়।

উনি জানতে চাইলেন- তুমি কি ক্যাথোলিক?

–হ্যাঁ।

উনি একটা পুরোনো আমলের পেন হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম কী মেয়ে?

-আমার নাম লুসিয়া কার রোমা।

–তোমার মা-বাবা বেঁচে আছেন?

–আমার মা-বাবা

বেঁচে আছেন।

উনি কী করেন?

–উনি একজন ব্যবসাদার। এখন ব্যবসা থেকে ছুটি নিয়েছেন।

এক মুহূর্তের মধ্যে বাবার বিবর্ণ শুকনো মুখখানি মনে পড়ে গেল।

–তোমার কোনো ভাইবোন আছে?

দুটি ভাই।

–তারা কী করে?

লুসিয়া বললেন –ওরা ধর্মযাজক।

-বাঃ, চমৎকার।

তিন ঘণ্টা ধরে নানা অনুষ্ঠান চলল। সব কিছু শেষ হয়ে গেল। মাদার বেটিনা বললেন রাতে তুমি এইখানে শুয়ে থাকবে? সকালবেলা তোমাকে একদফা নির্দেশ দেব। তারপর, তুমি এখানকার বাসিন্দা হয়ে যাবে। আমি আবার বলছি, এই পথ কিন্তু সহজ নয়, মনে থাকে যেন।

লুসিয়া বলেছিলেন বিশ্বাস করুন, এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।

***

রাতের বাতাস নরম হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে কাদের ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। লুসিয়া ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন একটা সুন্দর ভিলায় একটা পার্টিতে উপস্থিত হয়েছেন। বাবার উজ্জ্বল মুখখানা দেখা যাচ্ছে। ভাইয়েরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। আহা, এমন সুসময়, সেই ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকে পড়ল। বলল– সমস্ত

আলোগুলো নিভিয়ে দাও। শুধু একটি ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠল লুসিয়ার মুখের ওপর। লুসিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। এই আলো তাকে অন্ধ করেছে।

জনা ছয়েক মানুষ ঘোরাঘুরি করছে। কারা এরা?

একজন জানতে চাইল আপনারা কে? তার কণ্ঠস্বর কর্কশ।

লুসিয়ার মন সতর্ক হয়ে উঠেছে। তাহলে? শেষ পর্যন্ত আমরা ফাঁদে পড়লাম? কিন্তু যদি এরা পুলিশের লোক হয়ে থাকেন, তাহলে তো এদের জানা উচিত, আমাদের পরিচয়। অন্ধকার অরণ্যে এরা কী করছে?

লুসিয়া একটা সুযোগ নেবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন- আমরা আভিলা কনভেন্টের সিস্টার। সরকারের তরফ থেকে ওই কনভেন্ট আক্রমণ করা হয়েছে।

ওই ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন আমরা ওই ঘটনাটা শুনেছি।

বাকি দুজন সিস্টারের ঘুম ভেঙে গেছে, তারা উত্তেজনায় ছটফট করছেন। ভয়ের অভিব্যক্তি জেগেছে মুখের তারায়।

মেগান জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা কে? আপনারা কে?

–আমি হলাম জাইমে মিরো।

***

সব শুদ্ধ ওরা ছিলেন সংখ্যায় ছজন। ফুটিফাটা ট্রাউজার্স পরনে, চামড়ার তৈরি জ্যাকেট। ছিঁড়ে গেছে এমন সোয়েটার। ক্যানভাসের তৈরি জুতো। মাথায় আছে তেরচা টুপি। ওঁদের হাতে অস্ত্রচাঁদের নিষ্প্রভ আলোয় ওদের মুখের কঠিন অভিব্যক্তি চোখে পড়ল। দুজনকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, তাদের নির্মমভাবে আঘাত করা হয়েছে।

যে ভদ্রলোক নিজেকে জাইমে মিরো বলে পরিচয় দিলেন, তিনি লম্বা এবং শীর্ণ। কালো দুটি চোখে লাল আগুন জ্বলছে।,

–ওরা আমাদের অনুসরণ করতে পারে। এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে।

লুসিয়া বুঝতে পারলেন। কোনো এক মহিলা উত্তর দিলেন। লুসিয়া দূরের জঙ্গলের দিকে তাকালেন।

রিকার্ডো মেলাডো জানতে চাইলেন, এদের নিয়ে কী করব?

জাইমে মিরো বললেন- ওদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমরা এখান থেকে এখনই চলে যাব।

একজন বলেছিলেন –জাইমে, এঁরা হলেন যিশুর লিটল সিস্টার।

–যিশু এদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেবেন। আমাদের হাতে অনেক কাজ আছে।

সেবিকারা উঠে দাঁড়িয়েছেন। অপেক্ষা করছেন। জাইমে এখনও কথা বলছেন।

–আপনি তো জানেন আকোকা কী ধরনের মানুষ। এঁদের এভাবে ফেলে যাওয়া উচিত কি?

–একটা কথা মনে রেখো, পুলিশ কিন্তু আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

–আমরা সাহায্য না করলে সিস্টাররা কিন্তু বাঁচবেন না।

জাইমে মিরো শান্তভাবে জবাব দিলেন না, ওদের জন্য আমরা আমাদের জীবনে বিপদ ডেকে আনব না। নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

একজন লেফটেন্যান্ট, ফেলিক্স কারপিও বললেন, আমরা কিছু দূর যদি ওঁদের সঙ্গ দিই? তাহলে কী হবে?

–আপনারা কোথায় যাবেন। থেরেসা কথা বললেন। তিনি বললেন আমি একটা মহৎ উদ্দেশ্যে এসেছি। মেনডাভিয়াতে একটি কনভেন্ট আছে। আমরা সেখানে পৌঁছোতে চাইছি।

ফেলিক্স কারপিও জাইমে মিরোকে বললেন চলুন, এদের মেনডাভিয়া পর্যন্ত নিয়ে যাই। আমরা তো সান সিবাসটিয়ানে যাব, পথেই মেনডাভিয়া পড়বে।

জাইমে মিরো রেগে গেছেন –তুমি বোকার মতো কথা বলো না। তুমি কেন সকলকে বলছ আমি কোথায় যাব।

-না, আমি বলতে চেয়েছিলাম...

হতাশা ঝরে পড়ছে জাইমে মিরোর কণ্ঠস্বরে এখন আর কোনো উপায় নেই। যদি আকোকা এদের ধরে ফেলে, তাহলে এরা কথা বলতে বাধ্য হবে। সুতরাং বিপদ যা হবার তা হয়েই গেছে।

লুসিয়া কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছিলেন। কী হবে? সোনার তৈরি ক্রশটা হাতের বাইরে চলে গেল তাহলে?

-ঠিক আছে। জাইমে মিরো শেষ পর্যন্ত বললেন চল, যাত্রা শুরু করা যাক। কনভেন্টের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে যাই। তারপরেই এই সার্কাসটা শেষ করতে হবে।

তিনি সিস্টারদের দিকে তাকালেন। রাগত কণ্ঠস্বরে বললেন আপনাদের কেউ কি জানেন, মেনডাভিয়া কোন দিকে?

সিস্টাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

গ্রাসিলা বললেন না, আমি ঠিক জানি না।

–তাহলে? সেখানে গিয়ে আপনারা কী করবেন? যাবেন কী করে?

সিস্টার থেরেসা বললেন ভগবান আমাদের সাহায্য করবেন।

রুবিও আরজিনো নামে আর একজন সহকারী বললেন এখনও ভাগ্যে বিশ্বাস করেন? তিনি জাইমের কাছে এসে বললেন, চলুন, এবার যাত্রা শুরু করি।

জাইমে বললেন আমরা তিনটে বিভিন্ন পথ ধরব।

তিনি একটা ম্যাপ খুলে ধরলেন। ম্যাপের ওপর ফ্ল্যাশ লাইটের আলো পড়ল।

–মেনডাভিয়া কনভেন্ট এখানে অবস্থিত, গ্রোনোর দক্ষিণ পূর্বদিকে। আমি উত্তর দিকে এগিয়ে যাব, ভালো ডোলডের মধ্যে দিয়ে। তারপর বারগোজের পথ ধরব।

তিনি রুবিওর দিকে তাকালেন, লম্বা ওই ভদ্রলোক।

–আপনি অল মেডোর দিকে যাবেন। সেখান থেকে পেনাফিয়েল।

–ঠিক আছে। জাইমে মিরো আবার মানচিত্রের দিকে তাকালেন। এবার রিকার্ডো মেলাডোকে লক্ষ্য করলেন। মেলাডোর মুখে ধূসরতা রিকার্ডো, আপনার গন্তব্য সেভোগিয়া। পার্বত্য পথ ধরে আপনি কারিজোডি আবনৈর দিকে যাবেন। তারপর সোরিয়া। আমাদের দেখা হবে লগ্রোনোতে, কেমন?

এখান থেকে লগ্রোনো ২১০ কি.মি দূরে অবস্থিত। মনে মনে তিনি কী একটা হিসাব করলেন সাতদিন বাদে আমরা সেখানে দেখা করব, কেমন? প্রধান রাস্তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন।

ফেলিক্স জানতে চাইলেন লগ্রোনোর কোথায় আমাদের দেখা হবে?

রিকার্ডো বললেন ফিরলো জাপানে। তাই তো?

হ্যাঁ, এই ব্যবস্থা পাকা রইল।

দাড়িওয়ালা ফেলিক্স কারপিও বললেন– এই সিস্টারদের সঙ্গে কে যাবেন?

ওনাদের নানা ভাগে ভাগ করতে হবে।

লুসিয়া চিন্তা করলেন, এখানেই প্রতিবাদ করা দরকার। আমার মনে হচ্ছে, সিনর আমাদের একা যাওয়াই উচিত। কারণ যদি সৈন্যরা আপনাদের অনুসন্ধান করে, তাহলে বিপদ হতে পারে।

জাইমে বললেন সিস্টার, এখন আর তা হয় না। কারণ আপনারা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন।

রুবিও নামে মানুষটি বললেন –কোনো সুযোগ দেওয়া যায় না। আমরা এই দেশটার সব কিছু জানি। উত্তরের বাসিন্দারা আমাদের বন্ধু। তারা আমাদের লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। আপনারা কখনওই একা-একা মেনডাভিয়াতে পৌঁছোতে পারবেন না।

লুসিয়া কী জবাব দেবেন, বুঝতে পারলেন না।

জাইমে মিরো বলতে থাকেন–ঠিক আছে, এখান থেকে যাত্রা শুরু হোক, ভোর হবার আগে বেশ কিছুটা পথ পার হতে হবে।

সিস্টার মেগান চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যে ভদ্রলোক কথা বলছেন, তার স্বভাব কেমন উদ্ধত। জাইমে মিরো থেরেসার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন- এই দুজন আপনাদের দায়িত্ব নেবেন।

তিনি টমাস সানজুরো এবং রুবিওর দিকে তাকালেন।

সিস্টার থেরেসা বললেন ভগবান আমাদের পথপ্রদর্শক হবেন।

জাইমে শুকনো কণ্ঠে বললেন ওসব কথা পরে ভাববেন, আগে এখান থেকে বাইরে যাবার চেষ্টা করুন।

রুবিও থেরেসার দিকে এগিয়ে গেলেন। জানতে চাইলেন সিস্টার, আপনাদের কী বলে ডাকব?

–আমি সিস্টার থেরেসা।

লুসিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, আমি সিস্টার থেরেসার সঙ্গে যাব।

লুসিয়া জানেন, সিস্টার থেরেসার হাতেই সোনার ওই ক্রুশটা আছে।

জাইমে মিরো বললেন- ঠিক আছে। তিনি গ্রাসিলার দিকে তাকালেন রিকার্ডো, আপনি এদের দায়িত্ব নিন।

একজন মহিলা এসে গ্রাসিলার দায়িত্ব নিলেন।

জাইমে মেগানের দিকে তাকালেন সিস্টার আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মেগান এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখন আর ভাববার সময় নেই। ওই ভদ্রমহিলা এবার এগিয়ে এলেন। তিনি মেগানকে বললেন আমি অ্যামপারা জিরন। মুখ বন্ধ রাখবেন। সিস্টার, মুখ খুললেই কিন্তু সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অন্ধকারের মধ্যে মেগান তাকালেন ওই ভদ্রমহিলার মুখের দিকে। মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, একটা লাল ক্ষতচিহ্ন আছে কোথাও, কিন্তু শরীরের ভেতর একটা আবেদন। অন্ধকারের ভেতরেও তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

যাত্রা শুরু হল। সিস্টার থেরেসা এবং রুরিও আরজনন ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছেন। লুসিয়া দ্রুত তাদের অনুসরণ করতে থাকলেন।

তারপর? নতুন এক অভিযাত্রা।

.

১০.

মিগুয়েল খুবই ভয় পেয়েছিল। কেন? কে তাকে দেখে ফেলেছে? মালিকের স্ত্রী। এক বয়স্কা মহিলা, দেখলেই বোঝা যায় খুবই রাগী স্বভাবের। তিনি চিৎকার করে বললেন

-তুমি কে? ঢুকলে কী করে? এখানে কী করছ?

মিগুয়েল হাসার চেষ্টা করল। হাসি ফুটছে না তার ঠোঁটে। ভয়ের একটা স্রোত।

সে বলল আমাকে এখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছেন। আমি কি একবার ফোন করতে পারব? পুলিশকে ডাকতে পারব।

–এখনও তুমি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দাওনি।

মিগুয়েল ভালোভাবে বসার চেষ্টা করছিল। সে বলল– ম্যাডাম উত্তরটা খুবই সহজ। আমি. গঞ্জালেস, আমি মাদ্রিদের কাছাকাছি একটা মঠ থেকে এখানে এসেছি। আমি আপনার সুন্দর দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দুজন অল্পবয়সী ছোকরা দোকানটা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছিল। আমি ভেবেছিলাম, তাদের বাধা দেওয়া উচিত। বাধা দিতে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম। তারা আমাকে কাবু করে ফেলে। হাত-পা বেঁধে এইভাবে রেখে পালিয়ে যায়। এখন যদি আপনি একটু সাহায্য করেন।

ভদ্রমহিলা এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছেন, কি?

তারপর তিনি বললেন- তুমি পৃথিবীর সব থেকে বড়ো মিথ্যেবাদী দেখছি। এগুলো কী?

উনি এগিয়ে গেলেন, সিস্টারদের আলখাল্লা নিয়ে ফিরে এলেন। জানতে চাইলেন– এগুলো কী?

–যে দুটি ছেলে এখানে ঢুকেছিল, তারা ছদ্মবেশ ধারণের জন্য এই পোশাক পরেছিল।

চারটে আলখাল্লা পড়ে আছে। তুমি বলছ দুজন এসেছে।

–পরে দুজন, আবার যোগ দেয়।

ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে

এগিয়ে গেলেন ফোন করবেন বলে।

–আপনি কী করছেন? –পুলিশকে ডাকব।

–তার কোন দরকার নেই। আপনি আমার বাঁধন খুলে দিন। আমি নিজেই পুলিশ স্টেশনে যাব, সেখানে গিয়ে পুরো ঘটনা বলব।

ভদ্রমহিলা তাকালেন। বললেন- ফ্রায়ার। বাঁধন খুলে দেওয়া হল।

***

কারিলোকে প্রশ্ন করা হচ্ছে এসব ব্যাপার খুলে বলল। বুঝতেই তো পারছ, তোমার সামনে এখন বিপদ অপেক্ষা করছে।

কারিলো আমতা আমতা করতে থাকে। ভয়ংকর মুখের এক ভদ্রলোক সেখানে এসে প্রবেশ করলেন।

–শুভ সন্ধ্যা কর্নেল আকোকা।

এই কি সেই লোকটি?

-হ্যাঁ, কর্নেল। সিস্টারদের আলখাল্লা পাওয়া গেছে। লোকটিকেও আমরা দোকানের মধ্যে পেয়েছি। আপনি কি নিজে প্রশ্ন করবেন?

কর্নেল র‍্যামন আকোকা কারিলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন হ্যাঁ, আমি নিজেই প্রশ্ন করব।

মিগুয়েল হাসি দিয়ে অভিবাদন জানাবার চেষ্টা করেছিল। সে বলল কর্নেল, আপনাকে দেখে ভালো লাগল। আমি চার্চের কাজে বাইরে এসেছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে বার্সিলোনাতে পৌঁছোতে হবে। সব কথা এদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। ঘটনার আবর্তে আমাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল আকোকা হাসি মুখে বললেন ঠিক আছে, আপনার তাড়া আছে। তাই তো? আমি বেশি সময় নষ্ট করব না।

মিগুয়েল জবাব দিল –আপনাকে ধন্যবাদ কর্নেল।

–আপনাকে কয়েকটা অতি সাধারণ প্রশ্ন করব, যদি উত্তর শুনে আমি সন্তুষ্ট হই, তাহলে আপনাকে এখনই ছেড়ে দেব। আর যদি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেন বা মিথ্যে কথা বলেন, তাহলে ফল কিন্তু ভালো হবে না।

তিনি হাতে কিছু একটা নিলেন। মিগুয়েল আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে গেল ঈশ্বরের সেবকরা কখনও মিথ্যে বলে না।

ঠিক আছে, এই শব্দগুলো আবার আপনার মুখ থেকে শুনব। ওই চারজন সিস্টার সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন তো।

আমি কিছু জানি না, কর্নেল।

একটা ঘুষি, সজোরে এসেছে বা চোয়ালের ওপর। রক্ত ছিটকে এসেছে। এতক্ষণ বাদে কারিলো বুঝতে পেরেছে, হাতে যে আংটি আছে, সেখানে চকচকে একটি তীক্ষ্ণ ধার আছে।

কারিলো থতমত খেয়ে গেল হায় ঈশ্বর, আপনি কী করছেন?

কর্নেল আকোকা আবার জানতে চাইলেন ওই চারজন সম্পর্কে গুছিয়ে বলুন।

–আমি জানি না।

আবার মুখের ওপর একটা ঘুষি, দাঁত ভেঙে গেছে।

মিগুয়েল রক্ত দেখে ঘাবড়ে গেছে। কিছু বলার চেষ্টা করছে সে। আকোকার কণ্ঠস্বর হঠাৎ নরম হয়ে উঠেছে। আর একটা ঘুষি। শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হল কারিলো।

সে গড়গড় করে বলে গেল ওরা কনভেন্ট থেকে পালাচ্ছিল। আমাকে আর আঘাত করবেন না?

বলতে থাকুন, বলতে থাকুন।

আমি ওদের সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। ওরা পোশাক পালটেছিল।

–তাই আপনি কাঁচের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েন, তাই তো?

-হ্যাঁ, আমি কয়েকটা পোশাক চুরি করেছিলাম। তারা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আমাকে একা রেখে চলে যায়।

–ওরা কোনদিকে যাচ্ছে, কিছু বলেছিল?

কারিলো বলল না। সে মেলডাভিয়ার নাম করেনি। কারিলো জানে, একথা বলে কোনো লাভ নেই। ইতিমধ্যে কর্নেল ঘুষি মেরে তার মুখটা ভেঙে দিয়েছেন। এখন আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী হবে?

***

লুসিয়া, সিস্টার থেরেসা, রুবিও আরজিনো এবং টমাস সানজুরো উত্তর-পূর্বদিকে হাঁটছিলেন। অলমেডা তাদের লক্ষ্য। প্রধান রাস্তা এড়িয়ে তারা চলছিলেন। ঘাসের বুকে পা রেখে রেখে। আহা, প্রকৃতি এখানে নির্ভার। কত সুন্দর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

রুবিও আরজিনো বললেন আমরা অলমেডার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। রাত হওয়া অব্দি এখানে অপেক্ষা করব। দেখা যাক ঘুমোনোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

সিস্টার থেরেসা শারীরিকভাবে আর পারছেন না। কিন্তু তার মাথা এখনও কাজ করছে। এখনও তিনি ওই মূল্যবান বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

কোথায় যাব? কিছুই জানি না। শেষ অব্দি পথ পরিষ্কার হবে তো?

৩. মনের মধ্যে পবিত্র আগুনশিখা

১১. ইজে, ফ্রান্স, ১৯২৪

আট বছরের কথা মনে পড়ে যায় থেরেসার। তখন থেকেই তার মনের মধ্যে পবিত্র আগুনশিখা জ্বলে উঠেছিল। তিনি ক্যাথিড্রালে বেড়াতে যেতেন। কখনও মোনাকোতে, কখনও নোতরদামে। প্রতি রোববার ইজের চার্চে যেতেন। প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেন।

থেরেসা থাকতেন পাহাড়ের ওপর। মধ্যযুগের এক ছোট্ট গ্রামে। গ্রামটির নাম ইজে। তারই পাশে মন্টিকারলো- এই গ্রামের চারপাশে উঁচু উঁচু টিলা। থেরেসার মনে হত, পৃথিবীর সমস্ত শান্তি এখানে সমাহিত হয়ে আছে। একেবারে ওপরে ছিল একটি মনাষ্ট্রি। তার পাশে কত কী দেখা যায়। ওই দূরে আকাশরেখা, আরও দূরে ভূমধ্যসাগরের জলরাশি।

থেরেসার থেকে এক বছরের ছোটো মনিকা, সে বোধহয় সকলের চোখের মণি। ছোটোবেলা থেকেই তার মনে হয়েছিল ভবিষ্যতে সে এক পরিপূর্ণা যুবতী হয়ে উঠবে। দ্যুতিময় দুটি নীল চোখ ছিল তার। যখন হাসত, মনে হত, স্বর্গের সুষমা তার ওপর ঝরে পড়ছে। এরই পাশাপাশি থেরেসা। তাকে আমরা একটা কুৎসিত হাঁস বলতে পারি। এই মেয়েটিকে নিয়ে বাবা ডিফসের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ভবিষ্যতে এই মেয়েটির কী হবে, তা নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। হায় ঈশ্বর, সর্বত্র খুঁতে ভরা একটি মেয়ে। বাঁচবে কেমন করে?

ভদ্রলোকের কেবলই মনে হত, ভগবান তার সঙ্গে প্রতারণার খেলা খেলেছেন। তবে থেরেসার কণ্ঠস্বরটি ছিল ভারী সুন্দর। যখন সে কথা বলত, মনে হত স্বর্গের কোনো দেবদূতি বুঝি কথা বলছে। চার্চ কয়ারে তার গান শুনে অনেকে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকের চোখে জেগে ছিল বিস্ময়, থেরেসার বয়স বাড়ল, তার কণ্ঠস্বর আরও সুন্দর হয়ে উঠল। তখন সেই প্রার্থনা সঙ্গীতে প্রধান অংশ নিত। মনে হত সে বুঝি সংগীতের সাথে নিজের আত্মাকে মিলিয়ে দিয়েছে।

স্কুলে মনিকার অনেক বন্ধু ছিল। ছেলে এবং মেয়েরা তার চারপাশে ভিড় করত। সকলেই তার সঙ্গে খেলতে ভালোবাসত। মাঝে মধ্যে মনিকাকে বিভিন্ন পার্টিতে ডাকা হত। থেরেসাকেও বলা হত, কিন্তু অনেক ভাবনা চিন্তা করে। যেহেতু এটাও একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা। থেরেসা সেটা বুঝতে পারত।

শেষ অব্দি কেমন যেন হয়ে গেল সে। যদিও মা-বাবার দিক থেকে ঘৃণা উদাসীনতা কোনো কিছুই ছিল না। তারা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছিলেন। তবে একথা সত্যি মনিকাকে তারা একটু বেশি ভালোবাসতেন। থেরেসার জীবনে তখন থেকে একটা বিষয়ের অভাব চোখে পড়ে। তা হল নিখাদ ভালোবাসা।

থেরেসা ছিল অনুগত বালিকা। সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করত। গান ভালোবাসত, ভালোবাসত ইতিহাস আর বিদেশী ভাষা। স্কুলে দারুণ পরিশ্রম করত। শিক্ষিকারা বলত, মেয়েটার মাথা আছে।

শেষ অব্দি থেরেসা চার্চের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল।.যাজক তাকে খুবই ভালোবাসতেন। যিশুর কাছ থেকেও সে অদৃশ্য ভালোবাসা পেয়েছিল। রোজ সকালে মাস অনুষ্ঠানে যেত। ক্রুশের চোদ্দোটা স্টেশন অতিক্রম করত। তারপর? থেরেসার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হল। সে বোনকে ভালোবাসত। বোনের এই সাফল্যে কখনও ঈর্ষান্বিতা হয়নি।

এবার বালিকা বয়স শেষ করে তারা এল কিশোরী বেলায়। একদিন রাত্রে মা-বাবাকে তার সম্বন্ধে কথা বলতে শুনেছিল থেরেসা। বাবা চিন্তিত মনে বললেন–বড়ো মেয়েটিকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সারা জীবন ওর ভার বহন করতে হবে।

মা জবাব দিয়েছিলেন– দেখো, একদিন থেরেসা তার মনের সাথীকে খুঁজে পাবে।

বাবা তাচ্ছিল্যতার উত্তর দিয়েছিলেন তুমি কিছু বোঝো না, সুন্দর গলা থাকলেই কি কোনো পুরুষ পছন্দ করে? তারা দেখবে মেয়েটি কেমন শয্যাসঙ্গিনী।

থেরেসা এই কথা শুনে ভয়ে পালিয়ে আসে।

***

তখনও থেরেসা প্রতি রবিবার চার্চে গান গাইছে। এই গানই তার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। মাদাম তুরো, রেডিও স্টেশনের এক ডিরেকটরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। থেরেসার গলা শুনে তিনি সরাসরি থেরেসাকে রেডিওতে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

শেষ অব্দি এল সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি। মাইক্রোফোনের সামনে বসে থেরেসা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এখানে কীভাবে গান গাইতে হয়, সে বিষয়ে তার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু সে অসাধারণ গান গাইল। তার গান শুনে সকলে বুঝতে পারল, সংগীত আকাশে এক নতুন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে।

একদিন সকালে সে একটা টেলিফোন পেল। বলা হল, তাকে ফরাসি দেশে যেতে হবে। কে ফোন করেছেন? জ্যাকুইস রাইমু, ফরাসি দেশের অন্যতম স্টেজ ডিরেক্টর।

এই ফোন পেয়ে থেরেসা নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেনি। আবেগে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল সে। সব কিছুই স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল তার কাছে। রাইমুর ছবিতে সে অভিনয় করবে? তা কেমন করে সম্ভব?

– থেরেসার বাবা এই কথা শুনে গভীর চিন্তান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেছিলেন, থেরেসা, থিয়েটারের মানুষজনের সঙ্গে মিশতে গেলে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

মা বলেছিলেন–আমরা তোকে একটা নতুন পোশাক কিনে দেব। ভদ্রলোককে এখানে আমন্ত্রণ জানালে কেমন হয়।

মনিকা এই খবর শুনে কেমন একটা হয়ে যায়। যা কিছু ঘটছে সবই অবিশ্বাস্য। তার বড়দি এখন এক স্টার হবে? এটা কি বিশ্বাস করা যায়?

***

ঠিক সময়ে জ্যাকুইস রাইমু এলেন। ছোটো একটি মেয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল। ভদ্রলোকের হৃদয় কেঁপে উঠল। আহা, সুন্দর সাদা পোশাক পরেছে। তবুও শরীরের চড়াই উৎরাইগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভদ্রলোক ভেবেছিলেন। এমন চেহারা আর এমন গলা, মনে হয় মেয়েটি কল্পলোকের নায়িকা হয়ে উঠবে।

রাইমু বললেন তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি নিজেকে খুবই আনন্দিত বলে মনে করছি।

মনিকা উষ্ণ হাসির টুকরো এনে বলেছিল–আপনার নাম আমি অনেকদিন ধরে শুনেছি মঁসিয়ে রাইমু। আপনাকে যে চোখের সামনে দেখতে পাব তা ভাবতেই পারিনি।

–তাহলে এসো, কথা শুরু হোক। একটা সুন্দর প্রেমের গল্প। আমার মনে হচ্ছে। থেরেসা ইতিমধ্যেই ঘরে এসে ঢুকেছে। সে জ্যাকুইস রাইমুর দিকে তাকাল।

–আমি জানি না, আপনি এসেছেন।

অবাক হয়ে রাইমু মনিকার দিকে তাকিয়ে আছেন।

মনিকা বলল ও হল আমার দিদি থেরেসা।

মুখের হাবভাব পরিবর্তিত হচ্ছে। হতাশা গম্ভীর হতাশা এবং বিষাদ।

–তাহলে তুমিই হলে সেই গায়িকা।

–হ্যাঁ।

উনি মনিকার দিকে তাকিয়ে বললেন তাহলে তুমি কে?

মনিকা অমায়িক হাসি হেসে জবাব দিয়েছিল আমি থেরেসার ছোটো বোন।

রাইমু আবার থেরেসার দিকে তাকালেন। মাথা নাড়লেন। বললেন না, তোমাকে দিয়ে হবে না। আমার নায়িকা হবার পক্ষে তুমি এখনও উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারোনি। তুমি এখনও কিশোরী কন্যা। আমি প্যারিসে চলে যাচ্ছি। কেমন?

দুই বোন অবাক হয়ে গিয়েছিল। আহা, শেষ অব্দি আমার ষড়যন্ত্র কাজ দিয়েছে। মনিকা ভাবল। দিদি তাহলে আর স্টার হতে পারল না।

***

এটাই হল থেরেসার শেষ ব্রডকাস্ট। বোনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ভাবল, আমি । কি এতই কুৎসিত?

জীবনে কোনোদিন সে জ্যাকুইস রাইমুর মুখখানা ভুলতে পারবে না। উনি কেন আমাকে এমন একটা স্বপ্নের উপত্যকায় নিয়ে গেলেন। হায় ঈশ্বর, আমি কী দোষ করেছি।

এরপর থেকে থেরেসা শুধুমাত্র চার্চেই গান গাইত। অনেক সাধ্য সাধনা করা হয়েছে। সে কিন্তু কখনও মুখ খোলেনি।

***

দশ বছর কেটে গেছে। মনিকা এখন এক সুন্দরী রূপসী যুবতী হয়ে উঠেছেন। একের পর এক বারোটি বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছেন। এসেছেন মেয়রের পুত্র, ব্যাঙ্কারের তনয়, ডাক্তার, উদীয়মান আইনজীবী। ছোট্ট গ্রামের ব্যবসায়ী। তা সত্ত্বেও মনিকার মন ভোলানো সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ মধ্যবসয়ী কেউ সবেমাত্র যৌবন দিনে পদার্পণ করেছেন। তাদের অনেকেই বড়োলোক। কেউ শিক্ষিত, কেউ অশিক্ষিত।

সকলকেই মনিকা না বলে দিয়েছেন।

একদিন অবাক হয়ে বাবা জানতে চেয়েছিলেন তুই কী চাইছিস বল তো?

বাবা, এখানকার সব কিছু বিরক্তিকর। আমার স্বপ্নের রাজকুমার প্যারিস শহরে থাকে। তাহলে? মনিকাকে এখনই প্যারিসে পাঠাতে হবে। থেরেসাকেও তিনি সঙ্গে দিলেন। তারা প্যারিসের একটা ছোটো হোটেলে বসবাস করতে শুরু করল–বইস অঞ্চলে।

দুজনের চোখে প্যারিস দুভাবে ধরা পড়েছিল। মনিকা তখন একটির পর একটি চ্যারিটি করে চলেছেন। জাঁকজমকপূর্ণ ডিনার পার্টিতে তার ডাক পড়ছে। সম্ভাব্য প্রেমিকদের সাথে যোগ দিচ্ছেন চায়ের আসরে। এর পাশাপাশি থেরেসা? একটির পর একটি চার্চে

যাচ্ছেন। মনটা একেবারে পালটে যাচ্ছে। একদিন এলেন নোতরদামের বিখ্যাত ক্যাথিড্রালে। একদিন চলে গেলেন মার্টিনের ক্যানল স্ট্রিটে।

তারপর? কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু মনের মতো পুরুষ কোথায়? বাবার সঙ্গে দেখা হল। বাবা জানতে চাইলেন।

শেষ অব্দি মনিকা বলেছিলেন ম্যাক্সিমে ডিনারের আসরে একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার বাবার কয়লার খনি আছে।

মা জানতে চেয়েছিলেন ছেলেটি দেখতে কেমন?

–ওর অনেক পয়সা আছে। দেখতে ভারী সুন্দর। আমাকে ভালোবাসে।

–তোকে বিয়ে করবে কিনা জানলি না।

–ঠিক আছে, আমি জানতে চেষ্টা করব। কিন্তু ওকে আমার ভালো লাগেনি।

–কেন বল তো?

–ও খালি কয়লার গল্প করে। বিরক্তিকর, নিশ্চয়ই বিরক্তিকর।

.

পরবর্তী বছরে মনিকা আবার প্যারিসে আসতে চেয়েছিলেন। থেরেসা বলেছিল, আমি সঙ্গে যাব কি?

মনিকা বলে না দিদি, আমি একাই যেতে পারব।

মনিকা প্যারিসে পৌঁছে গেলেন। থেরেসা বাড়িতে থাকলেন। রোজ সকালে চার্চে যান। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। বোন যেন ভালো বরের সন্ধান পায়। একদিন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। দেখা হল রাউল জিরাডটের সঙ্গে।

ওই ছেলেটি প্রতি রবিবার চার্চে আসেন। থেরেসার গান শুনে বিমোহিত হয়ে গেছেন। এই ব্যাপারে উনি কিছুই জানতেন না। উনি ভাবতেন, মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

সোমবার সকালবেলা, রাউল কাউন্টারের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তিনি থেরেসার দিকে তাকালেন। তার মুখে আলো জ্বলে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন, এই মেয়েটি এক সুগায়িকা।

থেরেসাও তাকিয়ে ছিলেন রাউলের নিকে। কিছু বলতে চাইছিলেন।

রাউল বললেন- আপনার গান আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ছেলেটি দেখতে চমৎকার। লম্বা, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। ঠোঁট দুটিতে আবেদন আছে। কত বয়স? সবেমাত্র তিরিশ অতিক্রম করেছেন হয়তো। থেরেসার থেকে এক দুবছরের বড়ো হবেন।

তারপর? তারপর শুরু হল আলাপচারিতা। থেরেসার মনে হল, ছেলেটি তার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ বোধ করছেন। কেন? এ পর্যন্ত থেরেসা প্রেমের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না।

কথায় কথায় অনেক কিছুই জানা হল। থেরেসার মুখে হাসি ফুটল।

ছেলেটি বলেছিলেন- কয়েকদিন আগে আমি ইজিতে এসেছি। এই দোকানটা আমার কাকিমার। উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি এখন এখানেই থাকব।

থেরেসা জানতে চেয়েছিলেন, অবশ্যই মনে মনে, কতদিন?

রাউল বলেছিলেন- আপনি কেন পেশাগতভাবে গান করেন না?

থেরেসার মনে পড়ে গিয়েছিল রাইমুর অভিব্যক্তি।

না, থেরেসা বলেছিলেন, আপনাকে ধন্যবাদ।

এই লাজুক আভা ছেলেটিকে মুগ্ধ করেছিল। তারপর আরও কিছুদিন চলতে থাকে এই আলাপচারিতা।

ছেলেটি বলেছিলেন– এই শহরটা ভারী সুন্দর। ছোট্ট শহর, তাই তো? আপনি কোথায় জন্মেছেন?

থেরেসা বলেছিল– এইখানে।

পরের দিন থেরেসা কোনো একটা ছুতো করে আবার ওই দোকানে পৌঁছে গেলেন। রাউলকে কী বলবেন, তা নিয়ে সারারাত নিজের সাথে লড়াই করেছেন। কীভাবে কথাবার্তা আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়?

শেষ অব্দি তিনি কিছুই বলতে পারেননি। তবে মাদমোয়াজেল ডিফসকে দেখে রাউল খুশি হয়েছিলেন। আঁর মনে হয়েছিল, তিরিশ বছরের কোনো মহিলা কি কিশোরীর মতো অভিনয় করতে পারেন? তিনি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। তারপর? তারপর কিছুদিনের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়ে উঠল।

থেরেসা জানতে চেয়েছিলেন- আপনার কি বিয়ে হয়েছে?

না, আমার সে সৌভাগ্য এখনও হয়নি।

থেরেসা ভেবেছিলেন, শিগগিরিই তাই হবে।

তারপর মনিকা ফিরে এলেন প্যারিস থেকে। মনিকাও এই ছেলেটিকে ভালোবাসতে শুরু করলেন। মনে হল, তাঁরা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারেন।

একদিন থেরেসা যখন দোকানের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন, দেখতে পেলেন রাউলকে।

রাউল বলল- মামজেল শুভ সন্ধ্যা, আপনি কি ফাঁকা আছেন? আপনি কি আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন?

–অনেক ধন্যবাদ।

থেরেসার মুখ থেকে সব কথা সেদিন চুরি হয়ে গিয়েছিল। রাউলকে আরও সুন্দর লাগছে কি? রাউল থেরেসার মন জয় করার চেষ্টা করেছিলেন। তারা নিঃসঙ্গতার মধ্যে কথা বলছিলেন।

থেরেসা বলেছিলেন আমার সবসময় একা থাকতে ভালো লাগে।

–আমি বুঝতে পারছি।

–কিন্তু আপনার তো অনেক বন্ধু আছে।

বন্ধু নয়, পরিচিত, তাতে কী হল?

কথা এগিয়ে চলল।

রাউল জানতে চাইলেন– আপনি কাল আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন কি?

এটা একটা অবিশ্বাস্য আমন্ত্রণ। থেরেসা বলেছিলেন- আসতে পারলে ভালো লাগবে।

পরবর্তী দিন দেখা হল। রাউল বলেছিলেন- আমি বিকেল অব্দি ছুটি নিয়েছি। চলুন আমরা নাইসের ধার থেকে ঘুরে আসি।

আহা, প্রকৃতি এখানে কত অবাধ, কত নির্ভার মনে হচ্ছে, পায়ের তলায় কে যেন একটা ম্যাজিক কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। থেরেসা চুপটি করে বসেছিলেন, মনে হয়েছিল, এ জীবনে এত আনন্দ কখনও আসেনি। কিন্তু? মনিকার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার।

পরের দিন মনিকা প্যারিস থেকে চলে এলেন। মনিকা ভেবেছিলেন, যে করেই হোক রাউলকে অধিকার করতে হবে।

তারপর? একটির পর একটি ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত রাউল এসে হাজির হলেন থেরেসাদের বাড়িতে।

থেরেসা সকলের সাথে রাউলের পরিচয় করালেন। শেষ অব্দি মনিকা। মনিকার কণ্ঠস্বরে মধু ঝরছে। থেরেসা ভেবেছিলেন, রাউল মনিকার সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

থেরেসা সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, নিঃশ্বাস বন্ধ করে। কিন্তু কই? রাউল তো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

–আপনাকে দারুণ দেখতে।

থেরেসা ভাবতে পারেননি, এই লড়াইতে মনিকাকে তিনি হারিয়ে দেবেন।

তারপর, তাদের তিনজনকে এখানে সেখানে দেখা গেল। কখনও সন্ধ্যার আঁধার অন্ধকারে, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন শহরের জনাকীর্ণ পথ ধরে। কখনও আবার মধ্য দুপুরে হারিয়ে যাচ্ছেন রিমঝিম বৃষ্টির দেশে। নতুন কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকে ডিনারের আসরে হাজির থাকছেন।

তখন থেরেসা এবং রাউল পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করলেন। নির্দিষ্ট দিনে থেরেসাকে হাজির হতে হল চার্চে। পাদরি এসে ল্যাটিন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। আর দশ মিনিটের মধ্যে রাউল সেখানে এসে পড়বেন। থেরেসার অপেক্ষার প্রহর বোধহয় শেষ হয়েছে। নিজের এই সৌভাগ্যকে তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু, রাউল আসছেন না কেন? এত দেরী হচ্ছে কেন?

একটু বাদে থেরেসা দেখলেন, প্রধান ধর্মযাজক তার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি থেরেসার হাতে হাত রাখলেন। তার আচরণের মধ্যে উদ্বিগ্নতার ছাপ পড়েছে। থেরেসার হৃৎপিণ্ড দ্রুত লাফাতে শুরু করেছে।

–কোনো বিপদ হয়েছে কি রাউলের?

উনি বললেন– আমি ঠিক জানি না কেন এত দেরী হচ্ছে।

এবার বাবা এগিয়ে এলেন, বাবা ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন- থেরেসা।

-বাবা, কী হয়েছে। আমাকে সব খুলে বলল।

একটু আগে আমরা একটা খবর পেয়েছি। রাউল—

সত্যি বলল। রাউল কি আহত হয়েছে?

–রাউল আধ ঘন্টা আগে শহর থেকে চলে গেছে।

কী বলছ? তাহলে নিশ্চয়ই কোনো দরকারী কাজ পড়েছে। কী বলে গেছে ও?

না, ও তোর বোনের সঙ্গে চলে গেছে। ওরা ট্রেন ধরে প্যারিসের দিকে যাচ্ছে। সংবাদটা অভাবিত, কিন্তু থেরেসা শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, এর জন্য নিজেকে অভিযুক্ত করে কোনো লাভ নেই।

তারপর? থেরেসার মা এগিয়ে এসেছিলেন। থেরেসার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন আমি ভাবতেই পারছি না থেরেসা তোর নিজের বোন তোর সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করতে পারে।

থেরেসা হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন এখন দুঃখ করে কোন লাভ নেই। তিনি বলেছিলেন, মা, তুমি কষ্ট পেও না। মনিকার মতো সুন্দরী মেয়েকে রাউল তো ভালোবাসবেই। যে কোন ছেলে হলে তাই করত। এই পৃথিবীর কেউ কখনও আমাকে ভালোবাসবে না।

বাবা চিৎকার করে বলেছিলেন– থেরেসা, দশটা মনিকাকে একসঙ্গে রাখলেও তোর মতো হবে না।

কিন্তু এই সমবেদনায় কোনো লাভ আছে কি?

থেরেসা বাড়িতে ফিরেছিলেন, তারপর? বাবার ঘরে গিয়েছিলেন। বাবার ক্ষুর নিয়ে হাতের শিরা কেটে ফেলেছিলেন!

.

১২.

থেরেসা চোখ মেললেন। ডাক্তারবাবু সামনে তাকিয়ে আছেন। এসে গেছেন গ্রামের যাজকমশাই।

থেরেসা চিৎকার করেছিলেন না, আমাকে মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল। না, আমি আর বাঁচতে চাই না।

ওই যাজক ভদ্রলোক বলেছিলেন- থেরেসা আত্মহত্যা মহাপাপ। ঈশ্বর এই জীবন আমাদের দিয়েছেন। তিনি জানেন, কখন এই জীবনের অবসান হবে। তোমার বয়স এখন বেশি হয়নি। জীবনের অনেকটাই তোমার সামনে পড়ে আছে।

থেরেসা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন– আমি কেন বেঁচে থাকব? আরও বেশি কষ্ট পাবার জন্য, তাই তো? বিশ্বাস করুন, এ যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

ভদ্রলোক শান্তভাবে বলেছিলেন- মহাত্মা যিশুর কথা স্মরণ করো। তিনি আমাদের সকলের যন্ত্রণার উপশম করেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। বললেন– তোমাকে এখন বিশ্রাম নিতে হবে। আমি তোমার মাকে সব বুঝিয়ে বলেছি।

পরের দিন সকাল হয়েছে। থেরেসা উঠে দাঁড়ালেন। ড্রয়িং রুমে যাবার জন্য তৈরি হলেন।

মা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। থেরেসা দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন- মা, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি একবার চার্চে যাব। এখনই, তোমরা কেউ আমার সঙ্গে যেও না।

তারপর? থেরেসা সোজাসুজি যাজকের কাছে এলেন, বললেন– সবাই আমাকে প্রতারণা করেছে। আমি এখানেই আশ্রয় নেব। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?

কথাগুলো খুবই জোরে বলেছিলেন তিনি। চার্চে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, এই তরুণীর মনে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের জন্ম হয়েছে।

.

থেরেসা জানেন না, কী করবেন এখন। যন্ত্রণাটা অসহ্য। ঘুমোত পারছেন না, কোনো কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই। সব সময় কে যেন তাকে আক্রমণ করছে, স্মৃতি শুধু স্মৃতির মিছিল এগিয়ে চলেছে।

সব কথা মনে পড়ে গেল। এই তো কিছুদিন আগে তারা নাইসের পার ধরে হাঁটছিলেন। তিনি, রাউল এবং মনিকা।

রাউল বলেছিলেন- আহা, আজ সাঁতার দিলে কেমন হয়?

–আমি সাঁতরাতে পারি। কিন্তু থেরেসা সাঁতার কাটতে জানে না।

–তোমরা যাও না, আমি না-হয় হোটেলে অপেক্ষা করব।

রাউল এবং মনিকা চলে গিয়েছিলেন।

কত স্মৃতি, কাগনাসে কাটানো একটি সন্ধ্যাবেলা, টুকরো টুকরো স্মৃতি। থেরেসা চোখ বন্ধ করলেন। নিজেকে দোষ দেবার ইচ্ছে হল তার। কী বোকা আমি। চোখের সামনে এত ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ আমি নিজেকে সুখী বলে ভেবেছি।

.

রাত হয়েছে, অদ্ভুত স্বপ্ন, নানা ধরনের মানুষের মুখ। একই স্বপ্ন বারবার ফিরে আসছে।

রাউল এবং মনিকা ট্রেনে এগিয়ে চলেছে। দুজনের পরনে কোনো পোশাক নেই। তারা পাগলের মতো একে অন্যকে ভালোবাসছেন।

রাউল আর মনিকা এখন একটা হোটেল ঘরে। তারা ভালোবাসা প্রদর্শন করছেন। রাউলের ঠোঁটে প্রজ্বলিত সিগারেট। হঠাৎ ঘরে একটা বিস্ফোরণ। দুজনের মৃত্যু হল। চিৎকার, শুধু আর্তনাদ। থেরেসার ঘুম ভেঙে গেল।

রাউল আর মনিকা একটা পাহাড় থেকে পড়ে গেছেন নদীতে ডুবে গেছেন।

মৃত্যু হয়েছে প্লেন ধ্বংসের কারণে।

এত স্বপ্ন কেন? থেরেসার মা এবং বাবা বুঝতে পারলেন, মেয়েকে নিয়ে আরও ভাবনা চিন্তা করতে হবে। তারা সব সময় মেয়ের ওপর নজর রেখেছিলেন।

শেষ অব্দি তারা ঠিক করলেন, মেয়ের জীবনধারা একেবারে পাল্টাতে হবে। থেরেসা জানেন, এ জীবনে আর কেউ তাকে ভালোবাসবে না। ভাললাবাসার অভিনয় করবে না। শেষ অব্দি তিনি তার নিজস্ব জগত খুঁজে পেলেন, এ এমন এক জগত যেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারবে না। এ জগতের সবটুকু নীরবতায় ভরা।

একবছর কেটে গেছে। রাউলের চলে যাবার পর থেরেসার পিতা আভিলার দিকে যাত্রা করবেন বলে ঠিক করলেন।

তিনি থেরেসাকে বলেছিলেন সেখানে আমার কিছু কাজকর্ম আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? আভিলা একটা ভারী সুন্দর শহর। আমি তোমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইছি।

না বাবা, আমি কোথাও যাব না।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে থেরেসার বাবা বলেছিলেন- ঠিক আছে।

তখনই বাটলার এসে ওই ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করেছিল। সে বলেছিল- মিস ডিফসের এই চিঠিখানা এইমাত্র এসেছে।

থেরেসা অবাক হয়ে গেলেন, সেখানে কী লেখা আছে? লেখা আছে- থেরেসা, জানি না, তোমাকে চিঠি লেখার অধিকার আমি হারিয়েছি কিনা। ওই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটাতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমি কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।

মনিকা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু আমাকে নয়, দুমাসের একটা বাচ্চা মেয়েকেও। সত্যি কথা বলতে কি, আমি শান্তি পেয়েছি। আর একটা ব্যাপার তোমাকে বলা উচিত, তোমার সাথে এই আচরণ করা কখনও উচিত হয়নি আমার। কেন যে আমি এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারলাম! আসলে মনিকা আমাকে জাদু করেছিল। আমি প্রথম থেকেই জানতাম আমার বিয়েটা একটা মারাত্মক ঘটনা। তোমাকেই আমি একমাত্র ভালোবেসেছি। আমি জানি, তোমার কাছেই আমি আমার হারানো সুখ আবার ফিরে পেতে পারি। যখন তুমি এই চিঠিখানা পাবে, তখন আমি তোমার দুয়ারে প্রায় পৌঁছে গেছি।

আমি তোমাকে সারাজীবন ভালোবাসব থেরেসা। বিশ্বাস করো, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি...

না, এই চিঠির বাকিটুকু উনি আর পড়বেন না। রাউলকে আর চোখের দেখা দেখতে চাইলেন না। কী হবে মনিকার দুমাসের বাচ্চাটিকে দেখে।

কাঁদতে কাঁদতে তিনি চিঠিখানা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

থেরেসা চিৎকার করে বলেছিলেন- বাবা, আমাকে এখান থেকে এখনই যেতে হবে। আজ রাতের মধ্যে সম্ভব হবে কি?

মা-বাবা মেয়েকে শান্ত করতে পারেননি। বাবা বলেছিলেন- যদি রাউল আসে, তুই অন্তত একবার তার সঙ্গে কথা বল।

থেরেসা বাবার হাত আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন- না, আমি তাকে দেখলে নিজেকে ঠিক রাখতে পারব না, হয়তো তাকে মেরেই ফেলব।

তখন তাঁর দুচোখে জলের ধারা–তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

পৃথিবীর যেখানে হোক, সেখানেই তাকে যেতে হবে, তখন তার এমনই মনের অবস্থা।

সেই সন্ধ্যাবেলা থেরেসা আর তার বাবা আভিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

মেয়ের দুঃখের দিনের অবসান কবে হবে? বাবা ভাবলেন। বাবা সত্যি সত্যি বড়ো মেয়েকে ভালোবাসতেন। শেষ অব্দি থেরেসা নিজেকে খুঁজে পেল চার্চের মধ্যে, ফাদার বেরেনডো, সেখানকার প্রধান যাজক। তার বাবার এক পুরোনো বন্ধু। বাবার অনুরোধে থেরেসা ফাদার বেরেনডোর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সব কথা খুলে বলার চেষ্টা করেছিলেন। শুরু হয়েছিল তার জীবনের একটা নতুন অধ্যায়। কিন্তু প্রথমদিকে তিনি কেমন যেন করতেন। চার্চ তার অশান্ত মনকে শান্ত করতে পারে, এমন ধারণা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

ফাদার বেরেনডো হাসতে হাসতে বলেছিলেন- প্রত্যেকের কাছে চার্চের একটা আলাদা আবেদন আছে। এই চার্চই আমাদের আশা ও স্বপ্ন দিতে পারে।

আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে ফাদার। আমি আর নতুন করে স্বপ্ন দেখতে চাইছি না।

ফাদার থেরেসার হাতে তার শীর্ণ হাত রেখেছিলেন। কবজিতে তখনও কাটা দাগ। একটা পাতলা স্মৃতি।

–ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো। তাঁকে সবকিছু বলল। কিছু লুকিয়ো না।

থেরেসা বসেছিলেন। তারপর? শুরু হল তাঁর আত্মকথন।

পরের দিন সকাল হয়েছে। থেরেসা একা একা চার্চে এলেন। মনটা একেবারে পাল্টে গেছে তার। তিনি বুঝতে পারছেন, দুর্বলতা তার সঙ্গে প্রতিহিংসার খেলা খেলেছে। এর জন্য ঈশ্বরকে দায়বদ্ধ করে কী লাভ?

থেরেসা বলেছিলেন- আমাকে ক্ষমা করো। আমি পাপ করেছি, আমাকে ক্ষমা করো।

ফাদার বেরেনডো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন প্রিয় কন্যা আমার, ভগবান কি তোমাকে শান্তি দিতে পেরেছেন?

-হ্যাঁ, আমি এখন শান্ত হয়ে গেছি।

ভেবে দেখো, এই বিশ্বাসটাই একমাত্র সত্য। এটাই চিরন্তন, বাকি সব কিছুই মাহুর্তিক।

তারা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা থেরেসা হোটেলে ফিরে এলেন।

বাবা বললেন আমি ইজেতে ফিরে যাব, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

–আমি এখানেই কিছুদিন থাকব।

–তুমি ঠিক থাকবে তো?

–হুঁ, বাবা। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমায় নিয়ে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। এরপর থেরেসা এবং ফাদার বেরেনডোর মধ্যে রোজ দেখা হতে থাকে। ফাদার বেরেনডোর হৃদয় তখন গলতে শুরু করেছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই কুৎসিত দর্শনা মেয়েটির মনে কী আনন্দিত সুখ উজ্জ্বল আত্মা রয়ে গেছে। তারা ঈশ্বরের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। জীবনের আসল অর্থ অন্বেষণ করার চেষ্টা করতেন। থেরেসা বুঝতে পারলেন, চার্চের চার দেওয়ালের মধ্যেই তার আসল শান্তি লুকিয়ে আছে।

এই প্রথম তার মনে হল, তিনি বোধহয় অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

শেষ অব্দি ফাদার বেরেনডো বলেছিলেন- থেরেসা, তুমি যদি মনে করো, তা হলে মেয়েদের কনভেন্টে থাকতে পারো, দেখবে, সেখানে গেলে তোমার ভালোই লাগবে।

আহা, এমন আমন্ত্রণ তো কেউ আমায় কখনও করেনি।

থেরেসা ভেবেছিলেন।

তার মানে একটা নতুন জীবন?

পরের দিন ফাদার বেরেনডো থেরেসাকে নিয়ে কনভেন্টে গেলেন। সেখানে মাদারের সঙ্গে দেখা হল। মাদার সব কিছু শুনলেন। মাদার বুঝতে পারলেন, এই মেয়েটিকে এখন আশ্রয় নিতে হবে।

আভিলার বিশপ সেই মহান মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করছিলেন, তিনি বলছিলেন- হে ঈশ্বর, আমি তোমার ক্ষুদ্র কণা মাত্র। তুমি আমাকে অসীম শান্তির দেশে নিয়ে যাও।

থেরেসা চোখ বন্ধ করে সেই মন্ত্রগুলো বলছিলেন। থেরেসা বলছিলেন– এই পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তি, তুমি আমাকে শান্তি দাও।

আমেন!

তারপর? তারপর কত কী তো ঘটে গেল। এই জীবন, এই একাকীত্ব, এই নিঃসঙ্গতা। :

তিরিশ বছর কেটে গেছে, অরণ্য প্রান্তরে শুয়ে দিগন্ত রেখায় সূর্যের আলোর খেলা দেখতে দেখতে সিস্টার থেরেসা ভাবছিলেন– আমি কেন কনভেন্টে এসেছিলাম? আমি ঈশ্বরের কাছে আসতে চাইনি, পরিদৃশ্যমান পৃথিবী থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, বোধহয় আমার হৃদয়ের বার্তা পড়তে পেরেছিলেন।

এখন থেরেসার বয়স ষাট বছর, গত তিরিশটা বছরকে তিনি জীবনের সবথেকে সুখী সময় হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন। তাকে আবার সেই পৃথিবীর মধ্যে এখন এনে ফেলা হচ্ছে, যে পৃথিবীর ঘটনাবলী থেকে তিনি নিস্তার চেয়েছিলেন।

ভালো লাগছে না, তিনি বুঝতে পারছেন না, কোনটা বাস্তব, আর কোনটা আমাদের কল্পনা। অতীত এবং বর্তমান সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমন ঘটনা কেন আমার জীবনে ঘটল। ঈশ্বর কি আমার জন্য অন্য কোনো পরিকল্পনা তৈরি করেছেন? সেটা কী?

.

১৩.

সিস্টার মেগানের কাছে এই অভিযান ছিল যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি নতুন নতুন দেশ দেখতে ভালোবাসতেন।

তার সহযাত্রীরাও অসাধারণ। অ্যামপারো জিরনকে এক শক্তিশালী মহিলা বলা যেতে পারে। উনি অনায়াসেই বাকি দুজনের সঙ্গে তাল রেখে চলছিলেন। আবার তার মধ্যে নারীত্বের সবকটি গুণই আছে।

ফেলিক্স কারপিওকে এক খাসখেসে গলার ভদ্রলোক বলা যায়। মাথায় কাটা চিহ্ন আছে। লালচে দাড়ি আছে। মানুষটি খুব একটা খারাপ নয়।

মেগানের কাছে সবথেকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অবশ্যই জাইমে মিরো। মিনোর শারীরিক শক্তি কতখানি, তার পরিচয় মেগান পেয়েছেন।

তাদের কাঁধে স্লিপিং ব্যাগ আর ঝুলছে রাইফেল। মেগান বলেছিলেন– অনুগ্রহ করে একটা বোঝা আমাকে দেবেন কি?

জাইমে মিরো একটা স্লিপিং ব্যাগ তুলে দিয়েছিলেন।

মেগানের মনে হল এটা বোধহয় তার নিজের ওজনের থেকেও বেশি। তবু তিনি অভিযোগ করেননি।

পথ শেষ হচ্ছে না, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে। মাঝে মধ্যেই গাছের শাখা-প্রশাখার আঘাত পেতে হচ্ছে। পোকা কামড়াচ্ছে। চাঁদের আলোর আভায় পথ দেখতে হচ্ছে।

এঁরা কারা? মেগান ভাবছিলেন। এঁরা কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অথবা এঁদের ওপর পুলিশ কেন চোখ রেখেছে? মেগান কিছুই জানতেন না। কিন্তু এই নতুন বন্ধুর জন্য তার হৃদয় কেমন করে উঠল।

কথাবার্তা খুবই কম, মাঝে মধ্যে তারা সাংকেতিক ভাষায় কী যেন বলছেন।

লারগো করটেজের নাম বলা হত, রুবিও এবং টমাস মেগানের কাছে শব্দগুলো অপরিচিত। কী হবে? তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। মাঝে মধ্যে ষাঁড়ের লড়াই শব্দদুটি কানে ভেসে আসছে।

সকাল হয়েছে। নীচের উপত্যকা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

জাইমে ফিসফিসিয়ে বললেন- এখানে অপেক্ষা করুন। শান্ত থাকবেন।

জাইমে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মেগান বললেন- কী হচ্ছে?

অ্যামপারো জিরন বলেছিলেন– চুপ করুন।

পনেরো মিনিট কেটে গেল। জাইমে মিরো ফিরে এলেন।

–আমরা সঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি।

তারা একটু পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। মেগানের কৌতূহল আকাশছোঁয়া।

জাইমে বললেন– চারপাশে সৈন্যরা আছে, ওরা কিন্তু সশস্ত্র। আরও সাবধান হতে হবে।

আর থাকতে না পেরে মেগান বলেছিলেন– সৈন্যরা আমাদের খুঁজছে কেন?

জাইমে মিরো জবাব দিলেন– এখন কোনো কথা বলবেন না।

তারপর? এই মানুষগুলো সম্পর্কে আরও বেশি জানতে হবে।

আধঘণ্টা কেটে গেছে।

জাইমে বললেন, সূর্য উঠেছে, এখানে রাত অব্দি অপেক্ষা করতে হবে। মেগানের দিকে তাকিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন, আমাদের চলার গতি বাড়াতে হবে। না হলে আমরা কেউ বাঁচব না।

স্লিপিং ব্যাগ খোলা হল। ফেলিক্স কারপিও মেগানকে বললেন-সিস্টার, আপনি আমারটা নিতে পারেন। আমি মাটিতে শোবো। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

মেগান বললেন– এটা আপনার আমি কেন নেব?

অ্যামপারো বললেন–ঠিক আছে, কেন এমন ভাবছেন? মাটিতে শুলে আপনাকে মাকড়সা কামড় দেবে।

মেগান স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

জাইমে শ্লিপিং ব্যাগটি খুলেছেন। তিনি ব্যাগের মধ্যে হামা দিয়ে ঢুকে গেলেন। অ্যামপারো তার পাশে চলে গেছেন। মেগান বুঝতে পারলেন, এখনই সেখানে কোন ঘটনা ঘটবে। জাইমে মেগানের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন সিস্টার। অনেকটা পথ সামনে পড়ে আছে।

আর্তনাদের শব্দ, কী হচ্ছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কারোর যন্ত্রণা হচ্ছে কি? মেগান উঠে বসলেন। শব্দটা আসছে জাইমের স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে থেকে। জাইমে কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? এটাই তার প্রথম চিন্তা।

আর্তনাদ আরও আরও দীর্ঘ হয়েছে। মেগান অ্যামপারোর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন– আরও তাড়াতাড়ি, এখনই, এখনই।

মেগানের মুখে লজ্জার আভা। সেটা কি সম্ভব? জাইমে মিরো এভাবে ভালোবাসা নিবেদন করছেন?

মেগান বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। তারপর বললেন– ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভাবতে পারছি না যে, এসব দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে হবে।

শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেগান ভাবলেন, তিনি বোধহয় এই শব্দগুলো আর সহ্য করতে পারবেন না। তখনই শব্দ থেমে গেল। এবার অন্য কিছু আওয়াজ ভেসে এল। অরণ্য প্রান্তরে কত রকম আওয়াজ। পাখিদের কতরকম আওয়াজ। পাখিদের কিচির-মিচির শব্দ, ঝিঁঝি পোকার গান। ছোটো ছোটো জন্তুদের মুখের শব্দ। বড়দের গগনভেদী চিৎকার। মেগান তখন সব শব্দ ভুলতে চাইছেন। তিনি কনভেন্টের সেই নীরবতার জগতে প্রবেশ করতে চাইছেন। কিন্তু, কত কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। অরফানেজের দৃশাবলী, ভয়ার্ত কিছু স্মৃতি।

.

১৪. আভিলা, ১৯৫৭

ওরা বলত মেগান ভয়ংকর। ওরা বলত মেগান এক নীল চোখের শয়তানি। তখন মেগানের বয়স মাত্র দশ বছর।

ছোট্টবেলায় মেগানকে এই অনাথ আশ্রমে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাকে রাস্তার ধারে ফেলে গিয়েছিল কৃষক বাবা এবং মা। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর মেগানের অজানা।

অনাথ আশ্রমটি দোতলা। হোয়াইট ওয়াশ করা দেওয়াল। আভিলার উপকণ্ঠে। যেখানে নিম্ন মধ্যবিত্তদের বসবাস। প্লাজা দে সানটে ডিসেনটে, মার্সিডিজ, অ্যাঞ্জেলে এরা পরিচালনা করে থাকে।

মেগানের সাথে অন্য বাসিন্দাদের কোনো তুলনা হয় না।

মেগানের চুলের রং সোনালি। দুটি চোখে নীল উজ্জ্বল আভা। আর যারা এখানে আসে, তাদের চোখ কালো, তাদের চুলের রং কালো। প্রথম থেকেই তাই মেগানের ওপর আলাদা নজর দেওয়া হয়েছিল। সে বুঝি এক স্বাধীনসত্তা, এক নেত্রী, সবসময় দুষ্টুমি করে বেড়ায়। যখনই অনাথ আশ্রমের কোনো সমস্যা দেখা দেয়, মার্সিডিজ অ্যাঞ্জেলেস জানেন, মেগান এর অন্তরালে আছে।

বছর ঘুরে গেল। মেগান নানা বিষয়ে গোলমাল শুরু করল। সে বাচ্চাদের নিয়ে একটা দল গড়ে তুলল। এই দলে সে-ই নেত্রী। সকলের মধ্যে সে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই দলে অনেকের থেকে সে ছোটো, কিন্তু সকলেই তার মত নিয়ে চলতে ভালবাসে। ছোটোবেলা থেকেই সে নানা ধরনের গল্প বলত। তার মনে বন্য কল্পনার উদ্রেক।

-তোমার মা-বাবা কে মেগান?

–তোমার বাবা এক গয়না চোর। সে মধ্যরাতে হোটেলের ছাদে উঠেছিল। বিখ্যাত অভিনেত্রীর হিরো চুরি করতে। যখন সে হিরের টুকরোটা পকেটে পুরতে যাবে, অভিনেত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। সে লাইট জ্বেলে দেয়। তাকে দেখতে পায়।

–আমার বাবাকে কি ধরা হয়েছে?

–না, সে ছিল খুবই সুন্দর।

–তারপর কী হল?

–তারা পরস্পরকে ভালোবাসল। বিয়ে করল। তোমার জন্ম হল।

–কিন্তু কেন তারা আমাকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়েছিল? তারা কি আমাকে ভালোবাসত না?

এটাই হল গল্পের সবথেকে শক্ত জায়গা না, তারা তোমাকে ভালোবাসত। তারা সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিল। স্কি খেলায় যোগ দেবে বলে। সেখানে তুষার ঝড় ওঠে। তারা মারা যায়।

তারপর? তারপর তোমাকে এখানে আনা হয়।

এসব মেগানের বানানো গল্পকথা। মাঝে মধ্যে সে এইভাবে গল্প বানাত, আবার কখনও ভাবত, আমার বাবা ছিল গৃহযুদ্ধের এক সৈন্য। সে ছিল ক্যাপ্টেন। তার সাহস ছিল আকাশ ছোঁয়া। যুদ্ধে সে আহত হয়। আমার মা ছিল একজন সেবিকা। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। বিয়ে করে। বাবা আবার রণক্ষেত্রে ফিরে যায়। সেখানেই মারা যায়। আমার মার হাতে পয়সা ছিল না, তাই সে আমাকে অনাথ আশ্রমে রেখে গেছে।

অথবা ভাবত, আমার বাবা ছিল বুলফাইটার। অন্যতম মাতাদোর। স্পেনের সর্বত্র তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আর মা ছিল এক অসাধারণ ক্লামেনকো নর্তকী। তারা বিয়ে করে। একদিন বিরাট একটা ষাঁড় আমার বাবাকে মেরে ফেলে। আমার মা বাধ্য হয়ে আমাকে এখানে রেখে দেয়।

অথবা সে ভাবত, আমার বাবা অন্য দেশের এক চালক গোয়েন্দা, অথবা গুপ্তচর।

গল্প এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে কষ্টকল্পনা, এদের কোনো সীমা পরিসীমা আছে কি?

ওই অনাথ আশ্রমে তিরিশটি বাচ্চা থাকত। রাস্তার ধারে ফেলে যাওয়া থেকে চোদ্দো বছরের কিশোর পর্যন্ত। বেশির ভাগই স্পেন দেশের। অবশ্য অন্যান্য দেশ থেকেও অনেকে এসেছিল। মেগান বেশ কয়েকটা ভাষা শিখে ফেলল। ডরমেটরিতে শুয়ে থাকত। দশ-বারোটি অন্য বালিকাদের সঙ্গে। অনেক রাত অব্দি তারা গল্প করত। পুতুল আর জামাকাপড় নিয়ে। যারা বড়ো হয়েছিল, তাদের গল্পের মধ্যে অনিবার্য ভাবে যৌনতা ঢুকে পড়ত। এটাই বোধহয় হয়ে দাঁড়ায় তাদের আলাপ চারিতার প্রাথমিক বিষয়বস্তু।

একজন বলেছিল– ভীষণ লাগবে।

আর একজন বলেছিল– তাতে কী হয়েছে, আমি আর থাকতে পারছি না।

তৃতীয়জন বলেছিল–কবে আমার বিয়ে হবে। বিয়ের পরেও আমি স্বামীকে এটা করতে দেব না।

ব্যাপারটা নোংরা।

একটি রাত, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, অনাথ আশ্রমের একটা বাচ্চা ছেলে প্রাইমো কোল্ডে, মেয়েদের ডরমেটরিতে ঢুকে পড়ে সে চট করে মেগানের পাশে শুয়ে পড়ে।

-মেগান, তার গলা কাঁপছে।

মেগান উঠে পড়েছে প্রাইমো, কী হয়েছে?

ছেলেটি নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর বলছে– আমি কি তোর সাথে শুতে পারি? তোর বিছানায়?

-হ্যাঁ, কিন্তু কথা বলবি না।

প্রাইমো তখন তেরো, মেগানও তাই। প্রাইমোকে তার বয়স থেকে ছোটো দেখায়। সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। রাতের বেলা জেগে ওঠে। অন্য বাচ্চারা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করে। মেগান মাঝে মধ্যেই তার সপক্ষে দাঁড়ায়।

প্রাইমো মেগানের পাশে শুয়ে পড়ল। মেগান বুঝতে পারল, জল গড়িয়ে আসছে প্রাইমোর চিবুক থেকে। মেগান প্রাইমোকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

মেগান বলল- তুই ঠিক আছিস তো?

–মেগান প্রাইমোর শরীরটা ধরে নাড়াতে থাকে। দুটো শরীর মিলেমিশে গেছে। হঠাৎ একটা উত্তেজনা।

-প্রাইমো।

–আমার খারাপ লাগছে, তুই আমায় ডাকবি তো?

প্রাইমোর সেটা উঠে দাঁড়িয়েছে, মেগান অনুভব করল।

-মেগান তোকে আমি ভালোবাসি। এই পৃথিবীতে একমাত্র তুই আমার পাশে এসে দাঁড়াস।

–এই পৃথিবীটার কতটুকু তুই দেখলি?

–আমিও তোকে ভালোবাসি।

–আমি তোকে ভালোবাসব, তুই বাধা দিবি না তো?

তারপর নীরবতা।

-তোকে বিরক্ত করলাম। আমি আমার বিছানায় চলে যাচ্ছি।

প্রাইমোর কণ্ঠস্বরে বেদনা। সে উঠে বসার চেষ্টা করেছিল।

মেগান তাকে শক্ত করে চেপে ধরল। বলল না, আয়, তোর যন্ত্রণার শান্তি দেব। তুই এখানে সারারাত থাকবি?

প্রাইমোর গলা ভেঙে গেছে। কোনোরকমে সে বলল- হ্যাঁ।

প্রাইমো পাজামা পরেছিল। মেগান পাজামার দড়িটা আলগা করল। সেটা খুলে দিল। আহা, এই তো এক পুরুষের চেহারা। মেগান ভাবল, তারপর সে পুংদণ্ডটা হাতে করে ধরল। সে সেটাকে নাড়াতে শুরু করল। প্রাইমো গোঙাতে শুরু করেছে– আঃ, কী ভালো লাগছে রে। একটু বাদে বলল, তোকে আমি সত্যি ভালোবাসি মেগান।

মেগানের শরীরে আগুন জ্বলে উঠেছে। সে বলল আমি তোকে আরও ভালোবাসব।

বেশ কিছুক্ষণ তারা সেইভাবে শুয়েছিল। তারপর প্রাইমো উঠে গেল।

বাকি রাত মেগান ঘুমোত পারেনি। এরপর সে কিন্তু প্রাইমোকে আর কখনও তার সাথে শুতে দেয়নি।

এভাবেই মেগান তার নিষিদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখল।

.

মাঝে মধ্যে ছেলেদের সুপারভাইজারের অফিসে ডাকা হয়। অনেকে তাদের দত্তক নিতে চায়। তখন সে এক দারুণ উত্তেজনা। এই চার দেওয়াল থেকে মুক্তি। আনন্দ, শুধুই আনন্দ।

মেগান অবাক চোখে তাকিয়ে দেখেছে অনেকেই এই অনাথ আশ্রম থেকে চলে গেল। কেউ গেল কোনো ব্যবসায়ীর বাড়িতে। কৃষক পরিবারে, ব্যাঙ্কারের ঘরে, কিন্তু আমার

জন্য কেউ আসে না কেন? অনেকে বলে, সে নাকি সুন্দরী, তবে তার অতীত সম্বন্ধে কিছু জানা নেই।

কেউ বলে, মেয়েটা দুষ্ট, গত মাসে সে নানান দুষ্টুমির কাজ করেছে।

আবার কেউ বলে, এ মেয়েটা দস্যি, এর মাথায় শয়তানি বুদ্ধি আছে।

কেউ মেগান সম্বন্ধে ভালো কথা বলে না।

প্রতি সপ্তাহে একবার ফাদার বেরেনডো এই অনাথ আশ্রমে আসেন। তিনি অনেক কথা বলেন। তিনি মার্সিডেজ অ্যাঞ্জেলসের হাতে অনেক বই দিয়ে যান। মেগানের সাথেও তার দু-একবার কথা হয়েছে। মেগান জানতে চেয়েছে ফাদার, আমি কবে বাইরে যাব?

ওই বৃদ্ধ পাদরি জবাব দিয়েছেন মেগান, যখন সময় হবে তখন তুমি মুক্তি পাবে।

–আপনি কি জানেন, আমার আসল বাবা-মা কেন আমাকে পথের ধারে ফেলে দিয়েছিল?

–আমার মনে হয়, তারা খুবই দরিদ্র ছিলেন। তাই বোধহয় তোমাকে পালন করার মতো সামর্থ ছিল না।

মেগান আরও একটু বড়ো হয়ে উঠেছে। আরও বেশি শান্ত হয়ে গেছে। ক্যাথোলিক চার্চের নিয়মনীতি সম্পর্কে উৎসাহী। সেন্ট অগাস্টাইনের কনফেসান পড়ে ফেলেছে। সেন্ট ফ্রান্সিসের লেখাও পড়েছে সে। মন দিয়ে। এতখানি পাল্টে গেল কেন সে?

একদিন সে ফাদার বেরেনডোকে বলল– আমি ক্যাথোলিক হতে চাইছি। ফাদার বলেছিলেন– তুমি তো ক্যাথোলিক, মেগান, তুমি কেন চিন্তা করছ?

ফাদার, আমি কি যিশুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করব?

–কেন নয়?

ফাদার তাকালেন মেগানের মুখের দিকে। আহা, এই মেয়েটি শান্তি পাক। অনন্ত শক্তির অধিকারিনী হয়ে উঠুক। এটাই ছিল তার একান্ত বক্তব্য।

মেগান এখন পনেরো বছরের এক কিশোরী। লম্বা চুলের বন্যা তার মাথায়। গায়ের রং দুধ সাদা। তাকে ভারী সুন্দরী দেখাচ্ছে। অন্য সহচরীদের থেকে একেবারে আলাদা।

একদিন তাকে মার্সিডিজ অ্যাঞ্জেলেসের অফিসে ডাকা হল। ফাদার বেরেনডো সেখানে বসেছিলেন।

-হ্যালো, ফাদার?

–হ্যালো, প্রিয় মেগান?

মার্সিডিজ অ্যাঞ্জেলেস বললেন- মেগান, একটা সমস্যা হয়েছে।

শেষতম শয়তানির বিষয়ে মেগান চিন্তা করছিল। মিস্ট্রেস বললেন- পনেরো বছর বয়স হয়ে গেলে আমরা আর এখানে রাখতে পারি না। তুমি অতি দ্রুত সেই বয়সের দিকে এগিয়ে চলেছ।

মেগান অনেক দিন ধরেই এই বিচিত্র নিয়মটা জানত। কিন্তু এই নিয়মটাকে সে মন থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। কারণ এই পৃথিবীতে তার যাবার কোনো জায়গা নেই। সে জানে, কেউ তাকে আশ্রয় দেবে না।

–আমি কি এখান থেকে চলে যাব?

ওই আমাজন ভদ্রমহিলার কোনো উপায় ছিল না। তিনি বললেন–হ্যাঁ, আমাকে তো নিয়ম মানতেই হবে। তুমি কি কোনো বাড়িতে কাজের মেয়ে হিসেবে যাবে? আমরা ব্যবস্থা। করেছি।

মেগান কথা বলতে পারেনি।

ফাদার বেরেনডো বললেন তুমি কোথায় যেতে চাইছ?

মেগান ভাবল, তার মাথায় একটা চিন্তা এসেছে। যখন তার বয়স বারো বছর, সে সিস্টারসিয়ান কনভেন্টের নাম শুনেছিল। সেখানকার মাদার বেটিনা, তাকেও দু-একবার দেখেছে। তখন থেকেই মেগান ভেবেছে, পরবর্তীকালে সে একজন সেবিকা হবে। ঈশ্বরের মহান সেবিকা। মাদার এইসব মেয়েদের ভালোবাসতেন, বিশেষ করে উজ্জ্বল মুখের ওই মেয়েটিকে।

মেগান জানতে চেয়েছিল মেয়েরা কেন কনভেন্টে যোগ দেয়?

নানা কারণে, আমরা তাদের আশা দিই, আমরা তাদের আসল পথ দেখাই।

তখনই মেগানের মনে হল, আমি যদি কনভেন্টে যাই, তাহলে কেমন হয়?

সে বলেছিল- আমি কনভেন্টে যোগ দেব।

ছ সপ্তাহ কেটে গেছে। মেগান সত্যি সত্যি কনভেন্টে এল। আসল জায়গা, এখানে আরও সিস্টার আছে। তারপর? মাথার ওপর আছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

কনভেন্টে তিনি নানা ধরনের কাজ করতেন, তাকে বুক কিপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সে সাংকেতিক ভাষাটা হারিয়ে গেছে। এখানে এসে তারই চর্চা করল। ৪৭২টি সংকেত আছে; এরই মাধ্যমে সকলে কথা বলে।

অদ্ভুত জীবন, নভেম্বরের সকাল। মৃত্যু সংকেতের সাথে তার পরিচয় ঘটে গেল। এক ধর্মসেবিকা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। এখন শেষ সংকেত দেখাতে হবে। এই সংকেতটা ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে একই রকম রয়ে গেছে। চারদিকে স্তব্ধ পরিবেশ। মাদার রেস এগিয়ে এসেছেন। বাঁ হাতে কিছু ইঙ্গিত করলেন। তিনি ওই ভদ্রমহিলার মাথায় ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিলেন।

তারপর? চিবুকের ওপর চিহ্ন আঁকা হল।

শেষ প্রার্থনা শোনা যাচ্ছে, এখন এই দেহটিকে একলা রাখা হবে, যাতে আত্মা শান্তি পেতে পারে। পায়ের নীচে একটা মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হল। নিরন্তর আলোকের উৎস।

মেগান বুঝতে পারলেন, এই পৃথিবীতে অনেক কিছু জানবার আছে। পরদিন বিকেলবেলা, প্রার্থনা সভার আসর বসেছে। মেগান একা একা সমাধিক্ষেত্রে চলে গিয়েছিলেন। এখানেই আমাদের শেষ গন্তব্য। মেগান ভেবেছিলেন।

তারপর? মাঝে মধ্যেই মেগান কেমন একলা হয়ে যান। এই কনভেন্ট তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। কিন্তু শান্তি দিয়েছে কি? তার কেবলই মনে হয়, কী একটা যেন হারিয়ে গেছে। কী, তিনি জানেন না। তাঁর কেবলই মনে হয়, বাইরের জগতে এত আনন্দ, এত উল্লাস, এত হাসি।

মেগান একদিন মাদার বেটিনার কাছে গিয়েছিলেন। মাদার বেটিনা বলেছিলেন, মেগান, মাঝে মধ্যে আমাদের সকলের মনে এমন নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। শয়তান এর অন্তরালে আছে। তুমি এর জন্য ভয় পেও না। দেখবে তোমার মনের এই অবস্থা কখন হারিয়ে গেছে। তুমি আবার শান্ত হবে। চিরশান্তির জগতে ফিরে আসবে।

কিন্তু, মেগান আর কখনও শান্তির জগতে পা রাখতে পারেননি। তিনি ভেবেছেন, আমার জীবন থেকে শান্তি চিরকালের জন্য চুরি হয়ে গেছে।

.

১৫. নিউইয়র্ক সিটি, ১৯৭৬

চারপাশে সাংবাদিকদের ভিড়। নিউইয়র্ক শহরের ওয়ালড্রফ অ্যাসটোরিয়া হোটেল। এবার শুরু হবে সুন্দরীদের পদযাত্রা। একটির পর একটি লিমুজিন এসে থামবে। গ্রান্ড বলরুমে আলো জ্বলে উঠবে। পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে সম্মানীয় অতিথিরা ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছেন।

ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আলো জ্বলে উঠেছে। রিপোর্টাররা কিছু বলার চেষ্টা করছেন। ভাইস প্রেসিডেন্টের খোঁজ চলছে।

গভর্ণর অ্যাডামস এসে পড়েছেন। সেনেটরদের দেখা যাচ্ছে। বিদেশী প্রতিনিধিরাও এসে গেছেন। ব্যবসা জগতের মহান নায়কেরাও এবং কিংবদন্তির খ্যাতিমানেরা। তারা কোথায় চলেছেন? তারা এসেছেন এলেন স্কটের জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দেবেন বলে। স্কট সাম্রাজ্যের মহারানি, পৃথিবীর অন্যতম বড়ো ধনী সম্প্রদায়। নানা দেশের অয়েল কোম্পানিতে এই পরিবারের মালিকানা আছে। অনেকগুলো ইস্পাত কারখানা আছে। আছে একাধিক ব্যাঙ্কের বিচিত্র ব্যবসা বিন্যাস। আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে যত টাকা পাওয়া যাবে, সব দান করে দেওয়া হবে।

পৃথিবীর সবত্র স্কট ইন্ডাসট্রির পদধ্বনি আঁকা হয়েছে। পঁচিশ বছর আগে এর প্রেসিডেন্ট মিলোস স্কট হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী এলেন, এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হয়ে বসেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোম্পানির অ্যাসেট লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে।

www.bengaliebook.com

ওয়ালড্রফ অ্যাসটোরিয়া একটি বিশ্ববিখ্যাত হোটেল। এর গ্রান্ড বলরুমের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সুন্দর সাজানো হয়েছে এই বিরাট বলরুমটিকে। ব্যালকনিতে আলো জ্বলছে। সমস্ত ঘরে বিরাজ করছে আভিজাত্যের চিহ্ন। অনেকগুলি চেয়ার সাজানো আছে। ঝুলছে উজ্জ্বল ঝাড়বাতি। আর এই সেন্ট্রাল ব্যালকনিতে সম্মানিত অতিথিরা বসবেন। ইতিমধ্যে, প্রায় ছলোজন নারী এবং পুরুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের সামনে ডাইনিং টেবিল। রূপোর তৈরী বাসনপত্র।

নৈশ আহার শেষ হল। নিউইয়র্ক শহরের গভর্ণর স্টেজে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন-মিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলারা, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমরা এখানে একটা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আজ এসেছি। আমরা এসেছি, এমন এক মহিলার যাটতম জন্মদিনকে স্মরণ করতে, যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করতে পারবেন। ইচ্ছে করলে তিনি এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা ডাক্তার হতে পারতেন। হতে পারতেন মহতী রাজনীতিবিদ, কিন্তু আবার আমি বলব, মনে করলে এলেন স্কট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন। আমি প্রথমটাতে ভোট দিতাম। তবে আগামী নির্বাচনে নয়, পরবর্তী কোনো একটি নির্বাচনে।

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে কৌতুক ছিল, সকলে হেসে উঠলেন, হাততালি দিলেন।

-কিন্তু এলেন স্কটকে আমরা আরও ভালো পটভূমিকাতে দেখতে পাচ্ছি। তিনি মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি পৃথিবীর যে কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে চান।

আরও দশ মিনিট ধরে এই ভাষণ চলেছিল। এলেন স্কট এসব কিছুই শুনছিলেন না। ভদ্রলোক কি সত্যি বলছেন? তিনি ভাবছিলেন এঁরা সবাই মিথ্যে কথা বলছেন। স্কট ইন্ডাসট্রিকে কি আমার নিজস্ব কোম্পনি বলা যায়? একসময় মাইলো আর আমি এটা চুরি করেছিলাম। এই চুরির কাজে আমার অবদান ছিল বেশি। তবে তাতে কী বা যায় আসে? আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না।

মনে পড়ে গেল, ডাক্তারের সাবধানবাণী।

মিসেস স্কট, এই ভয়ংকর অসুখ আপনাকে ধীরে ধীরে ভেঙে দিচ্ছে। ক্যানসার আপনার সমস্ত শরীরকে আক্রান্ত করেছে। এই রোগ কোনো দিন সারবে না।

এলেনের মনে হয়েছিল, সত্যি, পৃথিবীতে বোধহয় অন্ধকার বিরাজ করছে।

–আর কতদিন? তিনি জানতে চেয়েছিলেন।

ডাক্তার বলেছিলেন– খুব বেশি হলে একবছর।

খুব বেশি একটা সময় হাতে নেই। তার মানে? অনেক কাজ করতে হবে।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার।

চোখ বন্ধ করলে অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। তবে? কী একটা কাজ যেন বাকি রয়ে গেছে। শেষ করতে হবে, মৃত্যুর আগে।

গভর্ণরের বলা শেষ হয়ে গেছে। এবার মিসেস স্কটকে উজ্জ্বল আলোর সামনে নিয়ে আসা হবে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাততালির ঝড় বয়ে গেল। আহা, এক রোগা ধূসর চুলের মহিলা। এখনও সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন। ভারী সুন্দর পোশাক পরেছেন। অভিব্যক্তির মধ্যে এমন একটি উজ্জ্বলতা আনার চেষ্টা করছেন, এখন যার অধিকারিনী তিনি নন।

আলোকিত মঞ্চে উঠতে উঠতে হঠাৎ এলেন স্কটের মনে হল, আমার দিকে তাকিয়ে থাকা, আর মৃত তারার আলো দর্শন করা, ব্যাপারটা একই।

এত শব্দ কেন? কেন?

উনি কথা বললেন– মিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেনেটর, গভর্ণর অ্যাডামস।

একবছর বাদে, একবছর বাদে এইদিনে আমি এই মঞ্চে আসতে পারব কি?

বানানো বানানো কিছু শব্দ, শ্রোতারা যা শুনতে ভালোবাসেন, উনি বললেন আমার প্রতি আপনাদের এই কৃতজ্ঞতা, এই ভালোবাসা, আমি কীভাবে এর প্রতিদান দেব?

মন চলে গেল বিয়াল্লিশ বছর আগের পৃথিবীতে।

এলেন তখন এক অষ্টাদশী সুন্দরী, সপ্রতিভ, বহির্মুখী। চাকরি করছে স্কট ইন্ডাসট্রি নামে একটি সংস্থাতে। ইন্ডিয়ানা প্রদেশের গ্যারিতে। সহকর্মীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়া,

একদিন মাইলো স্কট এসেছিলেন এই প্ল্যান্ট পরিদর্শন করতে। সহকর্মীরা সবাই মিলে এলেনকেই পাঠাল, তার সাথে থাকার জন্য।

মাইলো স্কটের বয়স কতই বা হবে? সবেমাত্র তিনের দশকে প্রবেশ করেছেন। লম্বা এবং রোগা, দেখতে খুব একটা খারাপ নন। এলেন ভেবেছিল, ভদ্রলোক মুখচোরা, সব ব্যাপারে উদাসীন।

মিস ডুড্যাস, আপনাকে খাটাচ্ছি বলে আমার খারাপ লাগছে, কাজের ক্ষতি হল কি?

না-না, আমি কিছু মনে করছি না।

কথা শুরু হল, ভাবতেই পারা যাচ্ছে না। বি স্কটের ভাইয়ের সাথে আমি এত সহজে কথা বলতে পারছি।

মাইলো স্কট সত্যি সত্যি শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে ভাবতে চাইছেন। এলেন তাকে একটির পর একটি ডিপার্টমেন্ট ঘুরিয়ে দেখাল। কোথায় কী ধরনের কাজ হয়, তা বলার চেষ্টা করল।

–ব্যাপারটা বিরাট, এলেন, আমি তো ভাবতেই পারিনি।

ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছে, উনি বুঝি এক ছোট্ট শিশু, ওনাকে আরও অভিজ্ঞ করে তুলতে হবে।

অ্যাসেমব্লি সেকশনে ওই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। মাথার ওপর একটা কেবল তার আছে, সেখানে ধাতুর বার রয়েছে। লোহার ভারী ওজন। সেটা নীচের দিকে নেমে রয়েছে। মাইলো স্কট ঠিক তার তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এলেন সেটা দেখতে পেল। সেকেন্ডের ক্ষণ ভগ্নাংশের মধ্যে সে মাইলো স্কটকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। একটু বাদেই দুটো বড়ো বড়ো ধাতুর বার আছড়ে পড়ল, এলেনের মাথার ওপর। এলেন অজ্ঞান হয়ে গেল।

হাসপাতালে ঘুম ভাঙল তার। ফুলে ফুলে ভরে গেছে এই ঘরটি। যখন এলেন চোখ খুলল, সে ভাবল, আমি বোধহয় মরে গেছি, স্বর্গে পৌঁছে গেছি।

অর্কিডের পাশাপাশি প্রস্ফুটিত গোলাপ। লিলি এবং ক্রিসেনথেমাম, আরও অনেক কিছু, এলেন চিনতে পারল না।

একজন নার্স এলেন- আপনি উঠেছেন মিস ডুড্যাস, আমি এখুনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।

–আমি কোথায়?

ব্ল্যাক সেন্টারে, এটা একটা প্রাইভেট হাসপাতাল।

এলেন বিশাল সুইটের চারদিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল, এই খরচ সে জোগাবে কেমন করে?

–আপনি এবার তৈরি হোন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

-কীজন্য?

–প্রেসের লোকেরা অনেকক্ষণ ধরেই আপনার ইন্টারভিউ নেবার চেষ্টা করছেন। আপনার বন্ধুরা বার বার জানতে চাইছেন, আপনি কেমন আছেন? মিঃ স্কট কয়েকবার টেলিফোন করেছেন।

মাইলো স্কট? তিনি ভালো আছেন তো?

–হ্যাঁ, তার কিছু হয়নি। তিনি আজ সকালে এখানে এসেছিলেন। তখন আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন।

–তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

-হ্যাঁ। নার্স চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, বেশির ভাগ ফুলের তোড়া উনিই তো পাঠিয়েছেন।

–অবিশ্বাস্য!

–আপনার মা-বাবা ওয়েটিং রুমে বসে আছেন। আপনি কি তাদের সাথে দেখা করবেন?

-হ্যাঁ, এখুনি করব।

–ঠিক আছে, আমি ওঁদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জীবনে এই হাসপাতালে আসতে পারবে, এলেন তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

মা-বাবা ঘরে এলেন। এলেনের মা-বাবার জন্ম হয়েছে পোল্যান্ডে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারেন। বাপ একজন মেকানিক, মধ্য পঞ্চাশ, রুক্ষ মেজাজ, শুকনো চেহারা। মায়ের চেহারায় গ্রাম্য ছাপ আছে। উত্তর ইওরোপীয় টান আছে কথার মধ্যে।

এলেন, তোর জন্য কিছুটা স্যুপ এনেছি।

মম, হাসপাতালে ভালোই খাবার-দাবার দেয়।

–আমার স্যুপ তো পাবি না, তুই খেয়ে নে, তা হলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবি।

বাবা বলেছিল– সকালের কাগজ দেখছিস? আমি তোর জন্য একটা কপি এনেছি। এলেন কাগজটা পড়ে অবাক হয়ে গেল।

বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে- ফ্যাক্টরির কর্মীর অসাধারণ কৃতিত্ব। নিজের জীবন বিপন্ন করে বসকে রক্ষা করার চেষ্টা।

প্রতিবেদনটা এলেন দুবার পড়ল।

–তুই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিস। এমন সাহস এল কোথা থেকে?

এলেন অবাক হয়ে গেল। সাহস না ছাই। মুহূর্তের মধ্যে সে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল। সে হয়তো নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু? সব কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

একটু বাদে মাইলো স্কট নিজে এলেন। তার হাতে ফুলের তোড়া।

তিনি বললেন- এগুলো আপনার জন্য। ডাক্তার বলেছেন আপনার আর কোনো ভয় নেই। আপনার কাছে আমি কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব...

-না-না, এত কথা বলছেন কেন?

–আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।

এলেন উঠে বসার চেষ্টা করছিল। চিনচিনে বেদনা তার হাতে।

–আপনি ঠিক আছেন তো?

হ্যাঁ, এলেন কথা বলার চেষ্টা করল, ডাক্তার কখন আসবেন? ওঁরা কী বলেছেন?

–আপনার হাতের হাড় ভেঙে গেছে, তিন টুকরো হয়ে।

এর থেকে খারাপ খবর আর কিছু দেওয়া যায় কি?

এলেনের চোখ জলে ভরে উঠেছে।

কীভাবে সবকিছু বলা যাবে? এলেন কেন কাঁদছে? সে তার বান্ধবীদের সাথে নিউইয়র্কে যাবার প্ল্যান করেছিল। দীর্ঘ ছুটি। ফ্যাক্টরির অনেকে যোগ দেবে। ম্যানহাটনে তারা যাবে। আমি এই ভ্রমণটাতে থাকতে পারব না।

পনেরো বছর বয়স থেকে এলেনকে কারখানায় কাজ করতে হয়েছে। সে স্বাধীনচেতা। নিজের পায়ে দাঁড়াতে ভালোবাসে। এখন সে ভাবল, উনি কি হাসপাতালের বিলটা দিয়ে দেবেন? এই ব্যাপারে আমার প্রশ্ন করা উচিত কি?

এলেন ঘুমাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে বলতে থাকে ফুলের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ স্কট। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ভীষণ ভালো লাগছে।

এলেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন সকালবেলা। এক অভিজাত চেহারার মানুষ এসে এলেনের সুইটে প্রবেশ করলেন।

–শুভ সকাল, আপনি এখন কেমন আছেন?

–এখন ভালো আছি।

–আমি স্যাম নরটন। স্কট ইন্ডাসট্রির চিফ পাবলিকেশন অফিসার।

তাই নাকি? আপনি কি এখানে থাকেন?

না, আমি ওয়াশিংটন থেকে উড়ে এসেছি।

–আমাকে দেখতে?

–না, আপনাকে সাহায্য করতে।

কী ব্যাপারে?

বাইরে প্রেসের লোকেরা অপেক্ষা করছেন। মিস আমার মনে হয় আপনি বোধহয় এর আগে কখনও প্রেস কনফারেন্সের মুখোমুখি হন নি। তাই আমি এসেছি।

–ওরা কী চাইছেন?

–ওরা জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কীভাবে মিঃ স্কটের জীবন বাঁচিয়েছেন?

–ওটা তো খুবই সহজ। আমি সব কথা বলে দেব।

নরটন বললেন মিস ডুড্যাস, আমার মনে হয়, আপনাকে সাহায্য করা উচিত।

-কেন? এটা তো সত্যি।

এই মেয়েটি বোধহয় তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানে না।

কিছু একটা এলেনের মনে ভিড় করল। সে চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করল- আপনি কি মিঃ স্কটের সঙ্গে দেখা করবেন?

-হ্যাঁ।

–একটা কাজ করবেন?

–হ্যাঁ, বলুন।

–আমি জানি, এই অ্যাকসিডেন্টের অন্তরালে ওনার কোনো দোষ নেই। কিন্তু?

নরটন ভাবলেন, সত্যি কথাটা বলা কি ঠিক হবে? তিনি বললেন– বলতে থাকুন মিস ডুড্যাস।

এলেন বলতে থাকে আমার হাতে খুব একটা বেশি পয়সা নেই। হাসপাতালে শুয়ে আছি বলে বেশ কয়েক দিনের বেতন পাব না। আমি কি হাসপাতালের বিল মেটাতে পারব। যদি মিঃ স্কট কিছু ধার দেন, আমি ফেরত দেব।

নরটনের মুখে একটা অদ্ভুত সরলতা।

নরটন বুঝতে পারলেন, পৃথিবীর সকলে লোভী নয়। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ঝুঁকে এলেনের মুখে চুম্বন দিলেন। মহিলা সম্পর্কে ধারণা একেবারে পালটে গেল।

তিনি অনেকক্ষণ এলেনের পাশে বসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– এলেন, মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে। যখনই কোনো সমস্যা হবে, টাকার ব্যাপারে, আমার সাহায্য নিতে ভুলবেন না যেন। এবার আসুন আমরা প্রেস কনফারেন্সের জন্য তৈরি হই।

-কী বলতে হবে, তা আমাকে বুঝিয়ে দেবেন? আমি কেন মাইলো স্কটের জীবন বাঁচিয়েছি, তাই তো? আমি যদি এইভাবে বলি– আমি স্কট ইন্ডাসট্রির একজন কর্মচারী, আমি যখন দেখলাম মাইলো স্কটের মাথার ওপর বিপদ ঝুলছে, আমি ওনাকে বাঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। এর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতে হয়েছে আমাকে।

–হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। একটু হাসি- ওকে।

–তাহলেই যথেষ্ট হবে তো? মিঃ নরটন, আমি জানি না, কেন এভাবে আমাকে শেখাতে হচ্ছে।

উনি হাসলেন– এটা হল আমাদের গোপন ব্যাপার।

অন্তত চব্বিশজন সাংবাদিক এসে গেছেন, আলোকচিত্রিদের ভিড় লেগেছে– আকাশবানী, খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে। অসাধারণ গল্প, প্রেস এই গল্পটা ভালোভাবে ছাপাতে চাইছে। বলা হচ্ছে, সুন্দরী এক তরুণী কর্মচারী তার বসের জীবন রক্ষার জন্য অসম সাহসের কাজ করেছেন।

মিস ডুড্যাস, যখন আপনি দেখলেন, ওই লোহার বারটা নীচে নেমে আসছে, প্রথমে আপনি কী ভেবেছিলেন?

এক সাংবাদিকের এই প্রশ্ন শুনে এলেন ক্ষণকালের জন্য স্যাম নটনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর বলেছিল আমার মনে হয়েছিল, মিঃ স্কটকে বাঁচাতে হবে। যদি উনি দুর্ঘটনায় মারা যান, তাহলে নিজেকে দোষারোপ করতে হবে। সারাজীবন আমি বিবেকের দংশনে আঘাত পাব।

প্রেস কনফারেন্স তরতর করে এগিয়ে চলেছে। যখন স্যাম নরটন দেখলেন এলেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি বললেন, উপস্থিত সাংবাদিকরা, এখানেই কথা বলা শেষ করা উচিত। উনি এখনও সুস্থ নন। ওনাকে এবার ঘুমোতে হবে।

এলেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিল সে। এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর লবিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভেতরে ঢোকার অনুমতি পায়নি। কারণ টিকিট কেনার পয়সা তার হ্যান্ডব্যাগে নেই।

বিকেলে মাইলো স্কট এলেনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মাইলোকে দেখে এলেন আবার অবাক হয়ে গেছে। এলেন শুনেছিল, মাইলো নিউইয়র্কের বাসিন্দা।

–আমি শুনেছি, আপনি খুব সুন্দরভাবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আপনাকে এক অভিনেত্রীর মতো লাগছে।

–মিঃ স্কট, আমি তো আপনাকে সব কিছুই বলেছি। আমি একজন অভিনেত্রী নই। কিন্তু তখন আমি বিবেকের ডাকে এই কাজটা করেছি।

–আমি জানি, স্যাম নরটন আমাকে সব বলেছেন। এলেন, সাধারণ মানুষের জীবনেও এই বীরত্ব লুকিয়ে থাকে। নিজেকে বাঁচাবার কথা একবারও আপনি ভাবেননি, এটাই আপনার চরিত্রের মহান দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

আমি একটা ব্যাপার আপনাকে বলতে চাই।

–স্যাম বলেছে, হাসপাতালের বিল তো? এ দায়িত্ব আমরা নেব। কয়েক দিনের মাইনে? উনি হাসলেন, মিস ডুড্যাস, আপনি কি জানেন, আপনার কাছে আমি কতখানি কৃতজ্ঞ।

–এত কিন্তু-কিন্তু করবেন না।

–ডাক্তাররা বলেছে, আগামীকাল আপনি হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবেন। কাল. আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন কি?

এলেন ভাবল, কারো সহযোগিতা এইভাবে ভিক্ষা করা উচিত কি?

আরও একবার স্কট বললেন– ঠিক আছে, কাল তাহলে ডিনারে...

এভাবেই গল্পটা শুরু হয়েছিল। মাইলোস্কট প্যারিসে এক সপ্তাহ থেকে গেলেন। প্রতি রাতে এলেনের সঙ্গে তার দেখা হত। এলেনের মা-বাবা সন্তুষ্ট, তারা বলেছিলেন, সাবধানে থাকিস। তোর প্রতি এতখানি সদয় কেন উনি? ব্যাপারটার মধ্যে রহস্য আছে।

ধীরে ধীরে এলেনের মন পাল্টে গেল। এলেন বুঝতে পারল, মাইলো স্কট এক ভদ্রলোক। আমার সাহচর্য উনি ভালোবাসছেন। মাইলোকে লাজুক এবং আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে উনি তা নন। এলেন খোলামেলা, হো হো করে হাসতে ভালোবাসে। মাইলো সারা জীবনে অনেক মহিলার সংস্পর্শে এসেছেন। অনেকেই স্কট সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হতে চেয়েছে। তারা বিচিত্র খেলা খেলেছে। এই জীবনে তিনি এলেনের মতো এক মহিলার সন্ধান আগে কখনও পাননি। পরিচয় নেই, এমন এক পুরুষের জন্য কেউ জীবন উৎসর্গ করতে পারে? মনে মনে যে মহিলার কল্পনা তিনি করেছিলেন, এলেনের মধ্যে তারই প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছেন। এলেন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী, আকর্ষণীয়া, আর সব সময় এক কৌতুকপ্রিয়তার জগতে বাস করতে ভালোবাসে। সাতদিন কেটে গেল। দুজনেই অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, ইতিমধ্যেই তাদের মনে প্রেমের বিকাশ ঘটেছে।

মাইলোস্কট বললেন আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি। তুমি কি আমার প্রস্তাবে রাজী হবে?

এলেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল। আসলে সে কখনোই বড়োলোকের ফাঁদে পড়বে না। সে জানে, এইসব ব্যবসাদাররা হৃদয়হীন হয়ে থাকেন। স্কট পরিবারের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আমি কেন ইচ্ছে করে ওই বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করব? বোকর ভূমিকাতে অভিনয় করব না। কিন্তু এলেন জানত, সে এমন একটা খেলায় নেমেছে, যেখানে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

কিছুদিন বাদে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। গ্রিনউইচে। এলেন এল মানহাটনে। পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

বাইরন স্কট তার ভাইকে এই বলে সম্বোধন করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তুই একটা পোল দেশীয় উদ্বাস্তু কন্যাকে বিয়ে করলি? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

সুসানও একান্তে স্বামীকে বলেছিলেন- মেয়েটা অর্থের লোভে মাইলোকে বিয়ে করেছে। যখন তার স্বপ্ন ভেঙে যাবে, তখন পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে যাবে। আমি বলছি, এ বিয়েটা বেশি দিন টিকবে না।

হায় ভাগ্য, ওঁরা কেউই এলেন ডুড্যাসকে বুঝতে পারেননি।

এলেন বলেছিল- তোমার ভাই আর ভাইয়ের বউ আমাকে পছন্দ করছেন না। কিন্তু আমি তো ওঁদের বিয়ে করিনি। আমি তোমাকেই বিয়ে করেছি। তোমার আর আমার মধ্যে যেন কেউ না আসে। ব্যাপারটা তোমাকে দেখতে হবে। যদি মনে হয় তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছ না, তা হলে এখনই মুখের ওপর বলে দাও। আমি বিদায় জানিয়ে চলে যাব।

মাইলো বউকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

মাইলো বলেছিলেন– আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার সাহসকে শ্রদ্ধা করি, যখন বাইরন আর সুসান তোমার সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারবে, দেখবে ওরা কতখানি পাল্টে গেছে।

বরকে জড়িয়ে ধরে এলেন ভেবেছিল, ছেলেটা এখনও বোকা। একে আরও বেশি ভালোবাসা দিতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই এলেন নতুন পরিবারে মানিয়ে নিল। এখন বাইরন আর সুসানের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক সহজ সরল হয়ে এসেছে। ওই দুজনের চোখে এলেন এক ছোট্ট পোল দেশীয় কন্যা, যে স্কট ফ্যাকটরিতে চাকরি করে।

এলেন ভালোভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করল। বোঝার চেষ্টা করল। সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল মাইলোর বন্ধুদের স্ত্রীদের দিকে, তারা কীভাবে পোশাক পরেছে, কেমন করে কথা বলছে, সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। কিছুদিন বাদেই সে মাইলো সমাজের অন্যতম হয়ে উঠল। এটা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

.

এলেন মাইলোর চারপাশে নিরাপত্তা বলয় রচনা করেছে। সব কাজে মাইলোকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। স্কট ইন্ডাসট্রির অবস্থানটা বড়োই অদ্ভুত। সমস্ত সম্পত্তির মালিক বাইরন। বাইরনের ছোটোভাই এক মাইনে করা কর্মচারী মাত্র। বাইরন মাঝে মধ্যেই ভাইয়ের প্রতি অপমানজনক উক্তি করেন। মাইলোর কাঁধে ভারী ভারী কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়। কেউ তাকে প্রশংসা করে না।

ব্যাপারটা এলেনের চোখে মোটেই ভালো লাগেনি। এলেন এ নিয়ে মাঝে মধ্যেই প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে।

সময় এগিয়ে চলল। এলেন বুঝতে পারল, মাইলো চরিত্রের দিক থেকে খুবই দুর্বল ধরনের। তিনি কোনো একজনের সাহায্য চাইছেন। এলেন বুঝতে পারল মাইলো কখনওই এই কোম্পানিকে ছাড়তে পারবেন না।

ঠিক আছে, এলেন চিন্তা করল, একদিন এই কোম্পানিটা তো আমার স্বামীর হাতে আসবে, বাইরন চিরদিন বাঁচবেন না। মাইলো হলেন তার একমাত্র উত্তরাধিকারী।

শেষ অব্দি সুসান স্কট একদিন ঘোষণা করলেন, তিনি গর্ভবতী। সংবাদটা এলেনকে আঘাত করেছিল। তার মানে? ওই শিশুটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হবে?

একদিন বাইরন স্কট বলল, মেয়ে হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে শেখাব কীভাবে কোম্পানি চালাতে হয়।

বেজন্মা, এলেন ভেবেছিল।

মাইলো হেসে জবাব দিয়েছিল দেখেছ, কেমন ফুটফুটে একটা পরী এসেছে আমাদের পরিবারে!

৪. লকহীডের পাইলট

১৬.

লকহীডের পাইলট চিন্তিত হয়েছেন।

তিনি তার কো-পাইলটের দিকে তাকিয়ে বললেন- ভালোভাবে প্লেনটা চালাতে হবে কিন্তু।

তিনি ককপিট ছেড়ে কেবিনে চলে গেলেন। পাইলট আর কো-পাইলট ছাড়া এই প্লেনে আরও পাঁচজন ছিলেন। বাইরন স্কট, স্কট ইন্ডাসট্রির সর্বময় কর্তা, তার আকর্ষণীয়া স্ত্রী সুসান, তাদের এক বছরের কন্যা প্যাট্রিসিয়া, বাইরন স্কটের ছোটো ভাই মাইলো স্কট, মাইলো স্কটের স্ত্রী এলেন স্কট। তারা কোম্পানির নিজস্ব বিমানে প্যারিস থেকে মাদ্রিদ অভিমুখে চলেছিলেন। ছোটো মেয়েকে সঙ্গে আনার কথা ভাবা হয়নি। কিন্তু সুসান মেয়েটিকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। তাই শেষ মুহূর্তে তাঁকে তোলা হয়েছে।

সুসান স্বামীকে বলেছিলেন- মেয়েকে ছেড়ে এতদিন আমি থাকতে পারব না।

স্বামী বলেছেন- ঠিক আছে, ওকেও সঙ্গে নেব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। স্কট ইন্ডাসট্রি ইওরোপের নানা জায়গাতে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। বাইরন স্কট মাদ্রিদে যাচ্ছেন, সেখানে নতুন ফ্যাক্টরি খুলতে হবে সেই ব্যাপারটাই তদন্ত করবেন। চারপাশ নিরীক্ষণ করবেন।

পাইলট তার কাছে এলেন- আমায় ক্ষমা করবেন স্যার। আমরা খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আকাশটা পরিষ্কার নয়, আমরা কি ফিরে যাব?

বাইরন স্কট ছোট্ট জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বেশ বুঝতে পারছেন তিনি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ভেতর দিয়ে উড়ানপাখি উড়ে চলেছে। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ভারী বর্ষণ শুরু হয়েছে।

তিনি বললেন- আজ ভোরে মাদ্রিদে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। আমরা কি ঝড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে পারব না?

–আমি চেষ্টা করছি, যদি না পারি, তাহলে ফিরতে হবে কিন্তু।

বাইরন স্কট বলেছিলেন- ঠিক আছে।

–সিটবেল্ট ভালো করে বেঁধে নেবেন কিন্তু।

পাইলট ককপিটে ফিরে গেলেন।

সুসান স্কট এই কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি শিশুটিকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলেন। ভাবলেন, আহা, মেয়েটিকে না আনলেই বোধহয় ভালো হত।

ঝড়টা এসে গেল।

প্লেনটা তখন অসহায়ের মতো দুলছে, বাতাসের আন্দোলনে আন্দোলিত হচ্ছে। ঝড়ের গতি ক্রমশ বাড়ছে। জানালার কাঁচে বৃষ্টির আঘাত। কিছু দেখা যাচ্ছে না। যাত্রীদের মনে হল, তাঁরা বুঝি সমুদ্রের জলে পড়ে গেছেন।

বাইরন স্কট ইন্টারকমের সুইচ জ্বেলে দিলেন ব্লেক, কী হচ্ছে?

–আমরা এখন মাদ্রিদ শহরের উত্তরে এসে গেছি। মাদ্রিদ এখান থেকে একশো কিলোমিটার দূরে। নীচেই আভিলা শহর। বাইরন স্কট জানালা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলেন– আজ মাদ্রিদের কথা ভুলে যান। এখান থেকে এখনই বেরোতে হবে

হয়তো একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। পাইলট চেষ্টা করেছিলেন, প্লেনটিকে ঠিক মতো নামিয়ে আনার। সামনেই পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেলেন। সংঘর্ষটা অনিবার্য ছিল। তারপর? মনে হল আকাশের বুকে আগুন জ্বলে উঠেছে। প্লেনটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল। পাহাড়ের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। দেখা গেল, সর্বত্র দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠেছে।

তারপর? অনেকক্ষণের নীরবতা। মনে হল, এ বুঝি চিরন্তন। শান্তি সুখ সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

.

–এলেন?

এলেন স্কট চোখ খুললেন। তিনি একটা গাছের তলায় শুয়ে আছেন। স্বামীকে দেখতে পেলেন। মুখে হাত দিচ্ছেন, তার মানে? আমরা এখনও বেঁচে আছি।

এলেন উঠে বসলেন, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। শরীরের প্রতিটি অংশ ব্যথায় টনটন করছে। চারপাশে ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি।

ওরা কোথায়? এলেন জানতে চেয়েছিলেন।

–ওরা মারা গেছে।

এলেন স্বামীর দিকে তাকালেন- হায় ঈশ্বর, এ কী শুনছি?

স্বামী ঘাড় নাড়লেন– বাইরন, সুসান, মেয়েটি, পাইলট, সবাই।

এলেন চোখ বন্ধ করলেন। প্রার্থনার ভঙ্গিতে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। মাইলো আর আমি এখন কোথায় যাব? কার কাছে সাহায্য নেব? ওরা মারা গেছে, ব্যাপারটা ভাবতেই ভালো লাগছে না।

একটু আগে আমরা সকলে জীবনের উন্মাদনা পান করছিলাম।

–তুমি কি দাঁড়াতে পারবে?

মনে হচ্ছে পারব।

মাইলো সাহায্য করলেন। চারপাশে কেমন ঘনীভূত অন্ধকার।

মাইলো ধ্বংসপ্রাপ্ত উড়ান পাখির দিকে তাকালেন। আগুনের শিখা আকাশ ছোঁবার চেষ্টা। করছে।

মাইলো বললেন– এখনই এখান থেকে চলে যেতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে আবার বিস্ফোরণ হতে পারে।

ওঁরা অতি দ্রুত জায়গাটা ছেড়ে যাবার চেষ্টা করলেন। একটু বাদেই আবার বিস্ফোরণ চোখে পড়ল। গ্যাসট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেছে। দাউদাউ আগুন শিখা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

মাইলোস্কট বললেন- আমি ভাবতেই পারছি না, এভাবে মৃত্যুর উপত্যকা থেকে ফিরে আসব।

সত্যি এটা একটা অলৌকিক ঘটনা।

এলেন স্কট জ্বলন্ত এরোপ্লেনের দিকে তাকালেন। কিছু একটা তার মনে হল, স্কট ইন্ডাসট্রির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

তিনি বললেন- মাইলো?

–হ, মাইলো কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

–এটাই হল ভাগ্য।

কী?

–স্কট ইন্ডাসট্রি... এখন তুমি এর রাজা।

তাই তো?

না, আমি এভাবে চাইনি।

–মাইলো, ঈশ্বর তোমাকে এটা দিয়েছেন।

এলেনের কণ্ঠস্বরে তীব্র উজ্জ্বলতা– তুমি সারাজীবন তোমার ভাইয়ের ছায়ায় বেঁচে থাকতে। এটা কি ভালো হত?

ব্যথা-যন্ত্রণা সব কিছু এলেন ভুলে গেছেন। মনের ভেতর অনেক কথা গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে। উনি বললেন- কুড়ি বছর ধরে তুমি বাইরনের হয়ে কাজ করেছ, তিল তিল পরিশ্রম করে বিরাট কোম্পানি তৈরি করেছ। কোম্পানির সাফল্যের অন্তরালে তোমার অবদান কেউ কি স্বীকার করে? উনি তোমায় কী দিয়েছেন? উনি সব সময় বলেছেন, এটা ওনার নিজস্ব কোম্পানি। ওনার সফলতা, ওনার অর্থ। এখন? শেষ পর্যন্ত তুমি সব কিছুর রাজা হলে, তাই তো?

মাইলো তাকালেন স্ত্রীর দিকে এলেন, ওই মৃতদেহগুলো পড়ে আছে, কীভাবে সৎকার করব বলো তো?

–আমি জানি, কিন্তু আমরা তো ওদের হত্যা করিনি। শেষ অব্দি আমরা সবকিছু বুঝে পেয়েছি। কেউ এসে কোনো কিছু দাবি করবে না। এটা আমার ওটা আমার, এটা আমাদের।

একটা শিশুর কান্না শোনা গেল। এলেন আর মাইলো পরস্পরের দিকে তাকালেন, অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে।

–প্যাট্রিসিয়া, ও বেঁচে আছে, হায় ঈশ্বর।

চোখের আড়ালে শিশুটি শুয়ে ছিল। অলৌকিকভাবে সে বেঁচে গেছে। তার শরীরের কোথাও আঘাত লাগেনি।

মাইলো স্কট মেয়েটিকে তুলে নিলেন ভালো আছে, ডার্লিং, উনি বললেন, সব কিছু ঠিক আছে।

এলেন তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে। মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে হতাশা– তুমি বলেছিলে মেয়েটিও মারা গেছে।

–ও বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

এলেন স্কট অনেকক্ষণ ওই শিশুটির দিকে তাকালেন। মেয়েটা মরে গেলেই হত।

ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠস্বরে এলেন বলেছিলেন।

মাইলো অবাক হয়ে গেছেন- তুমি কী বলছ?

বাইরন সব কিছু প্যাট্রিসিয়াকে দিয়ে গেছেন। আগামী কুড়ি বছর ধরে তোমাকে অভিভাবকের ভূমিকায় থাকতে হবে। তারপর মেয়েটি বড়ো হবে। সে তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। বলে রাখছি আমি, দেখো আমার কথা একদিন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে।

মাইলো নিশ্চুপ।

–এ ধরনের ঘটনা কখনওই ঘটতে দেওয়া হবে না। এলেনের চোখে মুখে বন্যতা ফুটে উঠেছে। তিনি মাইলোর দিকে তাকালেন।

এলেন কী করতে চাইছেন?

এলেনের মন উন্মাদ আচরণে পরিপূর্ণ।

–দোহাই এলেন বলল, তুমি কী করতে চাইছ?

এলেন দীর্ঘক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চোখে ফুটে উঠেছে বন্য উন্মাদনা– আমি জানি না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

এলেন বললেন–একে আমরা কোথাও ছেড়ে দেব মাইলো। পাইলট বলেছিলেন আমরা আভিলা শহরের কাছাকাছি এসে গেছি। এখানেই শিশুটিকে ছেড়ে যেতে হবে। ওকে আমরা সঙ্গে নেব না।

মাইলো মাথা নাড়লেন– তা কী করে সম্ভব?

–কেন নয়? ওকে আমরা একটা ফার্ম হাউসের ধারে ফেলে দেব। নিশ্চয়ই কেউ ওকে পালন করবে। মেয়েটা বেঁচে যাবে। আর আমাদেরও কোনো সমস্যা থাকবে না।

মাইলো মাথা নেড়েছিলেন– না না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না।

যদি তুমি আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে তোমাকে তা করতেই হবে। তোমাকে এখন বেছে নিতে হবে মাইলো, হয় তুমি আমাকে পাবে। কিংবা সারা জীবন তোমার দাদার মেয়ের চাকর হয়ে কাটাবে।

–আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো।

–তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

আমার জীবনের থেকে বেশি।

–তা হলে সেই ভালোবাসার প্রমাণ দাও।

পাহাড়ি পথ চলে গেছে শহরের দিকে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

মৃত্যুর উপত্যকা থেকে জীবনের উদ্যান। তিন ঘণ্টা কেটে গেছে। তারা এখন আভিলা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছেন। এলেন এবং মাইলো একটা ছোট্ট ফার্ম হাউসের কাছে পৌঁছে গেলেন। তখনও সকাল হয়নি।

এলেন ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন- আমরা ওকে এখানে রেখে যাব।

শেষবারের মতো চেষ্টা করেছিলেন মাইলোএলেন, অন্যভাবে ভাববার চেষ্টা করলে কেমন হয়?

–এটা তোমায় এখনই করতে হবে।

এলেনের কণ্ঠস্বরে একধরনের আভিজাত্য।

কোনো কথা না বলে মাইলো মেয়েটিকে ফার্ম হাউসের দরজার সামনে শুইয়ে দিলেন। তার পরনে একটা গোলাপি রঙের নাইট গাউন। ছোট্ট কম্বলে ঢাকা সজীব দেহ। মাইলো স্কট অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন প্যাট্রিসিয়ার ঘুমন্ত মুখের দিকে। তার দুচোখে জল এসেছিল। তিনি অতি দ্রুত ওই স্থান থেকে চলে গেলেন। মনে মনে তিনি বললেন, ডার্লিং, আগামী জীবন যেন সুখে সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে।

মোরাসেস ভাবছিলেন, ছাগল ডাকছে, কিংবা ভেড়া। কী হল? চোখ রগড়ালেন। ঘুম ভেঙে গেল। উষ্ণ বিছানা থেকে উঠে এলেন। পুরোনো দিনের ড্রেসিং গাউন। দরজার দিকে এগিয়ে এলেন।

দেখলেন, এক জীবন্ত শিশু। উনি চিৎকার করলেন, স্বামীকে ডাকলেন। শি

শুটিকে ভেতরে আনা হল। মেয়েটা চিৎকার করছে।–ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

আর একটা কম্বল আনা হল। নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালের দিকে। করিডরে অনেকক্ষণ ওঁরা বসেছিলেন। তিরিশ মিনিট কেটে গেল। ডাক্তারের কাছে দেখানো হল।

ডাক্তার বললেন, মেয়েটির নিউমোনিয়া হয়েছে।

–ও বাঁচবে তো।

ডাক্তার হতাশভাবে কাঁধে ঝাঁকানি দিলেন।

মাইলো এবং এলেন আভিলার পুলিশ স্টেশনে এসে হাজির হলেন।

ডেক সার্জেন জানতে চাইলেন– কীভাবে আপনাদের সাহায্য করব।

ভয়ংকর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, মাইলো বললেন, আমাদের প্লেনটা পাহাড়ের ওপর ধ্বংস হয়ে গেছে।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, উদ্ধারকারীর দল পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেছে। তারা দেখল, কিছুই নেই, পড়ে আছে একটা উড়ান পাখির জ্বলন্ত মৃতদেহ। ছড়ানো ছেটানো কিছু স্মৃতি, হাড়-মাংসের টুকরো। তখনও দাউদাউ আগুন জ্বলছে।

তদন্ত শুরু হল। এটা একটা সরকারী তদন্ত।

বলা হল, পাইলটের উচিত ছিল ঝড়টাকে এড়িয়ে সামনের দিকে পৌঁছে যাওয়া। এই অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে পাইলটের ভুলের জন্য।

কাউকে দোষারোপ করা সম্ভব নয়, ব্যাপারটা সবাই ভুলে গেল। জীবন আবার তার নিয়মিত খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করল।

মাইলো এবং এলেন একটা প্রাইভেট মেমোরিয়াল সারকিটে এলেন। বাইরন স্কট, তার স্ত্রী সুসান এবং তাদের ছোট্ট মেয়ে প্যাট্রিসিয়ার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। তারা নিউইয়র্কে। ফিরে এলেন। আর একটি শোক সভার আয়োজন করা হল। স্কট পরিবারের অনেকে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীর দল।

সকলেই বলেছিলেন- সাংঘাতিক, ব্যাপারটা ভাবতেই গা শিউরে উঠছে। আহা, ছোট্ট প্যাট্রিসিয়া!

এলেন স্কট বলেছিলেন– ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গিয়েছে এটাই ভালো ব্যাপার। কাউকে আহত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়নি।

ব্যবসায়ী মহল ভেঙে পড়েছিল। স্কট ইন্ডাসট্রির স্টকের দাম হু হু করে পড়ে গেল। তখনও এলেন স্থির হয়ে বসেছিলেন। তিনি জানতেন, একদিন অবস্থার পরিবর্তন হবে।

তিনি স্বামীকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন- সব কিছু আবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে। মাইলো, তুমি পেছন দিকে তাকিও না। অতীতটা মরে গেছে। তুমি এখন সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

মাইলো স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে জানতে চেয়েছিলেন প্রিয়তমা, কোথা থেকে শুরু করব বলো তো? আমার মাথায় কিছু আসছে না।

এলেন হেসেছিলেন এবার আমরা একটা স্বপ্নের পৃথিবী তৈরি করব। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ভাবতেই পারা যায় না, গ্যারি শহরের সেই গরীব পোলিশ কন্যাটি আজ বিশ্বের অন্যতম ধনী রমণীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এলেন ডুড্যাস কোথায় হারিয়ে গেছে। তারপর...

ছোট্ট মেয়েটি দশদিন কাটিয়ে ছিল হাসপাতালের শয্যাতে, জীবনের জন্য লড়াই করতে হয়েছিল তাকে। শেষ পর্যন্ত অবস্থটা পাল্টে গেল। ফাদার বেরেনডো ওই চাষী আর তার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

উনি বললেন– তোমাদের জন্য একটা সুখবর আছে। মেয়েটা বেঁচে গেছে।

চাষীর চোখে বিপদের ছায়া। বলল- কিন্তু? ও কি আমাদের কাছে ঈশ্বরের অবদান?

ফাদার বেরেনডো তাই বলেছিলেন।

চাষী-বউ বলেছিল– ভগবান কত করুণাময়। তিনিই তো মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমরা ওকে মানুষ করব কী করে?

ফাদার বেরেনডো আবার বলেছিলেন– মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী।

–হ্যাঁ, তা স্বীকার করছি। কিন্তু আমার বয়স হয়েছে, শরীর অশক্ত। আগের মতো কাজ করতে পারি না। না, এই বয়সে আমরা আর শিশু পালনের দায়িত্ব নিতে পারব না। ভগবান যেন অনুগ্রহ করে তার উপহার ফেরত নেন।

তাহলে? মেয়েটির স্থান কোথায় হবে? আভিলার ওই অনাথ আশ্রম ছাড়া আর কোথায় সে থাকতে পারে!

.

বাইরন স্কটের অ্যাটর্নি অফিস। এবার উইলটা পড়া হবে। লইয়ার বসে আছেন। মাইলো এবং এলেনকেও দেখা যাচ্ছে। এলেনের মনে উত্তেজনা জমেছে। কাগজটা পড়া হল। কী আশ্চর্য! আমরা কত কিছু কিনব। সাউদাম্পটনে একটা সম্পত্তি। ফরাসি দেশে একটা ক্যাসেল। এভাবেই শুরু হবে।

ভদ্রলোক বলার চেষ্টা করলেন। এলেন দম বন্ধ করে বসে আছেন। কয়েক মাস আগে তিনি বাইরন স্কটের অফিসে এই উইলের কপি দেখেছিলেন। তখন থেকেই তার মনে উত্তেজনা।

বলা হয়েছে, যদি কোনো কারণে আমি এবং আমার স্ত্রী, দুজনেই মারা যাই, তাহলে স্কট ইন্ডাসট্রির সবকিছু আমার কন্যা প্যাট্রিসিয়াকে দেওয়া হবে। আমার ভাই মাইলোকে আমি তার অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করলাম। উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত মাইলোই সবকিছু দেখাশুনা করবে।

এসব এখন পাল্টাতে হবে, এলেন ভেবেছিলেন।

লরেন্স গ্রে, শান্তভাবে বললেন- এটা আমাদের সকলের কাছে এক দুঃসংবাদ। আমি জানি, আপনি দাদাকে কতখানি ভালোবাসতেন।

..মাইলো, তিনি মাথা নাড়লেন, জীবনতো চলবেই। পরবর্তীকালে আপনার ভাই এই উইলটা পাল্টেছিলেন। আমি তার সারাংশটুকু পড়ছি। তিনি বলেছিলেন- প্যাট্রিসিয়া সারা জীবন পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পাবে, প্রত্যেক বছর ব্যবসার লাভ থেকে একটা অংশ পাবে, স্কট ইন্ডাসট্রির যত শেয়ার আছে, আমি এবং আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তা সবই মাইলো পাবে। দীর্ঘদিন ধরে সে আমার কাছে কাজ করেছে, তার সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। এটা হল আমার তরফ থেকে তার প্রতি উপহার।

মাইলো স্কটের মনে হল, এখনই এই ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারলে ভালো হয়।

মিঃ গ্রে তাকালেন। বললেন- ঠিক আছে?

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। হা ঈশ্বর, আমরা কী করলাম? আমরা মেয়েটিকে হত্যা করলাম। এর কোনো দরকার ছিল না। এখন তাকে ফিরিয়ে আনা যায়?

তিনি এলেনের দিকে তাকালেন, এলেনের চোখ বন্ধ। ঘরের ভেতর নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে।

এলেন, আমরা কিছু একটা করতে পারি কি? যেখানে প্যাট্রিসিয়াকে রেখে এসেছি, সেখানে একবার যাব?

ফিফথ এভিনিউ অ্যাপার্টমেন্ট। একটুবাদে ট্যারিটারি নাচ শুরু হবে।

এলেন বলেছিলেন– এখনও তাই করতে হবে। কিন্তু তুমি কী করে মেয়েটিকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবে? একদিন সে বড়ো হবে, তখন?

এই প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না মাইলোর কাছে। তিনি চিন্তা করলেন– ঠিক আছে, আমরা প্রতি মাসে তার জন্য টাকা পাঠাব।

–বোকার মতো কথা বলো না মাইলো। কীভাবে পাঠাবে? পুলিশ তখন তদন্ত করতে শুরু করবে। আমাদেরকে ধরে ফেলবে। যদি তোমার বিবেক এতখানি দংশন করে, তাহলে কোম্পানির লাভ থেকে কিছু অংশ দান করে দাও। ওই মেয়েটাকে ভুলে যাও। মাইলো, সমাজের চোখে সে মৃত। আমার এই কথাটা যেন মনে থাকে।

মনে রেখ–মনে রেখো... শব্দগুলো আঘাত করল মাইলোকে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

অ্যাসটোরিয়ার বলরুম জনাকীর্ণ। আবার সম্মাননা জানানো হচ্ছে।

এলেন ভাবলেন, আপনারা এক মৃতা মহিলার জন্য এত আয়োজন করেছেন?

সেই রাতে ভূতের দল আবার ফিরে এসেছিল। অনেকদিন আগে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এলেনের। প্রথমদিকে তারা প্রায়ই আসত। মনে হত, কতকগুলো অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি শয্যার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিসফিস কণ্ঠস্বর। এলেনের ঘুম ভেঙে যেত। উঠে বসতেন তিনি। কিন্তু কেউ নেই। কোনো দিন তিনি একথা মাইলোকে জানাননি। মাইলো দুর্বল স্বভাবের মানুষ। তিনি হয়তো এই কথা শুনে আরও ভয় পাবেন। কোম্পানির ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না। যদি সত্যিটা কোনোদিন প্রকাশিত হয়, এই কলঙ্ক স্কট ইন্ডাসট্রিকে ধ্বংস করবে। এলেন স্কট এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সব কিছু মনের মধ্যে চেপে রাখতে হবে। তাই তিনি নীরবতার মধ্যেই ভয়কে বরণ করলেন। শেষ অব্দি ভূতেরা চলে গেল। তিনি আবার শান্তিতে ঘুমোত পারলেন।

ব্যাঙ্কোয়েটের হলে তারা ফিরে গেছেন। তিনি শয্যায় উঠে বসলেন। ঘরটা ফাঁকা। তারা কোথায়? তারা কি কিছু বলার চেষ্টা করছে। বলতে চাইছে, আর বেশি দিন নয়, এলেন, তুমিও আর কিছু দিন বাদে এই জগতের বাসিন্দা হবে।

এলেন স্কট উঠলেন। বিরাট ড্রয়িংরুমে গিয়ে দাঁড়ালেন। চারপাশে অ্যান্টিক চিহ্ন। এইখানে কত স্মৃতি আছে। ভাবলেন মাইলল, ভাববার চিন্তা কোথায়? ভাইয়ের মৃত্যুর পর কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। ওই দুর্ঘটনার পর হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। এলেন স্কট তখন থেকেই এই কোম্পানির কর্ত্রী। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কোম্পানিকে পরিচালনা করছেন। স্কট ইন্ডাসট্রি আজ সারা বিশ্বে তার নাম ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই কোম্পানিটা স্কট পরিবারের। তিনি ভাবলেন, তাহলে অযথা আমি ওই ভূতগুলোকে ভয় পাব কেন?

বাইরন আর সুসানের একমাত্র কন্যার কথা মনে পড়ে গেল। তার হাতেই তো এই বিরাট সাম্রাজ্যের দায়িত্ব ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই চিন্তার মধ্যে একটা ভয় আছে। মৃত্যুর ছায়া কি তিনি দেখতে পাচ্ছেন?

এলেন স্কট ড্রয়িংরুমে বসে থাকলেন, বাকি রাতটুকু। কিছুই চিন্তা করতে পারছেন না। কতদিন হয়ে গেল। আঠাশ বছর, প্যাট্রিসিয়া এখন এক পরিপূর্ণ যুবতী। আশা করি এখনও সে বেঁচে আছে। কীভাবে জীবন কাটাচ্ছে? এক কৃষককে বিয়ে করেছে? অথবা গ্রামের কোনো ব্যবসায়ীকে? ছেলে মেয়ে হয়েছে কি? ও কি এখন আভিলাতেই থাকে? নাকি অন্য কোথাও চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত এলেন স্কট ভাবলেন- ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। যদি প্যাট্রিসিয়া এখনও বেঁচে থাকে, আমি তার সঙ্গে কথা বলব। তার মুখোমুখি বসব। অর্থ দিয়ে মিথ্যাও সত্যি হয়ে যায়। সত্য মিথ্যা হয়। আমি দেখব, এই সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা। ওকে জানতে দেব না, সত্যি সত্যি কী ঘটেছিল।

পরের দিন সকাল হয়েছে। এলেন স্কট ইন্ডাসট্রির সিকিউরিটি চিফকে ডেকে পাঠালেন। অ্যালান টাকার, প্রাক্তন গোয়েন্দা। মধ্যচল্লিশ, পাতলা চেহারা। মাথার চুল কমতে শুরু করেছে। মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। ভীষণ পরিশ্রম করতে ভালোবাসেন।

–আপনাকে আমার জন্য একটা কাজ করতে হবে।

–বলুন মিসেস স্কট।

এলেন তাকালেন– কতটা বলা যায়। অথবা কিছুই বলব না। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমি এই কোম্পানিটাকে ধ্বংস হতে দেব না। দেখা যাক প্যাট্রিসিয়াকে পাওয়া যায় কিনা। তারপর সমস্যাটার আমিই সমাধান করব।

উনি সামনের দিকে ঝুঁকলেন–আঠাশ বছর আগে, আভিলার এক ফার্ম হাউসের বাইরে একটি অনাথ কন্যাকে রেখে আসা হয়েছিল। স্পেনে। আমি চাইছি, ওই কন্যাটির হাল হকিকৎ খুঁজে বার করুন। তাকে আমার কাছে আনতে হবে।

এলেন তাকালেন। মুখ অভিব্যক্তি শূন্য। উৎকট আবেগ অথবা অনুভূতি কিছুই নেই। সেখানে।

–ঠিক আছে। আমি কালই যাত্রা করছি।

.

১৭.

কর্নেল র‍্যামন আকোকো, মনটা তার ভালো নেই। শেষ অব্দি ঘটনা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।

কর্নেল হোস্টেলে এসেছেন। কথাবার্তা বলতে হবে। দুজনে কথা হল। কীভাবে কাজ শুরু করা যায়। হোস্টেলের হাতে অনেক গোপন খবর আছে। আকোকা জানেন, তাই তিনি এই লোকটিকে বিশ্বাস করেন।

আকোকা বললেন- জাইমে মিরোর সাথে চারজন সিস্টার আছে।

কী বললেন?

–হ্যাঁ, আমি ঠিক বলছি। চারজন সিস্টার জাইমো মিরো আর তার মানুষদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। সিস্টারদের তিনটি দলে ভাগ করা হয়েছে।

–এত খবর কোথায় পেলেন?

র‍্যামন বললেন- আপনি কি দাবা খেলতে জানেন?

-না।

আপনাকে দেখে খুবই খারাপ লাগছে আমার। দাবা খেলা মানুষকে অনেক শিক্ষা দেয়। ভালো খেলতে হলে কী করতে হয় বলুন তো? উল্টোদিকে যে বসে আছে তার মনটাকে জানতে হয়। জাইমে মিরো আর আমি পরস্পরের সঙ্গে দাবা খেলছি।

সোসটেলো অবাক হয়ে তাকালেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

না, আক্ষরিক অর্থে বলছি না কর্নেল, আমরা সত্যি সত্যি দাবার দুপাশে বসে নেই। আমরা আমাদের মনের শক্তিকে ব্যবহার করছি। আমি জাইমে মিরো সম্পর্কে অনেক খবর আপনাকে দেব, পৃথিবীর কেউ সে খবর দিতে পারবে না। আমি জানি, কীভাবে তার মন কাজ করে। আমি জানি তিনি এখন কী করবেন। তিনি উয়েন্টা লা রায়নার ক্যাম্প ভেঙে দেবার চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যেই ওনার দুজন সহচরকে আমরা ধরে ফেলেছি। ভাগ্যের জোরে জাইমে পালাতে পেরেছেন, আর সে সুযোগ তিনি পাবেন না।

র‍্যামন আকোকা কাঁধ ঝাকনি দিলেন। আর কোথাও এ সুযোগ পাওয়া যাবে না। ষাঁড়ের আসরে দুর্ঘটনা, না, এটা বার বার ঘটবে না।

–আপনি সত্যি বলছেন?

–হ্যাঁ, উনি আমার শত্রু, কিন্তু ওনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এক অসাধারণ মন আছে। আছে দূরদর্শিতা।

–মিরো কোন দিকে চলেছেন?

–উনি চলেছেন উত্তরদিকে। আগামী তিনদিনের মধ্যে আমি ওনাকে ধরে ফেলব। কর্নেল সোসটেলো মাথা নাড়লেন- শেষ অব্দি আমরা জিতব তো?

কর্নেল আকোকা জাইমে মিরো সম্পর্কে অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন দীর্ঘ পরিশ্রম এবং উদ্যমে।

শেষ অব্দি তিনি বললেন- হা, মিরো একজন সন্ত্রাসবাদী। আমাদের ইনফরমারের কাজ করছে। সুতরাং...

শেষটুকু তিনি বললেন না, তার দুটি চোখে তখন জেগেছে জান্তব জিঘাংসা।

রুবিও, টমাস এবং দুজন সিস্টার বড়ো রাস্তার ধারে এসে পড়েছেন। পাশের পথ চলে গেছে সুদুরের দিকে। ছোটো ছোটো গ্রাম তারা পার হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে রাখাল বালকেরা মনের সুখে রেডিও শুনছে। আহা, অসাধারণ দৃশ্যপট। লুসিয়ার মনে এখন অন্য চিন্তা।

তিনি সিস্টার থেরেসার পাশাপাশি হাঁটছেন। কীভাবে এই ক্রশটা নিয়ে পালানো যেতে পারে, এই চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। দুজন সবসময় পাশাপাশি হাঁটছেন। রুবিওকে এদের মধ্যে বেশি চালাক-চতুর বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু, মনটা বোধহয় সরল, অন্তত লুসিয়ার তাই মনে হচ্ছে।

টমাস সানজুরো, ভদ্রলোকের দৃষ্টি আছে, সন্তপর্ণে চারদিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে দেখে দোকানের কর্মচারী বলে মনে হয়। তিনিও কিনা এই সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

তাঁরা আভিলার উত্তর সমতলে এসে পড়লেন। রাত হয়েছে। স্তেপ অঞ্চল থেকে শীতল বাতাস ছুটে আসছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। গমের ক্ষেত ভরে উঠেছে। অলিভ গাছ দেখা গেল। আঙুর ক্ষেত আর মেচ। কিছু আলুর ক্ষেত আর লেটুস গাছ চোখে পড়ল। আরও কত কি।

রুবিও মন্তব্য করলেন গোটা স্পেন জুড়ে এমন শস্য ফলেছে।

টমাস হাসতে হাসতে বললেন– যে কেউ তা নিতে পারে।

ইতিমধ্যে তারা বেশ কিছু খাবারের সন্ধান পেয়েছেন। চাষীদের ক্ষেত থেকে।

সিস্টার থেরেসা হতভম্ব হয়ে গেছেন। কত তাড়াতাড়ি মেনডাভিয়াতে পৌঁছোনো যেতে পারে, এটাই তার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে।

লুসিয়া কথা বলার চেষ্টা করলেন। সিস্টার থেরেসা জবাব দিচ্ছেন না। লুসিয়া শান্ত দৃষ্টিতে সিস্টারকে পর্যবেক্ষণ করলেন। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই প্রবীণা মহিলা এখন চিন্তিত।

লুসিয়া ক্যানভাস জ্যাকেটের দিকে হাত দিলেন। বললেন– এটা খুব ভারী, তাই তো? আপনি কি এটা আমার হাতে তুলে দেবেন?

সিস্টার থেরেসার মুখে ভয়। তিনি বললেন- না, যিশু কিন্তু এর থেকেও বেশি বোঝ বহন করেছিলেন। আমি যিশুর নাম স্মরণ করে এটাকে বয়ে নিয়ে চলব।

–আপনি ঠিক আছেন তো সিস্টার?

–হ্যাঁ, আমার কোনো কষ্ট নেই।

সিস্টার সত্যি ভালো নেই, তিনি ঘুমোতে পারছেন না। তাঁর মনে নানা চিন্তার বিচ্ছুরণ। তিনি হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন। সিস্টার বেটিনা তাহলে আমাকে বকবেন। বেটিনা কোথায়? কে কোথায় কোনো খবর নেই।

রুবিও কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। সিস্টার থেরেসার সঙ্গে। তিনি কিন্তু জবাব দেননি।

জানতে চেয়েছিলেন সিস্টার, আপনি কনভেন্টে কত দিন আছেন?

তিরিশ বছর।

অনেক দিন। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

–ইজে।

–ইজে? আমি সেখানে একবার গিয়েছিলাম। ছুটির সময়। সুন্দর শহর। আমার অনেক কিছু মনে আছে।

কী মনে আছে, আপনি কি রাউলকে চেনেন? রাউল কি তাকে পাঠিয়েছেন? বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা আশঙ্কা। হতে পারে, এই সন্ত্রাসবাদীরা কি আমাকে আবার ইজে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। রাউল জিরাডটের কাছে? আমাকে কিডন্যাপ করবে? আমি মনিকার শিশু সন্তানকে অবহেলা করেছি সেই অপরাধে? কিছুই মাথায় আসছে না।

হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।

রুবিওর মনে হল, সিস্টার সেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আপনার শরীর খারাপ সিস্টার।

না।

সিস্টার লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এগিয়ে গেলেন। মনে হল, কোথায় একটা গোলমাল হচ্ছে। না, আমাকে আর একটু চালাক হতে হবে।

সমতল ভূমির ওপর দিয়ে এই দলটা এগিয়ে চলেছে। তারা একটা ছোট্ট গ্রামে এসে পৌঁছোলেন। চাষী বউরা কাজ করছে। কর্মচঞ্চলতা জেগেছে।

এত সুন্দর দৃশ্য, রুবিওর মনে পড়ল, স্পেন শহরের সব জায়গায় প্রকৃতি এত উদার। আমরা কি কখনও শান্তির জগতে ফিরে যাব না?

অলিভ গাছের সারবন্দি সমারোহ, নিদাঘ দিনের বাতাস ভরে উঠেছে আঙুরের গন্ধে, কমলা ফুল ফুটেছে। বাগানে কত না ফুলের ছড়াছড়ি। চেরি গাছের পাশে তাল গাছ। মুরগির কোঁকর-কোঁ শব্দ, শুয়োরের ঘোঁত ঘোঁত, ছাগলের বাবা। ধীর পদক্ষেপে তারা এগিয়ে চলেছেন। রুবিও এবং টমাস পরস্পরের মধ্যে কথা বলছেন। চকিতে সিস্টার থেরেসার মনে হল, ওঁরা বোধহয় আমার বিষয়ে আলোচনা করছেন।

কত টাকা দেওয়া হবে? কিছুই জানা যাচ্ছে না। ওরা দুজন হেসে উঠলেন।

সিস্টার থেরেসার মনে ভয় বদ্ধমূল হয়েছে। তার মানে? এরা রাউলের গুপ্তচর। এখন কী হবে? আমি সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

কী করা যায়? রাউল এগিয়ে এসেছে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমাকে চুমু দিচ্ছে। বলছে আমি এখনও তার স্ত্রী হতে পারি। কিন্তু আমি তো এখন স্বয়ং যিশুর বউ। আমি তো রাউলের কাছে ফিরতে পারি না।

লুসিয়া তাকিয়ে আছেন ভালোভাবে। সিস্টার থেরেসা নিজের সাথে নিজেই কথা বলছেন। এখনই চমক ভাঙাতে হবে।

নাকি আর একটু অপেক্ষা করব? কখন? কখন ওই মহার্ঘ্য সোনার খনি আমার দ্বারা অধিকৃত হবে?

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দুরে অলমেডো শহরর দৃশ্যপট দেখা যাচ্ছে।

রুবিও বললেন- শহরে সৈন্যরা আছে। আমরা পাহাড়ের পথ ধরব। শহরটাকে এড়িয়ে যেতে হবে।

তারা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। পাহাড়ের খাড়াই শুরু হল। সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। শেষ রশ্মি পাহাড়ের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে।

আরও কয়েক মাইল যেতে হবে। তারপর আমরা বিশ্রাম নেব।

তারা একটা পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছেন। টমাস সানজুরো বললেন– তাড়াতাড়ি করো।

রুবিও তাকালেন, দূরের উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। বোঝা গেল, সেখানে সৈন্যরা তবু ফেলেছে।

রুবিও বললেন- ওটা প্লাটুন আছে। না, আমাদের এখানে থাকা উচিত হবে না। সকাল হলেই ওরা তল্লাশি করতে শুরু করবে। উনি লুসিয়া এবং সিস্টার থেরেসার দিকে তাকালেন। বললেন- সারারাত আমাদের কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। সৈন্যদের দেখা গেছে। আমাদের আরও বেশি সাবধান হতে হবে।

লুসিয়ার কানে তখন এই শব্দগুলি বাজছে। আহা, এটাই তো সঠিক সময়। রাতের অন্ধকারে আমি সোনার ক্রশটা নিয়ে পালিয়ে যাব। ওরা আমাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না। অনুসরণে ভয় আছে।

সিস্টার থেরেসার কাছে এই সংবাদটা অন্য মানে নিয়ে এসেছিল। তার মনে হল, কর্নেল আকোকা নামে কেউ একজন তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আকোকা একজন শত্রু। কিন্তু উনি আমার বন্ধু। উনি আমাকে উদ্ধার করবেন।

দীর্ঘদেহী রুবিও বললেন- সিস্টার, বুঝতে পেরেছেন, শান্ত হয়ে থাকতে হবে।

–হ্যাঁ, আমি সব বুঝতে পারছি।

থেরেসা জবাব দিলেন।

টমাস বললেন– বুঝতে পারছি, আপনারা একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছেন। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের আমি সাবধানে কনভেন্টে পৌঁছে দেব।

আঃ, আর সময় কাটছে না। দুজন শ্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শোবার চেষ্টা করলেন।

আমাদের একটু ঘুম দরকার।

দুই সিস্টারকেও এবার শুতে হবে। রাতের আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। আকাশের প্রেক্ষাপটে তারার ঝিকিমিকি। লুসিয়া চারপাশে তাকালেন। আর মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা। স্বাধীনতার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। ওরা কখন ঘুমিয়ে পড়বে?

চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে গেছে। এবার, এবার উঠতে হবে।

সিস্টার থেরেসা লুসিয়ার পাশেই ছিলেন। একেবারে জেগে, চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। আত্মার ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। আমাকে ঠিক মতো পৌঁছোতে হবে। আমি তার সাথে মিলিত হব। না, সংসার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করব না।

ভোর চারটে, সিস্টার থেরেসা উঠে বসলেন। টমাস শুয়ে আছেন, কয়েক ফুট দূরে। রুবিও দাঁড়িয়ে আছেন, সিস্টারের দিকে পিছন ঘুরে। সিলুট ছবির মতো দেখাচ্ছে তাকে।

শান্ত পরিবেশ। থেরেসা উঠলেন। কী একটা চিন্তা করলেন। ক্রুশের কথা ভাবলেন, এটাকে কি আমি বহন করব? নাকি এখানে ফিরে আসব খুবই তাড়াতাড়ি। কিন্তু এটা কোথায় রাখব? তিনি তাকালেন সিস্টার লুসিয়ার দিকে। আহা, মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে। এখানে রাখা যাক। থেরেসা ভাবলেন।

তিনি স্লিপিং ব্যাগের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওই প্যাকেটটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। লুসিয়া কোনো শব্দ করলেন না। সিস্টার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। রুবিও আরজানোর চোখের বাইরে। তারপর এগিয়ে গেলেন সৈন্যদের তাবুর দিকে। রাস্তাটা খুব একটা ভালো নয়। শিশির পড়েছে। পথ পিছল। ভগবান তাকে ডানা দিয়েছেন। তিনি খুব দ্রুত এগিয়ে। চলেছেন।

অন্ধকারের মধ্যে একজনের মুখ ভেসে উঠল– কে? কে চলেছে?

–আমি সিস্টার থেরেসা।

সিস্টার বেরিয়ে এলেন। সৈন্যের পোশাক পরা একজন। হাতে রাইফেল। চিৎকার করছেন আপনি কোথা থেকে আসছেন?

থেরেসার সোনালি চোখে আভা– ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন।

সান্ত্রী অবাক ঠিক বলুন।

–আমি কর্নেল আকোকার সঙ্গে দেখা করব।

সান্ত্রী মাথা নাড়ল- আপনি কি পাগল?

–আমি অ্যাবে সিস্টারসিয়ান থেকে আসছি। আমি সিস্টার থেরেসা। আমাকে জাইমে মিনোর লোকেরা বন্দী করেছে।

–আপনি কনভেন্ট থেকে আসছেন?

–হ্যাঁ।

–আভিলার কনভেন্ট?

–হ্যাঁ, থেরেসা অধৈর্যভাবে বলতে থাকলেন। এবার সৈন্যের মুখ পাল্টে গেল– কর্নেল সোসটেলো আছেন। আমি কি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাব?

উনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?

–হ্যাঁ, আমার মনে হয় উনি পারবেন। আপনি আমাকে অনুসরণ করুন।

এই শুভ সংবাদটা বেচারী বিশ্বাস করতে পারছেন না। কর্নেল সোসটেলো কত সৈন্যকে চারপাশে পাঠিয়েছেন। চারজন সেবিকাকে খুঁজে বের করতে হবে। এখনও পর্যন্ত তারা কেউ এই কাজে সফল হয়নি। আহা, এই খবরটা পেলে কর্নেল কত না খুশি হবেন।

তারা টেন্টে পৌঁছে গেলেন। কর্নেল সাসটেলো এবং তার কম্যান্ড একটি মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। সেনট্রি প্রবেশ করল, সঙ্গে একজন বৃদ্ধা মহিলা।

কর্নেল, ইনি হলেন সিস্টার থেরেসা। সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট থেকে এসেছেন।

কর্নেল সোসটেলো অবাক হলেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। গত তিনদিন ধরে তারা জাইমে মিরো আর ওই চার সেবিকার সন্ধানে কত অর্থ ব্যয় করেছেন। কত সৈন্যকে চারপাশে পাঠিয়েছেন। আর আজ তাদের একজন কিনা নিজেই এসেছেন।

-সিস্টার বলুন।

–এখন আর সময় নেই। সিস্টার থেরেসা ভাবলেন। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওরা আমাকে ইজে নিয়ে যাবে। তার মাথায় তখন বিচিত্র চিন্তার অনুরণন।

কর্নেল জানতে চাইলেন কারা?

–জাইমে মিরোর লোকেরা।

উনি লাফিয়ে উঠলেন– সিস্টার, আপনি কি সত্যি বলছেন?

সিস্টার থেরেসা অধৈর্যভাবে বললেন–, ওরা পাহাড়ের ওধারে লুকিয়ে আছে।

.

১৮.

অ্যালান টাকার আভিলাতে নামলেন। কথাবার্তা বলার পরের দিন। দীর্ঘ আকাশ যাত্রা। টাকার হয়তো ক্লান্ত। কিন্তু উত্তেজনা জেগেছে তার মনের মধ্যে। এলেন স্কট খামখেয়ালের বশে কোনো কিছু করেন না। তিনি যখন পাঠিয়েছেন, কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে।

তিনি উঠলেন বসটারস হোটেলে। ক্লার্ককে বললেন, কাছাকাছি কোনো খবরের কাগজের অফিস আছে?

রাস্তার ওপর, বাঁ দিকে, দুটো ব্লক পরে।

–ঠিক আছে।

মেন স্ট্রিট। বিকেল হয়েছে। শহর প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কেন এই রহস্যময় অভিযান? তিনি এলেন স্কটের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন। যদি মেয়েটি বেঁচে থাকে, তাকে এখানে নিয়ে আসবেন। অন্য কারো সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবেন না।

মেয়েটিকে আমি কী বলব?

–ওকে বলবেন, তার বাবার একজন বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। এই কথা শুনলে ও এখানে চলে আসবে।

টাকার খবরের কাগজের অফিসে চলে গেলেন। অনেকে কাজ করছেন। অনুগ্রহ করে আমাকে ম্যানেজিং এডিটরের কাছে নিয়ে যাবেন?

একজন বললেন- উনি ওখানে আছেন।

টাকার দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। ভেতরে গেলেন। মধ্য বয়স্ক একজন মানুষ, ডেস্কের উল্টোদিকে বসে আছেন। ব্যস্তভাবে কিছু একটা লিখছেন।

–আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি কি একমুহূর্ত আপনার সঙ্গে কথা বলব?

বলুন। আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

–আমি একটি মেয়েকে খুঁজছি।

কী নাম?

–তাকে একটা ফার্ম হাউসের পাশে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে ছিল একেবারেই শিশু।

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল সে কি নিঃসঙ্গ?

-হ্যাঁ।

–আপনি তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন?

–হ্যাঁ।

কত বছর আগের ঘটনা।

–আঠাশ বছর।

. ওই ভদ্রলোক মাথা আঁকালেন তখন আমি এখানে যোগ দিইনি।

ব্যাপারটা অত সহজে হবে না টাকার বুঝতে পারলেন।

আপনি কি কারও নাম বলবেন, যিনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন?

সম্পাদক বললেন আমি বলি কি আপনি ফাদার বেরেনডোর সঙ্গে দেখা করুন। উনি এই ব্যাপারে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন।

ফাদার বেরেনডো তার স্টাডিতে বসেছিলেন। এই আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

অ্যালান টাকারের কথা বলা শেষ হল।

ফাদার বেরেনডো বললেন আপনি কেন এই ব্যাপারটা জানতে চাইছেন বলুন তো? ঘটনাটা অনেক দিন আগে ঘটেছিল। আপনাকে কে পাঠিয়েছে জানতে পারি কি?

টাকার ইতস্তত করছেন সাবধানে শব্দ চয়ন করলেন– আমি সব কিছু বলতে পারছি না। তবে আমি কথা দিচ্ছি মেয়েটির কোনো ক্ষতি করব না। শুধু আপনি কি বলবেন কোথায় তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল?

–কোন ফার্ম হাউস?

স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন। হ্যাঁ, অনেক দিন আগে মোরাসেস এমনই একটি মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল।

মেয়েটি তখন মৃত্যু শয্যায়। মোরাসেস জানতে চেয়েছিল, ফাদার, আমরা কী করব?

ফাদার কথা বলেছিলেন তার বন্ধু পুলিশ প্রধান ডন মোরাগোর সাথে।

–আমার মনে হচ্ছে কোনো ট্যুরিস্ট দম্পতি একে ফেলে গেছে। তুমি হোটেলগুলোতে খোঁজ করো। দেখো তো, এমন কোনো খবর আছে কিনা।

খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল। কিন্তু কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শেষ পর্যন্ত ডন মোরাগো বলেছিলেন–মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে মেয়েটি খসে পড়েছে।

তারপর? রহস্যটা থেকেই গেছে। আজ পর্যন্ত সমাধান হয়নি।

ফাদার বেরেনডো ওই শিশুটিকে অনাথ আশ্রমে রেখে এসেছিলেন। মার্সিডেজ অ্যাঞ্জেলস জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেয়েটির কোনো নাম দেওয়া হয়েছে কি?

–আমি জানি না।

–কিছু একটা নাম তো দিতে হবে।

মার্সিডেজ অ্যাঞ্জেলস নাম লিখেছিলেন– মেগান। চোদ্দো বছর কেটে গেছে। ফাদার বেরেনভো মেগানকে নিয়ে গেছেন সিস্টারসিয়ান অ্যাবেতে।

.

এত বছর বাদে এই ভদ্রলোক খোঁজ করতে এসেছেন? জীবনের সব কিছু কি বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে? ফাদার বেরেনডো ভাবলেন। মেগান কোথায়? না, এটা তো তার আসল নাম নয়। এ নামটা দেওয়া হয়েছিল।

ফাদার বেরেনডো বললেন- আপনি বসুন, আপনাকে অনেক কিছু বলার আছে।

গল্প শুরু হল। ভদ্রলোকের কথা শেষ হয়ে গেছে। অ্যালান টাকার চুপ করে বসে আছেন। তার মন ছুটে চলেছে। এলেন স্কট এ ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখাচ্ছেন কেন? আঠাশ বছর আগের ঘটনা, একটি মহিলা, মেগান, তার ব্যাপারে এত আলোড়ন? .

বলতে হবে বাবার বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। প্রতিটি কথার মধ্যে রহস্য।

বাইরন স্কট এবং তার স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যু হয়েছিল অনেক বছর আগে। স্পেনের কোনো একটা অঞ্চলে। এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্রতা আছে কি? অ্যালান উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

–ফাদার, আমি কি একবার ওই কনভেন্টে যেতে পারি? ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূচিপত্র

পাদরি সাহেব মাথা নাড়লেন। না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। দুদিন আগে সরকারের একদল এজেন্ট ওই কনভেন্ট আক্রমণ করে। সিস্টাররা কে কোথায় ছিটকে গেছেন কেউ জানে না।

অ্যালান অবাক হয়ে বললেন- সে কী? সিস্টারদের কী হয়েছে?

তাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাদ্রিদে।

অ্যালান উঠে দাঁড়ালেন– থ্যাঙ্ক ইউ, ফাদার। তাকে এখন মাদ্রিদ যেতে হবে।

ফাদার বললেন- চারজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। সিস্টার মেগান তাঁদেরই একজন।

ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল। উনি এখন কোথায় আছেন?

–কেউ জানে না। পুলিশ এবং মিলিটারির লোকেরা হন্যে হয়ে ওঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

–আমি দেখছি। অ্যালান টাকার অন্য সময় হলে এলেন স্কটকে ফোন করতেন। বলতেন, আমি একটা সম্ভাবনাশূন্য পরিণতিতে পৌঁছে গেছি। কিন্তু এখন তার গোয়েন্দা মন বলল, এবার অন্যভাবে ব্যাপারটার তদন্ত শুরু করতে হবে।

এলেন স্কটকে ফোন করা হল–একটু জটিলতা আছে মিসেস স্কট।

তিনি সব কিছু বললেন।

কিছুক্ষণের নীরবতা।

মেয়েটি এখন কোথায়? কেউ জানে না?

–সে বোধহয় পালিয়ে গেছে। কোথাও লুকিয়ে আছে। পুলিশ চেষ্টা করছে। স্প্যানিশ আর্মিরাও পথে নেমেছে। একদিন তারা ধরা পড়বে।

আবার নীরবতা ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

-ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি মিসেস স্কট।

.

অ্যালান টাকার ফিরে এলেন সংবাদপত্র অফিসে। ওটা এখনও খোলা আছে।

তিনি সম্পাদককে বললেন-অনুগ্রহ করে আপনি পুরোনো ফাইলগুলো আমাকে দেবেন কি?

–আপনি কী দেখতে চাইছেন?

–এখানে একটা প্লেন দুর্ঘটনা হয়েছিল।

কত বছর আগে?

–আঠাশ বছর আগে, ১৯৪৮

অ্যালানটাকারের পনেরো মিনিট সময় লাগল, খবরটা দেখতে পেলেন।

লেখা আছে–১ অক্টোবর ১৯৪৮। স্কট ইন্ডাসট্রির প্রেসিডেন্ট বাইরন স্কট, তাঁর স্ত্রী সুসান এবং তাঁদের এক বছরের কন্যা প্যাট্রিসিয়ার মৃত্যু হয়েছে প্লেন দুর্ঘটনায়।

তাহলে? এটাই হল জ্যাকপট। গোয়েন্দার রক্ত ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। আমি মস্ত বড়োলোক হব, এমন বড়োলোক যে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না।

.

১৯.

তিনি বিছানাতে শুয়ে ছিলেন। একেবারে নগ্ন হয়ে। তিনি বুঝতে পারছেন বেনিটো পাটাস তার উথিত পুংদণ্ডটা দিয়ে তাকে আঘাত করছে। বেনিটোর শরীর, আহা পৌরুষের প্রতীক। সে আরও কাছে এগিয়ে এল। তার নিতম্ব দেশ সামনে এনেছে। সে এবার আঘাত করবে। সামনে এবং পিছনে এগিয়ে যাবে। কিন্তু, এটা কেন হল, আমি কেন তাকে হত্যা করলাম? তিনি ভাবলেন।

লুসিয়া চোখ খুললেন। কঁপছেন, চারপাশে তাকালেন। বেনিটো এখানে নেই। তিনি একটা অরণ্যে, শিপিং ব্যাগের মধ্যে। কিছু তাকে আঘাত করছে। কী? লুসিয়া ভাবতে পারলেন না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তিনি ওঠার চেষ্টা করলেন। এটা কী? পুংদণ্ডের মতো শক্ত? শেষ অব্দি এটা তার হাতের মুঠোয় এল। এ কী? তিনি অবাক হলেন। সিস্টার থেরেসা কোথায়? উনি চলে গেছেন। লুসিয়া অন্ধকারে তাকালেন। মনে হল, টমাস সানজুরো এখনও জেগে আছেন, একটু দূরে। রুবিও কোথায়? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে।

এবার পালাতে হবে।

তখনই? তখনই কী যেন ঘটে গেল। মনে হল পৃথিবী যেন ভেঙে পড়েছে।

কর্নেল সোসটেলোর সাথে কথা বলা শেষ হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে আদেশ দিয়েছেন, এখনই র‍্যামন আকোকা এখানে চলে আসবেন। জাইমে মিরো এবং তার চার সিস্টারকে পাওয়া গেছে। ঈশ্বর পরম করুণাময়। এবার শুরু হবে আমার আসল কাজ। কিন্তু আমি একাই সব সফলতা অর্জন করব। কর্নেল সোসটেলো ভাবলেন, আকোকা নাম কিনবেন, আমি চেয়ে চেয়ে দেখব। না, এটা আর হতে দেব না।

তিনি তার অধীনস্থ কর্মচারীদের আদেশ দিলেন। বললেন- কাউকে বন্দী করে এখানে আনবে না। মনে রেখো তোমরা, সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়াইতে নেমেছ। দরকার হলে গুলি করে দিও।

মেজর পেনটে বললেন– কর্নেল, মিরোর সাথে কয়েকজন সেবিকা আছেন। আমরা কি তাদেরও হত্যা করব?

-হ্যাঁ, এক্ষেত্রে কোনো সুযোগ দিও না।

কার্ল সোসটেলো বাবোজনকে নির্বাচিত করলেন। এক্ষুনি অভিযান শুরু হবে। সকলের হাতে আধুনিক অস্ত্র। অন্ধকারের বুকে তারা এগিয়ে চলেছেন। কোনো শব্দ করছেন না। পাহাড়ি পথ ধরে। চাঁদ হারিয়ে গেছে, মেঘের আড়ালে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা কীভাবে দেখব।

কর্নেল সোসটেলো চিৎকার করলেন এবার অস্ত্র ফেলে দাও। তোমরা ধরা পড়ে গেছে।

আওয়াজ শোনা গেল বুলেট বর্ষণ শুরু হোক।

একডজন অটোমেটিক অস্ত্র চিৎকার করল।

টমাস সানজুরো কখনও সুযোগ নেন না। মেশিনগান থেকে বুলেট ছুটে এসেছে। তাঁকে আঘাত করেছে। তিনি গড়িয়ে গেলেন। রুবিও আরজানো বসেছিলেন এককোণে। সানজুরোকে পড়তে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, এবার কিছু একটা করতে হবে। তিনি দেখলেন, লুসিয়া ছ ফুট দূরে।

সিস্টার থেরেসা কোথায়? উনি জানতে চাইলেন

উনি চলে গেছেন।

রুবিও বললেন- এখানে থাকুন।

লুসিয়ার হাত ধরলেন। অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে গেলেন। দূর থেকে আরও দুরে। একটির পর একটি বুলেট বর্ষণ। আলোর ঝলকানি। কিছুক্ষণ বাদে লুসিয়া এবং রুবিও ঘন অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তখনও তারা উর্বশ্বাসে ছুটছেন।

-সিস্টার, আমাকে শক্ত করে ধরে থাকুন।

পেছনে সৈন্যরা ছুটে আসছে, বুনো কুকুরের মতো। শব্দ মরে গেল। এখন বোধহয় আর কেউ আসতে পারবে না। চাপ চাপ অন্ধকার।

লুসিয়া থেমে গেলেন। রুবিও থেমে গেছেন।

–আমরা বোধহয় নিরাপদ আশ্রয়ে এসেছি। কিন্তু এখনও ছুটতে হবে।

লুসিয়ার নিঃশ্বাস ঘন হয়েছে।

–আপনি কি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেবেন?

লুসিয়া বললেন না। তাঁর সব শক্তি শেষ হয়ে গেছে। তবে মন বলছে পালাতে হবে। তিনি বললেন, আমি ভালোই আছি, আগে এখান থেকে পালাই।

.

কর্নেল সোসটেলোকে এবার অপমানের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। একজন সন্ত্রাসবাদী মরে গেছে, কিন্তু কেউ জানে না কজন পালিয়েছে। জাইমে মিরোকে ধরা সম্ভব হয়নি।

একজন মাত্র সিস্টার ধরা পড়েছেন। ধরা পড়েছেন নয়, তিনি নিজেই এসেছেন। কর্নেল আকোকার কাছে এই খবর গেলে কী হবে? না, ভাবতে কিছুই ভালো লাগছে না।

.

অ্যালান টাকারের ফোন, এলেন স্কটকে। আগের থেকে আরও বিরক্তিকর।

–আমি একটা খবর পেয়েছি, খবরের কাগজের ফাইল দেখতে দেখতে। এই খবরটা শুনলে আপনি অবাক হবেন কি?

-কী খবর?

টাকার বললেন– যখন প্লেন দুর্ঘটনা হয়েছিল, তখন থেকেই এই মেয়েটি নিখোঁজ, তাই তো?

ওদিকে নীরবতা।

উনি বলতে থাকেন যে প্লেন দুর্ঘটনায় আপনার ভাসুর মারা যান, তার স্ত্রী এবং প্যাট্রিসিয়া নামের মেয়েটি।

আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হচ্ছে।

এলেন স্কট বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। এটা বলা উচিত ছিল। আপনি ফিরে এলে আমি সব কথা বলব। আপনি কি মেয়েটির সম্পর্কে আর কোনো খবর পেয়েছেন?

না, কিন্তু আশা করি সে আর বেশি দিন আমার চোখের আড়ালে থাকতে পারবে না। সমস্ত দেশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

–তার কোনো খবর পেলেই আমাকে জানাবেন, কেমন।

লাইনটা মরে গেল। অ্যালান টাকার অনেকক্ষণ বসে রইলেন। মৃত টেলিফোনটার দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলা খুবই শান্ত স্বভাবের। তিনি ভাবলেন। তা হলে? আমি যদি ওনার পার্টনার হই, তাহলে কেমন হয়?

এলেন স্কট ভাবলেন লোকটাকে না পাঠালেই ভালো হত। এখন যে করেই হোক ওকে বারণ করতে হবে। কী করা যায়? মেয়েটির এখন কী হয়েছে? একজন সিস্টার?

ইনটারকম শব্দ করল।

মিসেস স্কট, আপনাকে এখনই বোর্ড রুমে আসতে হবে।

আমি এখনই আসছি।

.

লুসিয়া এবং রুবিও অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ ছুটছিলেন। এদিক-ওদিক করে। গাছের আড়াল দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত রুবিও বললেন– এবার আমরা থামতে পারি। ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না।

পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে ওঁরা চলে এসেছেন। ঘন অরণ্য। লুসিয়া মাটিতে বসে পড়লেন। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। এখনও মনের ভেতর চিন্তা। কী করবেন? ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। লুসিয়া ভাবলেন, এখনও তিনি বেঁচে আছেন, কারণ পাশে এই রুবিও আছেন।

লুসিয়ার দিকে তাকালেন রুবিও। বললেন– সিস্টার, বাকি রাতটুকু এখানেই কাটাতে হবে।

লুসিয়া বোধহয় তাই চাইছিলেন। এখন একটু বিশ্রাম দরকার।

রুবিও বললেন- ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দৌড় শুরু করতে হবে।

হঠাৎ লুসিয়ার মনে হল, পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।

রুবিও বললেন আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। দেখা যাক কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা। আপনি কি এখানে একা থাকতে পারবেন?

–হ্যাঁ, থাকতে পারব।

বড়ো চেহারার মানুষটা অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।

–ভয় পাবেন না, আমি জানি, এত বছর কনভেন্টে থাকার পর বাইরে এলে আপনার কেমন লাগবে। সব কিছু অবাক বলে মনে হবে।

লুসিয়া বললেন– আমি ভালো থাকার চেষ্টা করব। আমার জন্য চিন্তা করবেন না।

রুবিও মন্তব্য করেছিলেন আপনি খুবই সাহসী কন্যা সিস্টার। আমি এখনই আসছি।

রুবিওর শরীরটা গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল। এখনই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হয় পালাতে হবে, কাছাকাছি শহরে পৌঁছোতে হবে। ওই সোনার ক্রশটা বেচতে হবে। পাশপোর্ট তৈরি করতে হবে। যথেষ্ট টাকা হাতে নিয়ে সুইজারল্যান্ডে যেতে হবে। অথবা? এই লোকটার সঙ্গে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত লুসিয়া ভাবলেন, দ্বিতীয় পন্থাটাই গ্রহণ করা উচিত।

অরণ্যের মধ্যে আর্তনাদ। মানুষের, নাকি অন্য কারোর? একটা শব্দ, দেখা গেল রুবিও আরজানো, কত কী নিয়ে এসেছেন তিনি। তা হলে? টমেটো, আঙুর ফল, আপেল।

রাতের খাবার, খুব একটা খারাপ নয় বলুন? অন্ধকারের মধ্যে রান্নার ঝামেলা নিতে হচ্ছে না।

লুসিয়া তাকালেন সত্যি সত্যি ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার।

.

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তারা গাছের তলায় বসলেন। রুবিও কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। লুসিয়া শুনছিলেন। তাঁর মন তখন চিন্তাচ্ছন্ন।

–সিস্টার, দশ বছর ধরে আপনি কনভেন্টে আছেন।

–কী বলছেন?

দশ বছর?

–হ্যাঁ।

–তাহলে বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না!

–না।

দশ বছরে পৃথিবী অনেকটা পাল্টে গেছে।

–সত্যি!

–গত বছর ফ্রাঙ্কো মারা গেছেন।

–আমি বিশ্বাস করি না।

–বিশ্বাস করুন। দুজন মানুষ চাঁদের বুকে পদার্পণ করেছেন।

লুসিয়া অবাক হবার ভান করলেন– কী যেন নাম? নীল আর্মস্ট্রং, আর কে একজন?

–তারা দুজনেই উত্তর আমেরিকার। শব্দের থেকে বেশি জোরে ছুটতে পারে এমন ট্রেন আবিষ্কৃত হয়েছে।

–অবিশ্বাস্য। আমি কনকর্ড বিমানে চড়ব, লুসিয়া ভাবলেন।

রুবিওর মনে তখন শিশুর কৌতূহল। তিনি সবকথা গড়গড় করে বলে চলেছেন।

–পোর্তুগালে বিপ্লব হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিকসনের সাথে একটা কলঙ্ক জড়িয়ে গেছে। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

লুসিয়া ভাবলেন, রুবিও লোকটা সত্যি চমৎকার।

রুবিও ডুকাডো সিগারেটে আগুন দিলেন। স্পেন দেশের বিখ্যাত তামাক।

–আপনার সামনে আমি সিগারেট খাচ্ছি, আপনি এতে কিছু মনে করছেন না তো সিস্টার?

লুসিয়া বললেন- না-, মনে করার কী আছে।

আলো জ্বলে উঠেছে। সিগারেট খাবার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল।

–আমি একটা সিগারেট খেলে কি আপনি আপত্তি করবেন?

অবাক হয়ে রুবিও তার দিকে তাকালেন– সত্যি আপনি সিগারেট খাবেন?

-দেখব কেমন খেতে? লুসিয়া জবাব দিলেন।

–আচ্ছা, আমি একটা দিচ্ছি।

প্যাকেটটা সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন। লুসিয়া একটা সিগারেট বের করলেন। ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিলেন। রুবিও আগুন জ্বেলে দিলেন। লুসিয়া অনেকক্ষণ ধরে স্বাদ গ্রহণ করলেন। আহা, ভালো লাগছে।

রুবিও অবাক হয়েছেন। ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছেন।

লুসিয়ার কাশি এল। ইচ্ছে করেই কাশতে হচ্ছে তাকে।

–এই হল সিগারেট, তাই তো?

–এটা আপনার ভালো লাগছে?

–ভালো লাগছে না। তবে কেমন একটা ঝিমঝিমে অনুভূতি।

আর একবার সিগারেট টানলেন তিনি। হায় ঈশ্বর, কতদিন এই বস্তুটার সন্ধান পাইনি আমি। কিন্তু এখন আমাকে আরও ভালো অভিনয় করতে হবে। যাতে রুবিওর মনে কোনো সন্দেহ না জাগে। তিনি আগুন নিভিয়ে দিলেন। তারপর? কত কথাই মনে পড়ে

গেল তার। সত্যি পৃথিবীটা দ্রুত পালটাচ্ছে। তিনি জানেন না মেগান আর গ্রাসিলা এখন কী করছেন? সিস্টার থেরেসার কী হয়েছে? তাকে কি সৈন্যরা ধরে নিয়েছে?

লুসিয়ার চোখে আগুন জ্বলে উঠল মনে হচ্ছে, একটু ঘুমোলে ভালো হত।

–আপনি ঘুমোন, আমি পাহারা দেব।

–অনেক ধন্যবাদ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লুসিয়া ঘুমিয়ে পড়লেন।

রুবিও তার পাশে বসে ভাবছেন– এমন মহিলার সাথে কখনও দেখা হয়নি। জীবনটাকে উনি ভগবানের চরণে উৎসর্গ করেছেন, আবার ওনার মধ্যে এত পার্থিব অনুভূতি। এই রাতে উনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। নানা, উনি একজন বিশেষ মহিলা, রুবিও ভাবলেন। আহা, লিটল সিস্টার অফ জেসাস!

.

২০.

কর্নেল সোসটেলো দশ নম্বর সিগারেটটি ধরালেন। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। খারাপ খবর বাতাসের বুকে ভর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বেশ কয়েক বার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। র‍্যামন আকোকাকে টেলিফোনে পাওয়া গিয়েছিল। র‍্যামন বলেছিলেন, কর্নেল গত রাতে টেরারিস্ট ক্যাম্পের ওপর আঘাত হানা হয়েছিল। আমি জানি, ওখানে জাইমে মিরোও ছিলেন। আপনিও নিশ্চয়ই খবরটা জানতেন।

ভয়ংকর নীরবতা।

জাইমেকে ধরা কি সম্ভব হয়েছে?

–না।

–আপনি বুঝতে পারছেন, আমার সাথে আলোচনা না করে কেন এই অপারেশনটা করলেন?

হাতে সময় ছিল না।

–কিন্তু জাইমে তো পালিয়ে গেলেন।

র‍্যামন আকোকার কণ্ঠস্বরে রাগ এবং বিরক্তির সংমিশ্রণ কে আপনাকে এইভাবে কাজটা করতে বলল?

কর্নেল সোসটেলো আমতা আমতা করতে থাকেন আমরা একটা নানকে ধরে ফেলেছি। তিনি পথ দেখিয়ে চলেছিলেন। একজন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে।

–বাকিরা তো পালিয়ে গেছে?

–হ্যাঁ, কর্নেল।

–ওই ভদ্রমহিলা এখন কোথায় আছেন? ওনাকেও কি আপনারা ছেড়ে দিয়েছেন, নাকি?

কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ আভাস।

না, কর্নেল। সোসটেলো জবাব দিলেন। তাকে ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে। আমরা তাকে নানা প্রশ্ন করছি।

–না, এখন কোন প্রশ্ন করবেন না। আমি যাচ্ছি, একঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

রিসিভার নামিয়ে রাখা হল।

.

ঠিক এক ঘণ্টা বাদে কর্নেল র‍্যামন আকোকা ক্যাম্পে পৌঁছে গেলেন। সিস্টার থেরেসা সেখানে বসেছিলেন। তার চারপাশে অনেক পুলিশ এবং গোয়েন্দার ভিড়।

কর্নেল আকোকা আদেশ দিলেন- এখুনি ওই সিস্টারকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

সিস্টারকে হেডকোয়াটার টেন্টে নিয়ে যাওয়া হল। কর্নেল আকোকা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কর্নেল হেসে অভ্যর্থনা জানালেন।

–আমি কর্নেল আকোকা।

যাক শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে দেখা হল। ভগবান এ কথাই বলেছেন।

ঘাড় নেড়ে কর্নেল জানতে চাইলেন- ভগবান? বসুন সিস্টার।

সিস্টার বলতে পারছেন না, উত্তেজনা এবং উৎসাহে থরথর করে কাঁপছেন। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তো?

–হ্যাঁ, আমরা দুজনেই দুজনকে সাহায্য করব। কর্নেল আশ্বস্ত করলেন, আপনি আভিলার অ্যাবে সিস্টারসিয়ান থেকে পালিয়ে এসেছেন। তাই তো? আমি কি সত্যি বলছি?

হ্যাঁ, ঘটনাটা সাংঘাতিক। তারা আমাদের আক্রমণ করেছিল।

আবার সেই গল্প, অন্য কথা বলতে হবে।

সিস্টার, আপনি এখানে কী করে এলেন?

ভগবান আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে চাইছেন।

আকোকা শান্তভাবে বললেন কেউ কি আপনাকে এখানে এনেছে সিস্টার?

–হ্যাঁ, ওরা আমাকে অপহরণ করেছিল, আমি ওদের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসেছি।

–আপনি কর্নেল সোসটেলোকে বলেছেন সবকিছু। তাই তো?

–হ্যাঁ। এইসব ঘটনার অন্তরালে রাউল আছে। সে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল।

–আমরা জাইমে মিরো নামে একজন সন্ত্রাসবাদীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আপনি কি তাকে দেখেছেন?

সিস্টার কেঁপে উঠলেন– হ্যাঁ, তার সঙ্গে...

কর্নেল সামনে ঝুঁকে পড়লেন এখন বলুন, কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে?

মনে হচ্ছে তারা ইজের অভিমুখে চলেছেন।

আকোকা অবাক হয়ে গেলেন– ইজে? সেটা তো ফ্রান্সে?

এবার থেরেসার কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা–হ্যাঁ, মনিকা রাউলকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। রাউল আমাকে কিডন্যাপ করার জন্য তোক পাঠিয়েছে। ওই বাচ্চাটার জন্য।

অধৈর্য ক্রমশ বাড়ছে মিরো এবং তার লোকেরা উত্তর দিকে চলেছে। ইজে হল পুবে।

–আপনি আমাকে রাউলের কাছে নিয়ে যাবেন না। আমি তার মুখ দেখতে চাইছি না। আমি কী বলছি বুঝতে পারছেন তো?

কর্নেল আকোকা বলে উঠলেন- কোন্ হতচ্ছাড়া রাউলের কথা আপনি বলছেন? আমি জাইমে মিরো সম্পর্কে আগ্রহী।

আমি তো আপনাকে বলেছি, তিনি এখন ইজে আছেন। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

–আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আমার মনে হচ্ছে আপনি মিরোকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। আমি আপনাকে আঘাত করব না। কিন্তু আবার বলছি, বলুন জাইমে মিরো কোথায়?

সিস্টার থেরেসা অসহায়ের মত তাকালেন- আমি জানি না, তিনি ফিসফিস করে বললেন, সত্যি আমি জানি না।

একটু আগে আপনি বললেন, উনি ইজে আছেন।

কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য।

–হ্যাঁ, ভগবান আমাকে তাই বলেছেন।

–অনেক হয়েছে, এই ভদ্রমহিলা হয় মিথ্যে কথা বলছেন, অথবা বোকা গবেট।

তিনি প্যাট্রিসিওর দিকে তাকালেন। বললেন- এই সিস্টারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এনাকে এখনই কোয়াটার মাস্টারের টেন্টে নিয়ে যাও। দেখো তো, তোমরা আসল কথাটা বের করতে পারো কিনা।

–আমরা এখনই যাচ্ছি কর্নেল।

প্যাট্রিসিও কাজ করতে শুরু করলেন। কনভেন্ট আভিলাতে তিনি গিয়েছিলেন। মনে মনে অনুতপ্ত, তার একটু ভুলের জন্য চারজন সিস্টার পালাতে পেরেছিলেন। এখন সেই ভুলটা শোধরাতে হবে। প্যাট্রিসিও ভাবলেন।

তিনি সিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন আমার সঙ্গে আসুন সিস্টার।

–ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আমরা কি এখান থেকে চলে যাব? তুমি আমাকে ইজে পৌঁছে দেবে না তো?

–না, আপনি ইজে যাবেন না।

কর্নেল ঠিক কথা বলেছেন- এই মেয়েটি আমাদের সাথে বুদ্ধিমানের খেলা খেলতে চাইছে। ঠিক আছে আমরা ওকে নতুন খেলা শেখাব।

কোয়াটার মাস্টারের টেন্টে সকলে পৌঁছে গেলেন।

প্যাট্রিসিও বললেন- সিস্টার, আপনি এদের সঙ্গে যান, ওরা আপনাকে স্বর্গের পথ দেখাবে।

চারপাশে পোশাক পরা সৈনিকের দল। একজন বলল, সিস্টার, সত্যিই কি আপনি ধর্ম্যাজিকা, আপনাকে তো ডার্লিং বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে।

ডার্লিং? রাউল আমাকে এইভাবে সম্বোধন করতো, তার মানে? এ কী রাউল নাকি?

দুজন সৈন্য জোর করে সিস্টারকে খাটে শুইয়ে দিয়েছে। একজন হাসতে হাসতে বলল, সিস্টার, ওপর থেকে দেখে আপনাকে মোটেই সুন্দরী বলে মনে হয় না। তবে আপনার পোশাক খুবই সুন্দর, দেখি তো ল্যাংটো করলে আপনাকে কেমন দেখায়।

সিস্টার থেরেসা বাধা দিতে পারলেন না। তিনি একমনে ভগবানকে ডাকছেন। ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দেওয়া হল তার ওপরের পোশাক। অন্তর্বাসও খুলে ফেলে দেওয়া হল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে উনি খাটে শুয়ে আছেন। একজনের পর একজন এসে তার পুংদণ্ড • ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যন্ত্রণায় সিস্টার চিৎকার করছেন। কিন্তু কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তার কেবলই মনে হয়েছিল, এখনই বোধহয় আকাশ থেকে বজ্রপাত হবে। ভূকম্পনে পৃথিবী কেঁপে উঠবে। শয়তানদের মৃত্যু হবে। বাস্তবে তার কিছুই হল না।

তবে শেষ পর্যন্ত সিস্টার উঠেছিলেন, অরক্ষিত একটি পিস্তল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। শুয়ে থাকা অবস্থাতে, কোনোমতে, তারপর? এলোপাথারি কিছু গুলি, কয়েকজনের মৃত্যু হল। সৈন্যরা চেষ্টা করেছিল সিস্টারকে গুলি করে মেরে ফেলতে। সম্ভব ছিল না। কারণ তখনও সিস্টারের ওপর এক উন্মত্ত সৈনিক চেপে বসেছে। ধর্ষণ করছে ইচ্ছে মতো।

শেষ পর্যন্ত সিস্টার এবং ওই ধর্ষক দুজনের মৃত্যু হল, পাশাপাশি শুয়ে থাকলেন তাঁরা দুজন!

৫. জাইমে মিয়োর ঘুম

২১.

জাইমে মিয়োর ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি বুঝতে পারছেন, কিছু একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। মেগান কি করছে? প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছেন কি?

সানসি বাসস্ট্যান্ডে অতি দ্রুত পৌঁছোতে হবে। কর্নেল আকোকার সৈন্যরা চারপাশ ঘিরে ধরেছে।

তিনি মেগানের দিকে হেঁটে গেলেন, তার কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা।

–আমি বলেছিলাম ঘুমিয়ে নিতে। আপনি কেন উঠে দাঁড়িয়েছেন?

মেগান বললেন, আমি যদি কিছু করে থাকি তার জন্য দুঃখিত।

সিস্টার, কোনো রকমে আমি রাগ চেপে আছি। আপনার আচরণ আমাকে অবাক করে দিচ্ছে।

মেগান বুঝতে পারছেন না কী বলবেন।

জাইমের মনে পড়ে গেল অনেক কথাই, তখন তিনি এক ছোট্ট ছেলে ছিলেন। এইসব স্মৃতি কি এখনও আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করবে।

.

বোমাবর্ষণের শব্দে মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। তখন তিনি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলেন।

বাবা বলেছিলেন, জাইমে উঠে পড়, তাড়াতাড়ি। গুরমিকা শহরটি হল বাস্তবের শক্ত ভূমি। জেনারেল ফ্রাঙ্কো এই শহরটিকে ধ্বংস করতে চাইছেন।

প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। ইটালীয় বিমানগুলি আকাশে ঘোরা ফেরা করছে। জাইমের মা, বাবা এবং দুজন দিদি অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

জাইমের বাবা বলেছিলেন- আমরা চার্চে যাব। ওরা চার্চে বোমা ফেলবে না।

তিনি ঠিকই বলেছিলেন, সবাই জানতেন চার্চে গেলে জীবন বাঁচানো যেতে পারে। মিরো পরিবার সেদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। চারপাশে ভয়ার্ত মানুষের মুখের মিছিল।

ছোট্ট ছেলে হিসেবে জাইমো বাবার হাত চেপে ধরেছিলেন। এক আতঙ্কঘন পরিবেশ।

আমরা যুদ্ধে চলেছি বাবা?

-না জাইমে, এটা খবরের কাগজের প্রচার। সরকার আমাদের স্বাধীনতা দেবে না, লড়াই চলতেই থাকবে। ভাবতে অবাক লাগে, স্পেনের বাসিন্দা স্পেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে।

জাইমে তখন খুবই ছোটো, এসব বোঝার মত বুদ্ধি ছিল না তার। লড়াই শুরু হয়ে গেছে, একদিকে প্রজাতন্ত্রী সরকার অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা। এই লড়াইতে কতজনকে প্রাণ দিতে হবে।

ফ্রাঙ্কোর দলবল ইতিমধ্যেই গণতন্ত্রপ্রেমীদের হারিয়ে দিয়েছে। এখন জাতীয়তাবাদীরা কোনোরকমে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফ্রাঙ্কো চাইছেন বিরুদ্ধ পক্ষকে পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে দিতে।

জাইমের বাবা ছিলেন অহিংসাত্মককারী। হিংসাকে তিনি ঘেন্না করতেন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব এমন কথাও তিনি বলতেন।

কিন্তু, দিনকাল ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ঈশ্বর কি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন?

চারপাশে উন্মত্ত সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। জাইমের বাবা হঠাৎ বুঝতে পারলেন, একঝাঁক বুলেট এসে তাকে আক্রমণ করেছে। কথা বলার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তার শরীরটা নরকের অন্ধকারে মিশে গেল।

সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু, বুলেটের শব্দ। আর্তনাদ। জাইমে চোখ খুললেন। অনেকক্ষণ সেখানে শুয়েছিলেন। বাবার মৃতদেহ তার ওপর পড়ে আছে আহা বুঝি একটা উষ্ণ কম্বলের আবরণ। মা বাবা বোনেরা কেউ বেঁচে নেই। আরও অনেকের মৃত্যু হয়েছে।

রাত ফুরিয়ে আসছে, জাইমে এখন কোথায় যাবেন? ওই শহর থেকে এসে তিনি পৌঁছেছিলেন বিলবাওতে, পি টি এন এ নামে একটি গোপন সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন।

রিক্রুটিং অফিসার তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তুমি তো নেহাত দুধের শিশু, এখন তোমার স্কুলে যাওয়া উচিত।

জাইমে বলেছিলেন, আপনি কি জানেন ওরা আমাদের সকলকে মেরে ফেলেছে?

জাইমে আর পেছন ফিরে তাকাননি। অগ্নিমন্ত্রে শপথ নিয়েছিলেন। যে করেই হোক এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই হবে।

.

ধীরে ধীরে তিনি কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে উঠলেন। তিনি জানেন না শেষ পর্যন্ত কী লেখা আছে ভাগ্যে। তবে তাকে কাজ করতেই হবে।

অরণ্য পথে রাত্রি নেমেছে। আকাশে চাঁদের নিষ্প্রভ আলো। শহরের পথ ধরা সম্ভব হচ্ছে না। সর্বত্র বিপদের পদচিহ্ন। জাইমে আর মেগানের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। ফেলিক্সের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছেন। অতীতের অভিযানের গল্প।

মেগান ভাবলেন, মেননেভিয়াতে আমাকে কে পৌঁছে দেবেন? একমাত্র এই মানুষটি পারেন।

সিস্টারের জন্য জাইমের মনে মাঝে মধ্যে করুণা জেগে ওঠে। আহা, সিস্টার সত্যিই অসহায়।

অ্যাম্পায়রা জিরনের কথা মনে পড়ছে। একরাতে জাইমে তার কাছ থেকে অশেষ সুখ পেয়েছিলেন।

অ্যাম্পায়রা সত্যিই এক কর্তব্যনিষ্ঠ মহিলা। জাইমে ভাবলেন।

জাতীয়তাবাদী সৈন্যরা অ্যাম্পায়োর গোটা পরিবারকে পৃথিবী থেকে মুছে দিয়েছে। অ্যাস্পারো এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন কিন্তু, মনের ভেতর আবেগ রয়ে গেছে।

ভোর হবার আগে, তারা সালামানতার কাছে পৌঁছে গেলেন, লিওটমেস নদীর ধারে।

ফেলিক্স মেগানকে বললেন- স্পেনের নানাপ্রান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে আসে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নাম আছে।

জাইমে কিছুই শুনছেন না, তিনি-পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবছেন। তিনি ভাবছেন, যদি আমি একজন শিকারী হতাম, কোথায় শিকারের সন্ধানে যেতাম?

তিনি ফেলিক্সকে বললেন- আমরা সালামানতে ঢুকব না। শহরের বাইরে কোথাও থামতে হবে।

তাঁরা পানাডোরে পৌঁছে গেলেন। একটা ছোট্ট সরাইখানা, শহরের বাইরে। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। চারপাশে গুপ্তচর ছড়ানো আছে।

অ্যাম্পায়রা ডিওন হাসি মুখে বললেন– ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা পৌঁছে গেলাম।

মেগান জবাব দিয়েছিলেন- হ্যাঁ, মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমরা জয়যুক্ত হব।

দশমিনিট কেটে গেছে।

জাইমে অ্যাম্পায়োকে বললেন- তুমি এবং সিস্টার একটা ঘরে থাকো। ফেলিক্স আমার সঙ্গে থাকবে।

অ্যাম্পায়রা বলেছিলেন- না আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

-আমি যা বলছি তাই করো, এই সিস্টারের ওপর কড়া নজর রেখো।

সিস্টারকে নিয়ে অ্যাম্পারো একটা ঘরে চলে গেলেন।

মেগান চারপাশে তাকালেন। ঘরটা সুন্দর। অ্যাম্পায়োর মনে রাগ হয়েছে, মেগান থাকার জন্যই তার স্বপ্ন সফল হল না।

অ্যাম্পায়ো মেগানের দিকে তাকালেন। তারপর হেসে ফেললেন। সত্যিই তো, যে সেলে সিস্টার বসবাস করেছেন, তার তুলনায় এটা তো স্বর্গ।

অ্যাম্পারো পোশাক খুলতে শুরু করলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে এই প্রথম অ্যামাপরাকে ভালোভাবে দেখলেন মেগান। আঃ, মহিলা সত্যিই আকর্ষণীয়া। সবদিক থেকে। লাল

চুলের বাহার। সাদা ধবধবে চামড়া, দুটি স্তন যেন উপচে পড়ছে, সরু কোমর, নিতম্ব বেশ উঁচু, হাঁটলে লীলায়িত ছন্দ জাগছে।

অ্যাম্পায়ো দেখতে থাকেন সিস্টার, আপনি আমাকে কিছু বলবেন? আপনি কেন কনভেন্টে যোগ দিয়েছেন?

ভগবানের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করব বলে।

না, এসব মিথ্যে কথা। অ্যাম্পায়ো সেই অবস্থায় বিছানাতে গিয়ে বসলেন, তিনি বললেন- আপনি ওই খাটে শুয়ে পড়ুন। আমার মনে হয় না কনভেন্ট থাকার একটা আদর্শ জায়গা।

মেগান হাসলেন- যার যা ধারণা।

জাইমে বিছানাতে বসে আছেন। ফেলিক্স কিছু বলার চেষ্টা করছেন। ফেলিক্সের বন্দুকটা ছোটো, টেবিলে রাখা আছে।

ফেলিক্স বললেন- এর পরবর্তী পদক্ষেপ?

জাইমে কাঁধ ঝাঁকানি দিলেন- জানি না, আগে সিস্টারকে এখান থেকে বিদায় করতে হবে, তারপর ভাবব।

জাইমে অ্যাম্পায়োর কথা ভাবছিলেন, অ্যাম্পায়োর সাহচর্য তিনি এখন কামনা করছেন। ওই সিস্টার না থাকলে স্বপ্ন সফল হত। কিন্তু কিছু করা বাকি থেকে গেছে কী?

ম্যানেজার শান্তভাবে বসেছিলেন, নতুন অতিথিরা ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। তার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করেছে। তিনি একটা নাম্বারে ফোন করলেন।

জান্তব কণ্ঠস্বর শোনা গেল– পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

জাইমে মিরো এবং তার তিনজন অনুগামী এখানে এসেছেন। আসুন, সবকিছু সাজিয়ে রেখেছি।

.

২২.

পূর্বদিকে একটা জায়গা, আছে, বেনাফিল। লুসিয়া কারমাইন ঘুমিয়ে আছেন। রুবিও আরজানো তাকে দেখছেন। এই ঘুম এখন ভাঙাবে না। আহা, কী মধুর।

সকাল হয়েছে, এখন যেতে হবে।

রুবিও বললেন– সিস্টার লুসিয়া?

সিস্টার চোখ খুললেন

–আমাদের যেতে হবে।

সিস্টার আড়মোড়া ভাঙলেন। ব্লাউজের একটা বোম খুলে গেছে। স্তনের কিছুটা উন্মুক্ত। রুবিও তাকিয়ে থাকলেন।

না, মন থেকে এইসব চিন্তা দূর করতে হবে। কারণ লুসিয়া হলেন যিশুর পত্নী।

–সিস্টার?

কী?

–একটা কথা জিজ্ঞসা করব?

–বলুন।

–আপনি কি আমার হয়ে প্রার্থনা করবেন? আমি একজন ক্যাথোলিক।

কতদিন বাদে প্রার্থনা? রুবিও ভাবলেন। মাঝেমধ্যে মানুষ যে কী হয়ে যায়?

দুজনে কিছু খুচরো কথা হয়েছিল। তারপর? লুসিয়ার মনে হল, তিনি কেন জীবনটাকে ভালভাবে কাটাতে পারলেন না? অ্যানজেলো কারমাইনের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও?

মনে কত চিন্তা, ভগবান আমার জন্য কী সাজিয়ে রেখেছেন। লুসিয়া নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলেন। ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর, ভবিষ্যতে কী হবে তা কেউ জানে না। লুসিয়া বলতে থাকলেন, পুরোনো দিনের গল্প, কিছুটা মিথ্যে কিছুটা সত্যি।

রুবিও হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করলেন সিস্টার, আপনি আমাকে অবাক করছেন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবী সম্পর্কে আমরা কতটুকুই জানি।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, তারা এগিয়ে চলেছেন।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ফাঁকা কেবিনে এসে তারা দাঁড়িয়েছেন। টিনের ছাদে বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

ঝড় কী চলতে থাকবে?

–না, এটা ঝড় নয়, একে আমরা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি বলতে পারি। পৃথিবী আবার শুকনো হয়ে যাবে।

সত্যি? হ্যাঁ আমি একজন চাষীর ছেলে আমি সব জানি।

-সিস্টার, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে কি?

–কেন হবে না?

–সিস্টার, কনভেন্টে বসে আপনি ভগবানের কথা চিন্তা করতেন। তাই কি?

-হ্যাঁ।

সারা পৃথিবীটাই আমার কাছে একটা কনভেন্ট। ভেবে দেখুন তো, প্রতি মুহূর্তে কত অলৌকিক ঘটনাই না ঘটে যাচ্ছে। আমরা সবকিছু ভাবছি কি?

বৃষ্টি থেমে গেল।

–সিস্টার, এবার আমরা পথে নামব।

আমরা বায়ডরর কাছে পৌঁছে যাব। এবার আরমারডোর দিকে, তারপর লগরোনো। সেখানেই সাথীরা আসবেন।

লুসিয়া ভাবলেন, আমি তো যাব সুইজারল্যান্ডে, কবে? এবং কীভাবে?

ঝরনার শব্দ শোনা গেল। আহা, প্রকৃতি কত বিস্ময়কর। অসাধারণ দৃশ্য।

আমি চান করব, লুসিয়া বললেন, কত বছর বাদে তিনি এইভাবে চান করবেন।

রুবিও জানতে চাইলেন–এখানে?

না, রোমে নয়, হা- এখানে প্রকাশ্যে। সিস্টার বললেন।

-সাবধানে করবেন, রাস্তাঘাট পিছল হয়ে গেছে।

–ভয় পাবেন না, লুসিয়া দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে থাকলেন—

–আমি চলে যাচ্ছি, আপনি পোশাক খুলে চান করুন।

কাছাকাছি থাকবেন, লুসিয়া বললেন, বুনো জন্তু থাকতে পারে, মনে মনে ভাবলেন।

লুসিয়া পোশাক খোলার চেষ্টা করলেন। রুবিও কয়েক গজে দূরে চলে গেলেন। পেছন ফিরে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন- বেশি দূর যাবেন না সিস্টার, নদীটার মতিগতি ভালো নয়।

লুসিয়া কিছু দূর চলে গেলেন। আহা, সকালের শীতল বাতাস। নগ্ন শরীরকে কাঙ্খিত উপশম দিয়েছে। সবকিছু ভোলা হয়ে গেল, একপা একপা করে তিনি জলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সুশীতল পরিবেশ। তিনি দেখলেন, রুবিও অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি হাসলেন, অন্য কেউ হলে হয়তো চোরা চোখে এই নগ্ন শরীরটা দেখত। তিনি আরেকটু ভেতরে এগিয়ে গেলেন। পাহাড়কে অতিক্রম করে। আহা, এবার চানের আনন্দ।

জলধারা নেমে এসেছে। লুসিয়া দেখলেন, কিন্তু, নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। আর্তনাদ, তিনি পুড়ে গেছেন, বোল্ডারে মাথা ফেটে গেছে।

রুবিও ছুটে এসেছেন। কিন্তু, লুসিয়াকে দেখা গেল না, উন্মক্ত জলরাশি তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল!

.

২৩.

সালামানতার পুলিশ স্টেশন। সার্জেন্ট ফ্লোরিয়ান সামতিয়াগো ঘোরাঘুরি করছেন। তার হাত-পা কাঁপছে।

জাইমে মিরো এবং তিনজন অনুগামী, কখন আমরা বেরিয়ে পড়ব।

জাইমে মিরো, ধরতে পারলে পুরস্কার। ভাবতে ভাবতে কেমন করতে থাকেন তিনি।

জাইমে মিরো নামটা তার কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু জীবন বিপন্ন করে কী লাভ? অন্য কেউ এই ব্যাপারে অভিযান করুক, পুরস্কারের টাকাটা আমি যেন পাই।

কীভাবে এই বিষয়টা করা যেতে পারে? কর্নেল আকোকার নাম মনে পড়ে গেল। কর্নেলই এই ব্যাপারে ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন।

টেলিফোন ধরলেন, দশ মিনিট বাদে কর্নেলের সঙ্গে কথা হল।

সার্জেন্ট ফ্লোরিয়ান সামতিয়াগো, সালামানতার পুলিশ স্টেশন থেকে কথা বলছি। জাইমে মিরোকে পাওয়া গেছে।

কর্নেল র‍্যামন আকোকা-আপনি সুনিশ্চিত।

-হ্যাঁ, কর্নেল। তিনি পারাডর হোটেলে আছেন। শহরের বাইরে। সারা রাত সেখানেই থাকবেন। এই হোটেলের ম্যানেজার আমার কাকা। তিনি নিজে আমাকে ফোন করেছেন। মিরোর সাথে আরেক অনুগামী আছে, দুজন মহিলা।

–আপনি ঠিক বলছেন তো?

–হ্যাঁ, কর্নেল।

আকোকা বললেন আমার কথা শুনুন, আমি এখনই ওই হোটেলে যাব। আপনারা হোটেলের চারপাশে চলে যান। একঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছেচ্ছি। আপনি কিন্তু ঢুকবেন না। ঠিক বলছি তো?

-হা স্যার, আমি এখুনি বেরোচ্ছি। তিনি ইতস্তত করলেন। কর্নেল, পুরস্কারের টাকা।

–যখন আমরা মিলোকে ধরব, পুরস্কারের টাকাটা আপনিই পাবেন।

–কর্নেল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

সামতিয়াগো রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। পাশের ঘরে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, তার রক্ষিতা, তার ঘুম ভাঙিয়ে উঠিয়ে দেবে কি? না, পরে চমকে দেবেন।

এখন একটা কাজ করতে হবে। তিনি একজন পুলিশকে ডাকলেন।

–আমি বেরোচ্ছি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।

মনে মনে হাসলেন, অনেক অনেক টাকার মালিক হব আমি। কিন্তু আমাকে একটা নতুন গাড়ি কিনতে হবে, নীল রঙের গাড়ি। না, গাড়ির রং হবে সাদা।

.

আকোকা রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলেন। সময় ফসকে যাচ্ছে। মিরোর সাথে নিশ্চয়ই সশস্ত্র রক্ষী আছে, তা হলে?

ফোন করলেন, বললেন চব্বিশজন পুলিশকে তৈরি হতে বলুন। তাদের হাতে যেন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থাকে। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা সালামানতার দিকে যাত্রা করবো।

মিরোর এবার আর কোনো মুক্তি নেই। কর্নেল মনে মনে হাসলেন। কীভাবে এই অভিযানটা হবে তার ছক কষলেন। চারপাশে কর্ডন তৈরি করা হবে। হঠাৎ ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে।

.

পনেরো মিনিট কেটে গেছে, এবার যাত্রা শুরু হল।

.

সার্জেন্ট সামতিয়াগো পৌঁছে গেলেন বায়ডরের কাছে। কর্নেলের বিপদবাণী তিনি শোনেননি। তিনি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু, এখন দাঁড়িয়ে থাকলেন। রাত্রির বাতাস শীতল হয়ে উঠেছে। সামতিয়াগো ভাবলেন, টাকাটা আমার চাই। টাকার চিন্তা তাকে ক্ষয়িষ্ণুও করে রাখল।

র‍্যামন আকোকা এসে গেছেন, সামতিয়াগো ভাবলেন।

–আমি সার্জেন্ট সামতিয়াগো।

–কেউ কি সরাইখানা থেকে বেরিয়েছে?

না স্যার, ওরা সকলে ঘুমিয়ে আছে।

কর্নেল বললেন- এবার অভিযান শুরু করতে হবে।

সামতিয়াগো তাকিয়ে থাকলেন। কর্নেলের চোখে আগুন জ্বলছে। তারা সিঁড়ির মাথায় চলে গেলেন।

আকোকা বললেন দেখামাত্র গুলি করতে হবে।

কর্নেল, আমরা কি আদেশের অপেক্ষা করব?

–না, তোমরা কেউ জাইমেকে হত্যা কোরো না, এ কাজটা আমিই করব।

–বায়ডরের শেষ প্রান্তে দুটি ঘর, সেখানে মিরো আর তার অনুগামীরা আছেন। কর্নেল শান্তভাবে তাকিয়ে থাকলেন।

এবার শুরু হবে।

আগুন জ্বলে উঠল, দরজা ভেঙে ফেলা হল। ঘরের ভেতর সৈন্যরা ঢুকে পড়ল। — তাড়াতাড়ি, আকোকা চিৎকার করলেন।

কিন্তু কোথায়? প্রত্যেকটা দরজা ভাঙা হচ্ছে, জাইমে আর তার সঙ্গী সাথীদের কোথাও পাওয়া গেল না। কর্নেল হোটেল ম্যানেজারকে চেপে ধরলেন। লবিতে কেউ ছিল না। তিনি চিৎকার করলেন। ভীতুরা লুকিয়ে থাকে।

কর্নেল? একজন সৈন্য বলেছে। আকোকা দেখলেন, ম্যানেজারের মৃতদেহ পড়ে আছে। আর একটা চিহ্ন তার পিঠে– লেখা আছে আমাকে কেউ বিরক্ত করো না!

.

২৪.

রুবিওর মন আতঙ্কে ভরে উঠেছে। উচ্ছ্বসিত জলরাশি লুসিয়াকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যে তিনি ভাবলেন, এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। লুসিয়ার দেহের কিছুটা দেখা গেল। জলের ঢেউয়ে কাছে চলে এসেছে। রুবিও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অসম্ভব, তিনি নিজেই ভেসে যাচ্ছেন। লুসিয়ার শরীরটা দশ ফুট দূরে। মনে হচ্ছে যেন কয়েক মাইল। তিনি শেষবারের মতো চেষ্টা করেছিলেন। একটা হাত চেপে ধরলেন। মৃত্যু উপত্যকা।

রুবিও শেষ পর্যন্ত নদীর ধারে পৌঁছেছিলেন। তারপর? লুসিয়াকে টেনে এনে ঘাসের ওপর ফেলে দিলেন, কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। লুসিয়া অজ্ঞান হয়ে গেছেন, নিঃশ্বাস পড়ছে না। রুবিও জল বের করার চেষ্টা করলেন। বুকে হাত দিলেন। একটির পর

একটি মুহূর্ত কেটে গেল। মুখ দিয়ে হুড় হুড় করে জল বেরিয়ে এল। লুসিয়ার গোঙানি শোনা গেল। রুবিও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

রুবিও ধীরে ধীরে বুকে চাপ দিচ্ছেন। লুসিয়া কাঁপতে শুরু করেছেন। রুবিও কয়েকটা গাছের পাতা নিয়ে এলেন। চেষ্টা করলেন লুসিয়াকে উত্তাপ দিতে। রুবিও নিজেও ভিজে গেছেন। কিন্তু নিজের দিকে তাকাবার সময় কোথায়? তার কেবলই মনে হচ্ছে, সিস্টার লুসিয়া বুঝি মারা যাবেন। তিনি ওই উলঙ্গ শরীরটা শুকনো গাছের পাতা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করলেন। এখন মন থেকে বাসনা উধাও হয়ে গেছে।

দেবীর মতো চেহারা, ঈশ্বর, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এখন আমার মাথায় যেন কোন দুষ্টু বুদ্ধি না আসে।

লুসিয়া জেগে উঠলেন। এই ব্যবস্থা কাজে দিয়েছে। আমি কোথায়? আমি কি স্বর্গে পৌঁছে গেছি? আহা, এভাবে আমাকে আদর করো।

যখন লুসিয়া জলে পড়ে গিয়েছিলেন, তিনি হয়তো মরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন বেঁচে উঠেছেন।

কণ্ঠস্বর ভেসে এলসিস্টার, আমরা বেঁচে গেছি।

রুবিও চিৎকার করতে গিয়েছিলেন আতঙ্কে। লুসিয়া বললেন তাড়াতাড়ি।

এই পুরস্কারটা দিতেই হবে, লুসিয়া ভাবলেন।

রুবিও তখনও ইতস্তত করছেন তিনি বললেন সিস্টার।

লুসিয়া কোনো কথা বলছেন না। তিনি বুঝতে পারছেন, দুটি শরীর এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন শুধু আদর আর ভালোবাসা। মনের ভেতর উত্তেজনা জাগছে। জীবনের সুখী মুহূর্তগুলো ভেসে উঠেছে।

রুবিও প্রেম নিবেদন করতে জানেন। একাধারে কোমল এবং বন্য। অসাধারণ পৌরুষের অধিকারী। তারপর? খোলা আকাশের নীচে, নারী পুরুষের মিলন।

এই লোকটা কোনোদিন আমাকে ভালোবাসবে না। ভালবাসাকে আমি প্রত্যাখ্যান করি। এখন আমি শরীর চাইছি। কাঁচা মাংসের সমাহার। লুসিয়া ভাবলেন, রুবিও আরজানো, আপনাকে আমি মনে রাখব, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমি লুসিয়া কারমাইন, অ্যানজেলো কারমাইনের কন্যা।

রুবিও তখনও শক্ত করে লুসিয়াকে চেপে ধরে আছেন। তিনি বলতে থাকেন–লুসিয়া, আমার লুসিয়া।

তার চোখে ভালোবাসার আগুন। তার সমস্ত মনে ভালোবাসার বাজন। লুসিয়া তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার দেবী! তুমি আমার প্রতিমা।

লুসিয়া উঠে বসলেন- বললেন রুবিও, আমি একটা জিনিস ফেলে এসেছি, নদীর ধারে; তুমি নিয়ে আসবে কি? সোনার ক্রশ আর আমার জামাকাপড়।

–আমি এখনই আসছি।

লুসিয়ার চোখে মুখে শূন্যতা। কি যেন হয়ে গেছে। সোনার ওই ক্রশ? কোথায় গেল? ওটা না থাকলে আমি নিঃস্ব ভিখারী।

লুসিয়া দেখলেন, রুবিও ফিরে আসছে, তার হাতে ওই ক্রশ, লুসিয়া বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

রুবিও পোশাক তুলে দিলেন। সেদিকে তাকিয়ে লুসিয়া হেসেছিলেন– না, এগুলোর এখন আর দরকার নেই।

.

সুর্যের আলো, লুসিয়ার নগ্ন শরীরের সবখানে। অলসতা জাগছে মনে। উষ্ণ, রুবিওর আলিঙ্গনে তিনি এখন আবদ্ধ। আহা, তারা বোধহয়, এক শান্তি সমৃদ্ধ মরুদ্যানে পৌঁছে গেছেন। বিপদের কোনো চিহ্ন নেই।

লুসিয়া বললেন রুবিও, তোমার ফার্মের কথা বলল।

বিলবাও গ্রামের পাশে, আমরা বংশ পরম্পরা সেখানে ভূমি চাষ করি।

দুজনের কথা গম্ভীর হচ্ছে। একজন অন্যজনকে আরও বেশি ভালোবাসার চেষ্টা করছেন।

লুসিয়া একমুহূর্ত ভাবলেন, আমার দুই ভাই আর বাবা এখন কারাগারে।

লুসিয়া অনেক কিছু জানতে চাইছিলেন। পরিবারের সকলের কথা, কে কোথায় বাস করেন।

অন্তরঙ্গত জমে উঠেছে। তারপর? এবার যেতে হবে। সময় বয়ে চলেছে।

.

উত্তর-পূর্ব দিকে তারা হেঁটে চলেছেন। ডুরো নদীর প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেলেন। পাশে একটা পাহাড়ি টিলা। সবুজ গাছের সমারোহ। হিলিবা গ্রাম। পাহাড়ের পাদদেশে।

এখন দুজনের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব। পরবর্তী শহরের দিকে তারা এগিয়ে চলেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, ভালোবাসা জেগেছে। একে অন্যকে অধিকার করার চেষ্টা করছেন।

.

দীর্ঘ সেতু তার পার হলেন। ক্যাসটিলাতে পৌঁছে গেলেন। শহর দেখা যাচ্ছে। দোকান জেগে উঠেছে। লুসিয়া ভাবলেন, এবার কিছু খেলে কেমন হয় কোনো একটা হোটলে। তারা হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলেছেন।

একগ্লাস মদ, এখন জীবন দিতে পারে। জনাকীর্ণ পথ, রুবিও অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন।

একটা দরজা দেখা গেল। কালো চিহ্ন দেওয়া। লেখা আছে পোলিসিয়া। লুসিয়া সেদিকে তাকালেন। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত চলছে।

কাউন্টারে কে? এক মোদো মাতাল।

–আমি কিছু বিক্রি করব। লুসিয়ার কণ্ঠস্বরে কাঁপুনি।

তিনি ওই সোনার ক্রশটা বের করলেন। বললেন– আপনি কি এটা কিনবেন?

ভদ্রলোকের চোখে মুখে বিস্ময়।

–এটা কীভাবে এসেছে?

–আমার এক কাকা এটা আমাকে দিয়েছেন। উনি এইমাত্র মারা গেলেন।

ভদ্রলোক ক্রশের ওপর হাত রাখলেন। বললেন– এর জন্য আপনি কত চাইছেন?

দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পেস্তা।

না, এক লক্ষ পেস্তা দিতে পারি।

তাহলে আমার শরীরকে আমি বিক্রি করব।

–এক লক্ষ পঞ্চাশ?

–তাহলে তা গলিয়ে ফেলব। বাজারে সোনাটা বেচে দেব।

দু লক্ষ? এটাই আমার শেষ কথা।

লুসিয়া দোকানদারের কাছ থেকে সোনার ক্রুশটা নিয়ে নিলেন– আপনি কি আমাকে অন্ধ ভেবেছেন নাকি? কিন্তু আমি আপনার এই দরটা কিনতে পারি।

তিনি দেখলেন, দোকানদারের মুখে উত্তেজনা থরথর করে কাঁপছে একটা শর্ত আছে।

–সিনোরিয়া, কী শর্ত?

আমার পাশপোর্টটা চুরি হয়ে গেছে। আমাকে একটা নতুন পাশপোর্ট তৈরি করতে হবে। আমি এই দেশের বাইরে যাব, আমার বিধবা কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে।

ভদ্রলোকের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। উনি বললেন- ঠিক আছে আমি দেখছি।

এ ব্যাপারে আপনি কি আমায় সাহায্য করবেন? তাহলে ক্রুশটা আপনারই হবে।

একটি দীর্ঘশ্বাস না সিনোরিয়া, পাশপোর্ট তৈরি করা খুব একটা সহজ নয়। এখন কর্তৃপক্ষ অনেক সজাগ হয়ে গেছে।

লুসিয়া তাকালেন, কিছু বললেন না।

–আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।

ঠিক আছে সিনর, ধন্যবাদ।

লুসিয়া দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন আবার তার ডাক পড়ল।

–একটা কথা মনে পড়েছে, আমার এক মাসতুতো ভাই আছে, সে এইসব বেআইনী কাজ করে থাকে। আপনি বুঝতে পারছেন?

–হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

–আমি কি তার সঙ্গে কথা বলব? আপনার পাশপোর্ট কবে চাই?

–আজকেই।

–ঠিক আছে, দেখি হয় কিনা।

কখন আমি পাশপোর্টটা পাব?

–আটটার পরে আসুন, আমার ভাই এখানেই থাকবে। সে আপনার ফটো তুলে নেবে। ফটোটাকে পাশপোর্টে মেরে দেবে।

লুসিয়া বুঝতে পারলেন, তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে- সিনর, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

–আপনি কি ক্রশটা এখানে রেখে যাবেন?

–না, এটা আমার কাছে নিরাপদে থাকবে।

লুসিয়া দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। পুলিশ স্টেশনকে এড়িয়ে চললেন। এবার টাফওয়ানে যেতে হবে। রুবিও সেখানে অপেক্ষা করছেন। ইচ্ছে করেই তিনি চলার গতি, কমিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত জয় করায়ত্ত হয়েছে। সুইজারল্যান্ড। তার মানে মুক্তির ঠিকানা। আনন্দ-শুধুই আনন্দ।

আমি কি কিছু ভুল করছি? রুবিওকে ভুলে যাব, দুঃখ হচ্ছে, এতটুকু।

আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। এই কথা আমি কাউকে কোনোদিন বলিনি।

না, রুবিওকে নিয়ে কোনো অসুবিধে নেই। টাফওয়ানের পাশে এসে লুসিয়া দাঁড়ালেন, দীর্ঘশ্বাস নিলেন। হাসিমুখে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

.

২৫.

খবরের কাগজে সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে। শিহরিত খবর। কনভেন্টের ওপর আক্রমণ, সন্ত্রাসবাদীদের উল্লাস, চারজন সিস্টার পালিয়ে গেছেন। অনেকের মৃত্যু ঘটেছে। অনেক সিস্টার আহত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক খবর হয়ে গেছে এই খবরগুলো।

সারা পৃথিবী থেকে সংবাদ মাধ্যমের লোকেরা এসেছেন মাদ্রিদ শহরে। প্রধানমন্ত্রী মার্টিনেজ সব ব্যাপারটা শান্ত করা চেষ্টা করছেন। তিনি একটা প্রেস কনফারেন্স

ডেকেছেন। তার অফিসে ভিড় জমে গেছে। কর্নেল র‍্যামন আকোকাকে দেখা যাচ্ছে। কর্নেল কার্ল সোসটেলোও প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসে আছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। তিনি কর্নেল আকোকাকে এগিয়ে দিলেন। আকোকার ওপরেই সার্চ অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ছুটে আসছে, বুঝি বিষ মাখানো তীর। আকোকা শান্তভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করছেন। সব প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই। বারবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সৈন্যরা কেন উন্মত্ত আচরণ করেছে, এক অসহায় সিস্টারকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

আকোকা বলেছিলেন- এটা তাৎক্ষনিক আবেগের প্রতিফলন।

সাংবাদিকরা খুশি হতে পারছেন না। বোঝা গেল প্রধানমন্ত্রীর আসন এখন টলমল করছে। মধ্যরাতে আকোকা একটা ফোন পেলেন।

.

পরিচিত কণ্ঠস্বর, কে? কী ঘটতে চলেছে তা কি আপনি জানেন? আপনি এভাবে বেহিসেবি কাজ করবেন না।

আকোকা রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। লাইনটা মরে গেল, কে কথা বলল? মনে হচ্ছে মিয়োর কোনো অনুচর? কিন্তু মিরো কোথায়?

.

২৬.

-আমি ওকে মেরে ফেলব, রিকার্ডো মেলোডো বলেছিলেন, নিজের হাতে গলা টিপে। সিস্টার গ্রাসিলা কোথায় চলেছেন? জাইমে মিরো কি তাঁকে নিরাপদ জায়গাতে পৌঁছোতে পেরেছেন? রিকার্ডো খুশি হয়েছেন। হ্যাঁ, গ্রাসিলা একজন সিস্টার, কিন্তু তার সৌন্দর্য চেয়ে দেখার মতো। যে করেই হোক তাকে অধিকার করতেই হবে। ওই স্কার্ট এবং ব্লাউজের তলায় যে, অতুল সম্পদ লুকিয়ে আছে, আহা, আমি কবে তা অধিকার করব। এটাই হবে আমার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। রিকার্ডো ভাবলেন।

ঘটনাগুলো অভাবিত। সিস্টার গ্রাসিলা তার সঙ্গে কথা বলছেন না। অভিযানের শুরু থেকে তিনি একেবারে নিশ্চুপ। এর কারণ কী বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যপট। আঙুর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে। বার্লির ক্ষেত চোখে পড়ছে, সূর্যের উজ্জ্বল আলোক শিখা। সূর্যমুখী ফুল অভিবাদন জানাচ্ছে।

তারা মরোস নদী পার হলেন। রিকার্ডো জিজ্ঞাসা করলেন সিস্টার, আপনি একটু শান্ত হবেন কি? কিছুক্ষণের বিশ্রাম?

থমথমে নীরবতা। সেভোগিয়ার দিকে তারা এগিয়ে গেলেন। দূরে পাহাড়শ্রেণী চোখে পড়ছে। আহা, এইভাবে কথা বলা যায় কি?

-আমরা সেভোগিয়ারতে পৌঁছে যাব সিস্টার।

কোনো উত্তর নেই। কীভাবে ওই মেয়েটির মুখে কথা ফোঁটানো যেতে পারে? আপনার কী খিদে পেয়েছে?

আবার কোনো উত্তর নেই। এই মহিলা কি জীবন সম্পর্কে হতাশ? এমন বোবা হয়ে হাঁটছেন কেন? আহা তাকে ভগবান অসাধারণ সৌন্দর্য দিয়েছেন। কিন্তু মনটাকে করেছেন রুক্ষ এবং কর্কশ।

.

তারা সেভোগিয়ার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেলেন। রিকার্ডো বুঝতে পারলেন শহরে অনেক মানুষের ভিড়। তার মানে? এই শহরটায় প্রবেশ করা উচিত হবে না।

এগিয়ে গেলেন প্লাজা চেস্টের দিকে। অনেক সৈন্য চোখে পড়ল, তিনি বললেন সিস্টার, আমার হাত ধরুন, আচরণের মধ্যে প্রেমিকার শিহরণ নিয়ে আসুন। মনে হবে আমরা যেন প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছি।

কোনো কথা বেরোল না গ্রাসিলার মুখ থেকে। হায় ঈশ্বর, মেয়েটি বোরা কালা নাকি? শেষ পর্যন্ত জোর করে হাত ধরলেন, অদ্ভুত একটা প্রতিবাদ ভেসে এল। গ্রাসিলা হাত সরিয়ে নিলেন।

রিকার্ডো বললেন– আপনি রাগ করবেন না। আমার বোন হলে হয়তো এধরনের আচরণ করত। কিন্তু এখন এই অভিনয় করতেই হবে।

সৈন্যরা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রিকার্ডো আবার গ্রাসিলার মুখের দিকে তাকালেন। অভিব্যক্তি বিহীন মুখ। রিকার্ডো ভাবলেন, জাইমেকে অভিশাপ দেওয়া উচিত। অন্য সিস্টাররা কত হাসি-খুশি আর একে দেখে মনে হচ্ছে, বুঝি বিষাদের পাষাণ প্রতিমা। কোনো কথা বলতে পারছেন না, তীক্ষ্ণ শীতল চোখের চাহনি।

রিকার্ডো ভাবতে পারছেন না, এর অন্তরালে কী আছে, এই জীবনে অনেক মহিলার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কিন্তু এমন কাউকে দেখেননি।

কথার বলার চেষ্টা, কিন্তু কথা শুনবে কে?

অতীতের দিন মনে পড়ে যাচ্ছে। কত ঘটনাই না ঘটে গেছে এই জীবনে। কত উত্তেজনা, কত আবেগ, কত অভিমান।

উনি সিস্টার গ্রাসিলাকে বললেন- আমরা এই পথে যাব।

পথ চলে গেছে সেন্ট ভ্যালেনটিনের দিকে। দোকানের সামনে তারা দাঁড়ালেন। এখানে গানের জিনিসপত্র বিক্রি হয়। রিকার্ডো বললেন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, একটুখানি দাঁড়ান সিস্টার, আমি এক্ষুনি আসছি।

রিকার্ডো দোকানের মধ্যে ঢুকে গেলেন। একজন ক্লার্ক বললেন আপনাকে কী করে সাহায্য করব?

–আমি দুটো গীটার কিনব।

–ঠিক আছে, রামিরেস চলবে? সেটাই বাজারের সেরা।

ভালো জিনিস চাই। আমার বন্ধু আর আমি বাজাব, তবে আমরা কিন্তু অ্যামেচার।

–কোনাস? পাঁচ হাজার পেস্তা?

রিকার্ডো বললেন, হ্যাঁ, এতেই চলবে।

রিকার্ডো বাইরে বেরিয়ে এলেন, দুহাতে দুটি গীটার। মনে হল, সিস্টার গ্রাসিলা বোধহয় চলে গেছেন। কিন্তু সিস্টার দাঁড়িয়ে আছেন, শান্তভাবে কী করছেন। রিকার্ডো একটা গীটার তুলে দিলেন সিস্টারের হাতে। বললেন, এটা আপনার কাঁধে ঝুলিয়ে নিন।

সিস্টার তাকালেন।

রিকার্ডো বললেন- এটা লোককে বোকা বানাবার চেষ্টা।

গ্রাসিলা গীটারটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন। এবার যাত্রা শুরু হবে সেভোগিয়ার দিকে। চারপাশে রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন।

রিকার্ডো আবার বললেন সিস্টার, আপনি কথা বলছেন না কেন? কথা বলার চেষ্টা করুন। দেখুন তো, চারপাশে কী অসাধারণ ভাস্কর্য। ইতিহাসে লেখা আছে, দুহাজার বছর আগে শয়তান এই বাড়িগুলো তৈরি করেছিল। পাথরের পর পাথর জুড়ে। কীভাবে একটা অন্যের সঙ্গে আটকে আছে বলুন তো?

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। রিকার্ডোর খিদে পেয়েছিল। সিস্টার কোনো কথা বলছেন না।

–আমরা কিছু খাব কি সিস্টার?

সিস্টার তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। রিকার্ডো একটা ছোটো কাফের মধ্যে ঢুকে গেলেন। গ্রাসিলা তাকে অনুসরণ করছেন।

সিস্টার আপনি কী খাবেন? এখনও জবাব নেই। রিকার্ডো ওয়েট্রেসকে বললেন– সুপ দিন, সসার আছে কি?

গ্রাসিলা চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন। অন্যদিকের টেবিলে যারা বসে আছে, তারা আমার দিকে দেখছে কেন? আহা, আমি কী অসাধারণ সুন্দরী?

গ্রাসিলার ওই নীরব আচরণ, কিন্তু রিকার্ডো তখনও তাকে ছাড়তে পারছেন না। তিনি মাঝে মধ্যে চোরা চোখে গ্রাসিলাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। কী নামে এই মেয়েটিকে ডাকব? আকর্ষণীয় নাকি বোকা? ঠাণ্ডা রক্তের নাকি কামনাময়ী? আমার মনে হয় না উনি এত বোকা? যে কোনো কারণে এখন এই অভিনয় করছেন।

চলে যাবার সময় হয়েছে, রিকার্ডো বিল মিটিয়ে দিলেন। তিনি দেখলেন, সিস্টার গ্রাসিলার মুখে সামান্য আলোক উদ্ভাস।

তারা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললেন। শহরকে দূরে রেখে। মাঞ্জারাসের কাছে পৌঁছে গেলেন। একদল জিপসী এগিয়ে চলেছে, চারটি সুন্দর করে সাজানো ওয়াগন, ঘোড়ায় টানছে। রিকার্ডো বললেন, সিস্টার, দেখা যাক লিফ পাওয়া যায় কিনা।

–লিফ পেতে পারি?

গ্রাসিলাকে দেখে জিপসী বলল- হ্যাঁ হতে পারে, আপনারা কোথায় চলেছেন?

–গোয়াডারমা পাহাড়ের দিকে।

–আমরা সেরেজ পর্যন্ত যাব।

–অসংখ্য ধন্যবাদ।

যাত্রা শুরু হল। কিন্তু গ্রাসিলা কি রাজী হবেন? গ্রাসিলা শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। ওয়াগনের ভেতর জনা ছয়েক জিপসী বসে আছে। তারা রিকার্ডো এবং গ্রাসিলাকে জায়গা করে দিল।

ক্যারাভ্যান এগিয়ে চলেছে। দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে। সূর্য বুঝি ফার্নেসের আগুন। অসম্ভব উত্তাপ। পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আকাশের কোথাও মেঘের আনাগোনা নেই। ওয়াগন এবার সমতল ভূমিতে এসে গেছে। রিকার্ডো ভাবলেন, আকাশে উড়ছে শকুনের দল।

সন্ধ্যে হব হব, এবার ক্যারাভ্যান থামবে। নেতা এগিয়ে এলেন।

এখানেই নামতে হবে। আমরা ভিনিউয়েল পর্যন্ত যাব।

–অনেক ধন্যবাদ।

গ্রাসিলার হাত ধরলেন রিকার্ডো।

জীপসীর দিকে তাকিয়ে বললেন– কিছু খাবার দেবেন কী? আমরা বড়োই ক্ষুধার্ত। অবশ্য দাম দেব।

দুটি ফলের প্যাকেট, আহা, জিপসীদের মন কত ভালো। কিন্তু কেউই তাদের পছন্দ করে না।

.

অসাধারণ একটি উপত্যকা, আপেল গাছ, ডুমুর গাছ। কয়েক ফুট দূরে টমাস নদী, আপন খেয়ালে বয়ে চলেছে। কতদিন আগে রিকার্ডো এখানে মাছ ধরতে আসতেন।

অদূরে গোয়াডারমা পাহাড়শ্রেণী, রিকার্ডো এই জায়গাটা খুব ভালোভাবেই জানেন। ছোটোবেলা থেকে এখানে তার আনাগোনা।

না, ওই পাষাণ প্রতিমার সাথে কথা বলে লাভ নেই। সিস্টার গ্রাসিলা আপন মনে পথ হাঁটছেন। সামনের দিকে পথটা খুব একটা ভালো নয়। আকোকা কি এখানে কোন পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েছেন?

আমরা গ্রামে দিকে চলে যাব, কোথাও গিয়ে সামান্য বিশ্রাম নিতে হবে।

আবার রিকার্ডো কথা বলার চেষ্টা করলেন, সিস্টার কিন্তু জবাব দিলেন না।

.

এটা হল সেই গ্রাম, শান্ত এবং সুশীতল। অদূরে অরণ্যের ঘন ছায়া। সন্ধ্যে হয়েছে। রিকার্ডো ভাবলেন, সব ঘটনা ভুলে যেতে হবে। একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। এই শব্দের উৎস কোথায়? একটা প্লেন আকাশে উড়ছে। আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

রিকার্ডো চিৎকার করলেন, মাথা নীচু করুন। প্লেনটা অতি দ্রুত নীচে নেমে এল। আবার আকাশের দিকে উড়ে গেল। আর একটু হলে গ্রাসিলা আহত হতেন। ঠিক সময়ে রিকার্ডো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে সরিয়ে দিলেন। এর পরবর্তী মুহূর্তে যা ঘটল, রিকার্ডো অবাক হয়ে গেছেন। গ্রাসিলা চিৎকার করতে শুরু করলেন। লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তিনি লাথি মারছেন, ঘুষি মারছেন। চোখ অন্ধ করার চেষ্টা করছেন। তিনি কোনো কথা বলার চেষ্টা করছেন না, কিন্তু এমন কিছু শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, যা অশ্লীলতায় ভরা, এমন সুন্দরী একটি মহিলা এমন কথা বলতে পারেন।

নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। মনে হচ্ছে একটা বুনো বেড়াল বোধহয় রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

রিকার্ডো চিৎকার করলেন– আমাদের এখানে থাকাটা মোটেই উচিত হবে না। এখনই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

তখনও ওই সিস্টার লড়াই করছেন। এর কারণ কী? গ্রাসিলা আপনি এমন করছেন কেন? শান্তভাবে জানবার চেষ্টা করলেন রিকার্ডো।

রিকার্ডো বললেন– সিস্টার, লুকিয়ে থাকার একটা জায়গা আবিষ্কার করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে সোলজাররা এসে যাবে। আপনি যদি কনভেন্টে যেতে চান তাহলে আমাকে অনুসরণ করুন।

গ্রাসিলা এখনও চিৎকার করার চেষ্টা করছেন। গ্রাসিলা শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখে কীসের ছায়া পড়েছে। চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। চোখ লাল। এখনও এক অসাধারণ সৌন্দর্য।

রিকার্ডো বললেন– আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য দুঃখিত। আমি জানি না আপনার মতো সিস্টারের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত। ভবিষ্যতে আমি আরও সতর্ক থাকব।

কালো চোখে অদ্ভুত চাউনি। চোখ জলে ভরে গেছে। রিকার্ডো জানেন না, এখন সিস্টার কী চিন্তা করছেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আশেপাশে অনেকগুলো গুহা আছে, রিকার্ডো বললেন, কোনো একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। সমস্ত রাত সেখানেই থাকতে হবে। সকালবেলা আমরা আবার পথ দিয়ে হাঁটবো।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

রিকার্ডো বুঝতে পারলেন, মুখের নানা জায়গা থেকে রক্ত পড়ছে। সিস্টার নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছেন। যা হয়েছে তার জন্য দুঃখ করে কী লাভ? এখনও ওই মেয়েটি সম্পর্কে তার আকাশ ছোঁয়া কৌতূহল।

এখন চারপাশে নীরবতা, নেমে আসছে ঘন অন্ধকার।

.

বাতাস বয়ে চলেছে, অন্ধকার গুহার ভেতর ঢোকার অনুমতি পাচ্ছে না। আশেপাশে পাহাড়চূড়া।

যেখানে ওই প্লেনটির সাথে দেখা হয়েছিল, তার থেকে তারা একমাইল দূরে চলে এসেছেন। এই গুহাটি রিকার্ডোর পছন্দ হয়েছে। ঘন ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা এর প্রবেশ পথ।

উনি বললেন- এখানেই থাকতে হবে। হামাগুড়ি দিয়ে তারা ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটুখানি আলো দেখা যাচ্ছে, বাকিটুকু অন্ধকারে ঢাকা।

রিকার্ডো বললেন, ভেতরে অপেক্ষা করুন। আমি কটা গাছের ডাল নিয়ে আসছি। মুখটা ভালো করে বন্ধ করতে হবে। যাতে সৈন্যরা আমাদের দেখতে না পায়।

তিনি দেখলেন, গ্রাসিলা অন্ধকারে চুপ করে বসে আছেন। রিকার্ডো ভাবলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত সিস্টার এখানে থাকবেন তো? অজ্ঞাত কারণে রিকার্ডোর মনে হল, এখন গ্রাসিলার সাহচর্য বড্ড বেশি দরকার।

.

গ্রাসিলা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দেখলেন রিকার্ডো সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন। ঠাণ্ডা মাটিতে বসে থাকলেন। নিরাশার মধ্যে।

আর ভালো লাগছে না, তিনি ভাবলেন, যিশু তুমি কোথায়? আমাকে নরকের এই অন্ধকার থেকে উদ্ধার করো।

প্রথম থেকেই তাকে লড়াই করতে হয়েছে। রিকার্ডোর প্রতি একটা অজানা আকর্ষণ। মুরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি নিজেকেই ভয় পাচ্ছি। আমি এই পুরুষটিকে চাইছি, কিন্তু কেন?

তাই তো নীরবতার এই প্রাচীর। এই নীরবতার মধ্যেই কনভেন্টের জীবন কেটে গেছে। কিন্তু এখন তো আমি বাইরে এসেছি। এখন আমাকে প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে হয় না। নির্দিষ্ট নিয়মনীতি পালন করতে হয় না। গ্রাসিলার মনে হল, মনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছে। অনেক বছর ধরে আমি লড়াই করেছি, অনেক আর্তনাদ, অনেক দীর্ঘশ্বাস, আর ভালো লাগছে না।

মুর তাকিয়ে আছে আমার নগ্ন শরীরটার দিকে। না, তুমি একাট শিশু, জামা কাপড় পড়ে নাও, এখানে থেকে চলে যেও।

না, না মুর, আমি এক পূর্ণবয়স্কা যুবতী, তুমি তাকিয়ে থাকো, আমার উদ্ধত দুটি স্তনের দিকে। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে আরাম দেব।

এই অনুভূতিটা ভুলতে অনেক বছর সময় লেগেছে। এখনও মনে পড়ে, এখনও মনে পড়ে অনেক কিছু।

মায়ের চিৎকার, কুকুরীর বাচ্চা!

ডাক্তার বলেছিলেন আমাদের চিফ সার্জেন্ট নিজে তোমাকে দেখবেন। তোমার মাথায় যেন কোনো কাটা চিহ্ন না থাকে।

রিকার্ডো মেলাডোর দিকে তাকিয়ে গ্রাসিলার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছিল। অতীতের অনেক স্মৃতি ফিরে এসেছিল। ভদ্রলোক সত্যিই সুন্দর, সরল স্বভাবের। গ্রাসিলা যখন ছোট্ট শিশু, তখন তিনি রিকার্ডোর মতো এক প্রেমিকের স্বপ্ন দেখতেন। তারপর স্বপ্ন ভেস্তে গেছে। গ্রাসিলা যুবতী হয়ে উঠেছেন। এখন তিনি যিশুখ্রিস্টের সহধর্মিণী। এখন তিনি মনে কোনো পাপ চিন্তা আনতে পারেন না।

গ্রাসিলা তাই এই নীরবতার বাঁধনে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন।

শেষ পর্যন্ত কী হবে? একটা শব্দ শোনা গেল। চারটে সবুজ চোখ, তাকিয়ে আছে, এক দৃষ্টিতে। গ্রাসিলার মনে আতঙ্ক এবং ভয়, তবু তিনি চিৎকার করতে পারলেন না। নেকড়ের বাচ্চা। জুলজুল করে দেখছে। গ্রাসিলা হাত বাড়িয়ে দিলেন। তোক না ভাব ভালোবাসা। বাচ্চা দুটো ভাবছে, আমাদের গুহায় এ কোন্ অচেনা অতিথি।

দরজায় পায়ের শব্দ। গ্রাসিলার মন শান্ত। রিকার্ডো ফিরে এসেছেন।

পরমুহর্তে আগুন জ্বলে উঠল, বিরাট আকারের একটা নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গ্রাসিলার বুকের ওপর!

.

২৭.

লুসিয়া টাভারনার পাশে এসে দাঁড়লেন। দীর্ঘশ্বাস নিলেন। রুবিও ভেতরে বসে আছেন। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন?

আমি এমন কোনো আচরণ করব না, যাতে সন্দেহ হতে পারে। আটটার সময় নতুন পাশপোর্ট পাব, সুইজারল্যান্ডের দিকে যাত্রা করব।

রুবিও তাঁকে দেখে খুশি হলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

–আমি খুব চিন্তা করছিলাম। এতক্ষণ সময় কেটে গেল, আমি ভেবেছিলাম হয়তো ভয়ংকর কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে।

লুসিয়া রুবিওর হাতে হাতে রেখে বললেন কিছুই হয়নি।

আমি আমার স্বাধীনতা কিনেছি, একথা তিনি মুখে বললেন না। কাল আমি এদেশ থেকে চলে যাব, না, একথাও জানাননি।

রুবিও লুসিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতে হাত রেখেছেন। ভালোবাসার বিশুদ্ধ উচ্চারণ।

টাভারনার চারদিকে চোখ মেলে দিলেন লুসিয়া। মানুষজন আনন্দে হৈ হৈ করছে। গান বাজনা হুল্লোড়।

একজন এই টেবিলে চলে এলেন।

–গান গাইতে পারেন? আমাদের সঙ্গে আসুন।

রুবিও মাথা নাড়লেন–না।

–সমস্যা কী হয়েছে?

–তোমরা গান করো। রুবিও দেখলেন, এসব পুরোনো গানে ফ্রাঙ্কোকে প্রশংসা করা হয়েছে।

বেশ কয়েকজন যুবক তখন চারপাশে ঘিরে ধরেছে। তারা সকলেই মত্ত মাতাল, তাদের আচরণে বোঝা যাচ্ছে।

–সিনর, আপনি কি ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে নাকি?

লুসিয়া বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা গুরুতর। এখনই হৈ হট্টগোল শুরু হবে।

লুসিয়া ডাকলেন–রুবিও?

রুবিও সংকেতটা বুঝতে পেরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন– না, আমি ভাই কারোর বিরুদ্ধে নই। কিন্তু এই শব্দগুলো আমি জানি না।

-ঠিক আছে, আমরা সকলে একসঙ্গে গাইব।

সকলে রুবিওর জন্য অপেক্ষা করছে।

রুবিও লুসিয়ার দিকে তাকালেন– চলল, এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু তার আগে? গান শুরু হয়ে গেছে। লুসিয়া বুঝতে পারলেন, রুবিও নিজেকে নিজের মধ্যে আটকে রাখতে পারছেন না।

গান শেষ হয়ে গেল, একজন যুবক রুবিওর পিঠ চাপড়ে বলল– ভালো গেয়েছেন, আপনার গলা তত বেশ ভালো।

রুবিও চুপচাপ বসে রইলেন। ওরা কখন যাবে?

একজন লুসিয়ার কোলে ওই জ্যাকেটটা দেখতে পেল।

–এখানে কী লুকিয়ে রেখেছেন মিস?

তার বন্ধু বলল দেখা যাক, কি আছে সেখানে।

আপনি কি আপনার প্যান্টিটা খুলে দেখাবেন, সেখানে কী লুকোনো আছে?

এই কথা শুনে রুবিও খুব রেগে গেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলেন। লোকটা পড়ে গেল।

লুসিয়া চিৎকার করছেন–না, রুবিও এমন কোরো না। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। মারামারি শুরু হয়ে গেল। কে যেন মদের বোতল ছুঁড়ে ভেঙে দিয়েছে। চেয়ার টেবিল উল্টে ফেলা হল। মনে হল লোকগুলো বোধহয় বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। অশ্রাব্য গালিগালানজ। রুবিও দুজন মানুষকে মাটিতে ফেলে বেদম পেটাতে শুরু করে দিয়েছেন। তৃতীয় জন তার দিকে ছুটে আসছে। রুবিওর পেটে লাথি মেরে দিল। রুবিও কঁকিয়ে উঠলেন।

রুবিও চলো এখান থেকে চলে যাই।

কোনোরকমে রুবিও বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন।

লুসিয়া বললেন– চলো চলো এখানে আর থাকব না।

কিন্তু? আটটার সময় আমাকে যে এখানে আসতেই হবে। আটটা পর্যন্ত কোথায় লুকিয়ে থাকব? রুবিও মাথা মোটা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না।

তারা ক্যালেসানটা মারিয়ার দিকে চলে গেলেন। গোলমালের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। বিরাট একটা চার্চ, টিগলেশিয়া সানটা মারিয়া। লুসিয়া সিঁড়ির ওপর দাঁড়ালেন। হাঁফাচ্ছেন তখনও। তারপর? দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। এই চার্চে কেউ নেই।

রুবিও ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছেন।

লুসিয়া বললেন– এখানে আমরা নিরাপদ। তুমি খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারো।

কিন্তু একী? ভলকে ভলকে রক্ত বেরোচ্ছে রুবিওর পেট থেকে। লুসিয়ার মনে হল তিনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন– কী হয়েছে?

ফিসফিস করে রুবিও জবাব দিলেন– গুণ্ডাটা একটা ছুরি ব্যবহার করেছিল। রুবিও থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের ওপর পড়ে গেলেন।

লুসিয়া হাঁটু গেড়ে বসে বললেন– একদম নড়াচড়া করো না।

লুসিয়া শার্ট খুলে দিলেন। শার্টটা পেটের ওপর চেপে ধরলেন। যদি রক্ত স্রোতকে বন্ধ করা যায়। রুবিওর মুখ এখন চকের মতো সাদা।

তুমি যে কেন এই লড়াই করলে? লুসিয়া রেগে জানতে চাইলেন।

–তোমাকে এত খারাপ কথা বলল, আমি সহ্য করতে পারিনি।

কথাগুলো লুসিয়ার হৃদয় স্পর্শ করেছে। হায় ঈশ্বর, এই লোকটা আর কতবার আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে!

লুসিয়া বললেন– আমি তোমাকে মরতে দেব না। দেখা যাক কী করা যায়।

কিন্তু কী হবে? জল এবং তোয়ালে পাওয়া গেল, ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা হল। বুঝতে পারা যাচ্ছে, সমস্ত শরীর জুড়ে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। লুসিয়া মাথার ওপর তোয়ালে বুলিয়ে দিলেন। রুবিওর চোখ দুটো বন্ধ। মনে হয় উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। লুসিয়া তার মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে ভাবলেন, এ বাঁচবে তো?

আমরা তোমাদের খামারে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করব রুবিও। তোমার মা আর বোনেদের সঙ্গে দেখা করব। তোমার কী মনে হয়, ওরা কি আমাকে মেনে নেবেন? আমি খুব ভালো কাজ করব দেখো।

সমস্ত সন্ধ্যেটা এইভাবে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

তারপর? তারপর হঠাৎ লুসিয়া দেখলেন, আকুল কান্না এসে তার দুচোখ ভাসিয়ে দিয়েছে। তিনি ভাবলেন, এটাও কী একটা স্বপ্ন হয়ে থেকে যাবে!

চার্চের দেয়ালে সন্ধ্যের ছায়া ঘন হচ্ছে। কাঁচের জানলার ভেতর দিয়ে বিদায়ী রশ্মির শেষে কিরণ। তাও হারিয়ে গেল। এখন চারপাশ ঘন অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে। লুসিয়া ব্যাণ্ডেজটা পালটে দিলেন। চার্চের ঘণ্টা ধ্বনি বাজতে শুরু করেছে। এক-দুই-তিন-চার পাঁচ ছয়, আটটা বাজল, এবার তো যেতেই হবে।

রুবিওর গায়ে হাত দিলেন। জ্বর এসেছে। ঘাম হচ্ছে, নিশ্বাস খুব ধীরে। এখন রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো ভেতরে? জানি না, ঈশ্বর তুমি একে বাঁচাও।

রুবিও, ডার্লিং।

রুবিও চোখ খুললেন। অর্ধ অচেতন।

–আমি এখুনি আসছি।

রুবিও অসহায়ের মতো হাত ধরে বলেছিলেন– প্লীজ।

–আমি এখুনি আসছি।

লুসিয়া হাত ছাড়িয়ে নিলেন। শেষবারের মতো তাকালেন। আঃ, একে আমি সাহায্য করতে পারলাম না।

লুসিয়া দ্রুত সোনার ক্রশ তুলে নিলেন। চার্চের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। চোখ ভরতি জলে, কিন্তু কী করা যাবে। জনাকীর্ণ পথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছেন। ওই দোকানটাতে পোঁছোতে হবে। ছাড়পত্র এসে গেছে?

আরও জোরে, আরও জোরে!

পুলিশ স্টেশনের ভেতর একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার বসেছিলেন। তিনি লুসিয়ার দিকে তাকালেন। তারপর? লুসিয়া বললেন, একজনকে ছুরি মারা হয়েছে। লোকটা বোধহয় মরে যাবে। আপনার সাহায্য চাইছি।

পুলিশের কর্তা কোনো কথা বললেন না। তিনি একটা টেলিফোন নিয়ে কিছু বললেন। এখুনি ওরা সাহায্য করতে আসবেন।

চোখের পলক ফেলার আগেই দুজন গোয়েন্দা পৌঁছে গেছেন।

–একজনকে ছুরি মারা হয়েছে।

চলুন যাচ্ছি।

রাস্তায় একটা ডাক্তারকে তুলতে হবে। একজন গোয়েন্দা বললেন।

বাড়ি থেকে একজন ডাক্তারকে তুলে নেওয়া হল। লুসিয়া চার্চের দিকে এগিয়ে গেলেন।

একটু বাদে ডাক্তার বললেন- লোকটা এখনও বেঁচে আছে, অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে।

লুসিয়া মাথা নেড়ে ভাবলেন, আহা, আমার কাজ আমি করেছি। আর হয়তো কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

দুজন গোয়েন্দা হঠাৎ লুসিয়ার প্রতি এত আগ্রহী কেন? লুসিয়া জানেন না, ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাঁর ছবি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটু বাদে একজন বললেন– সিনোরিটা, অনুগ্রহ করে আপনি একবার পুলিশ স্টেশনে আসবেন কি? আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে।

.

২৮.

রিকার্ডো মেলাডো একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দেখলেন একটা বিরাট নেকড়ে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্য তিনি পাথর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর প্রাণ হাতে করে এগিয়ে চললেন।

–সিস্টার?

আবছা আলোয় দেখা গেল, ওই বিরাট জন্তুটা গ্রাসিলাকে আক্রমণ করছে।

রিকার্ডো কী করবেন বুঝতে পারছেন না। যুদ্ধ শুরু করে লাভ কি?

চেতনা হারাতে থাকেন তিনি, গ্রাসিলা বলছেন– কী হবে?

সত্যিই তো, একমুহূর্ত বাদে হতবাক গ্রাসিলা বাইরে বেরিয়ে এলেন। রিকার্ডো ইতিমধ্যেই তার কাছে পৌঁছে গেছেন। মস্ত বড়ো একটা পাথরের টুকরো ছিল, সেটা দিয়ে কোনোমতে দরজাটা আটকিয়ে দেওয়া হল। তারপর? অন্ধকার অরণ্যে তারা

দুজন। মনে হচ্ছে এবার বোধহয় মৃত্যুর উপত্যকা থেকে জীবনের সমতলে ফিরে আসতে পেরেছেন।

.

স্তেপ পাহাড়ের পথে তাদের ভ্রমণ শুরু হয়েছে। ঘণ্টা কেটে গেছে, ছোট্ট একটা ঝরনা, রিকার্ডো বললেন, আসুন, এখানে কিছুক্ষণ বসা যাক।

ব্যাণ্ডেজ নেই, অ্যান্টিসেপ্টিক নেই, এখানে সেখানে নখরের আঁচড়। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা জলে ব্যথা কিছুটা উপশম হল। দৃশ্যপট পাল্টে যাচ্ছে। কেউ কোনো কথা বলতে পারছেন না। হঠাৎ কী যেন ঘটে গেল। রিকার্ডো আলিঙ্গন করলেন গ্রাসিলাকে। ঠোঁটে ঠোঁট এবং হাতে হাত। অনেক কথা না বলা থেকে গেছে।

গ্রাসিলার অতীত? গ্রাসিলার ভবিষ্যৎ? গ্রাসিলা কি ঈশ্বরকে ভাবছেন? হায় ঈশ্বর, তুমি আমার জন্য এত আনন্দ জমিয়ে রেখেছ? অথচ আমি তার হদিস পাইনি। দুজনে কথা বলছেন, গ্রাসিলার সৌন্দর্য এখনও রিকার্ডোকে আকর্ষণ করছে। রিকার্ডো ভাবলেন, এই সিস্টার এখন আমার, সম্পূর্ণভাবে আমার। তিনি আর কখনও কনভেন্টে ফিরে যাবেন না। আমরা বিয়ে করব, আমাদের ছেলেমেয়ে হবে, উপযুক্ত সংসার।

কথাটা ভাসিয়ে দিলেন রিকার্ডো।

গ্রাসিলা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আমি রাজি। তখনও আলিঙ্গনের পালা চলেছে। কিন্তু? এটাই তো আমি চেয়েছিলাম, গ্রাসিলা ভাবলেন। কিন্তু আমার স্বপ্ন সফল হয়নি।

রিকার্ডো বললেন– আমরা ফ্রান্সে যাব। সেখানে আমরা নিরাপদে থাকব। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমরা স্পেনে ফিরে আসব।

গ্রাসিলা জানেন তিনি ওই লোকটির সাথে পৃথিবীর যে কোনো দেশে যেতে পারেন। যদি বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তিনি তা ভাগ করে নেবেন।

অনেক কথাই বলা হল, রিকার্ডো জানালেন কীভাবে তিনি জাইমে মিরোর সংস্পর্শে এসেছেন। কীভাবে বাবার সাথে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। গ্রাসিলাকে বলা হল তার অতীত সম্পর্কে বলতে। গ্রাসিলা কিন্তু কিছুই বললেন না। গ্রাসিলা ভাবলেন, আমি বলতে পারব না, তাহলে দেখা দেবে শুধু ঘৃণা আর লজ্জা।

সকাল হয়ে এসেছে, সূর্য হামাগুড়ি দিচ্ছে। পাহাড়ের ওধারে লাল আভা দেখা যাচ্ছে।

রিকার্ডো বললেন– আজ সারাদিন এখানে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। অন্ধকারে আবার যাত্রা শুরু হবে।– জিপসীদের দেওয়া খাবারের কিছুটা তখনও ছিল। তারা খেলেন, খানিকটা জমিয়ে রাখলেন ভবিষ্যতের জন্য।

সুখের পরিকল্পনা, আগামী দিন যাপন। কোথা থেকে শুরু হবে, কেউ তা জানেন না। কিন্তু এখানে এত গোলমাল? রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা? স্পেনে আবার ফেরা সম্ভব হবে তো? নাকি আরব ইজরায়েলের মতো চিরদিন অনিশ্চয়তা? মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি এবং তার বাবা রবার্ট কেনেডিকে হত্যা করা হয়েছে। মার্টিন লুথার কিং

জুনিয়ারকেও মেরে ফেলা হয়েছে। বার্লিন দেওয়াল? দুর্ভিক্ষ? বন্যা? ভূমিকম্প? ধর্না? বিক্ষোভ? এইভাবেই তো মানুষের স্বপ্ন আজ ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবন? শুধু আমাদের কেন? হাজার লক্ষ মানুষের?

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে রিকার্ডো বললেন দেখো, শেষ অব্দি আমরা তো জীবনকে আঁকড়ে ধরতে পেরেছি। আমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি। এটাই বোধহয় ভগবানের সবথেকে বড় উপহার।

গ্রাসিলার কণ্ঠস্বরে জেগেছে একটা অদ্ভুত কোমলতা। তিনি অতীতের কথা বলতে শুরু করলেন। পরিষ্কার জানালেন আমার মা ছিলেন এক বারাঙ্গনা। প্রতি রাতে আমি নতুন এক পুরুষ খদ্দেরকে দেখতে পেতাম। চোদ্দো বছর বয়সে আমি এক পুরুষকে আমার শরীরটা দিয়েছিলাম। তার পৌরুষ আমাকে আকর্ষণ করেছিল। চোখের সামনে মা তার সাথে অসভ্য খেলা খেলবে, আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আমিও হয়তো একটা বেশ্যায় পরিণত হতাম, কিন্তু তা হইনি, কেন জানো? আমি বিশ্বাস করি দৃঢ় মন থাকলে মানুষ অনেক বিপদকে অতিক্রম করতে পারে। আমি শেষ পর্যন্ত একটা শান্ত পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছিলাম, শান্ত এবং পরিচ্ছন্ন।

রিকার্ডো চিৎকার করে বললেন- না-না, আর বলতে হবে না। আমাদের অনেকেরই একটা দুঃখজনক অতীত থাকে। তাকে ঘাটিয়ে কী লাভ!

সময় বয়ে যাচ্ছে, রিকার্ডো বললেন ফেডারিকো গার্সিয়া লোরকার একটা কবিতা শুনবে?

রাত্রিটা আর কখনো আসবে না।
তুমিও আসবে না
আমিও যাব না কোথাও
কিন্তু তোমাকে আসতে হবে
তোমার ঠোঁট লবণাক্ত বৃষ্টিধারায় দগ্ধ,
দিনের স্বপ্ন সফল হবে কি
না, তুমিও আসবে না
আমিও আসব না।
আমি কোথাও যাব না।
কিন্তু আমাকে আসতে হবে
অন্ধকারের কাদায় আচ্ছন্ন জল ভেঙে
রাত কিংবা দিন আমাদের স্বপ্ন সফল করবে না
তোমার জন্য আমার মৃত্যু হবে এবং
আমার জন্য মারা যাবে তুমি

কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে এসেছে, ভাবতে পারা যাচ্ছে না, এমন সুন্দর সুখী একটি ভবিষ্যৎ? বিশ্ব চরাচর জুড়ে নিঃসীম নৈঃশব্দ।

গ্রাসিলা চোখ বুজলেন, এই প্রথম একটা অদ্ভুত আনন্দ তার সমস্ত শরীরকে পরিপ্লবিত করছে।

.

২৯.

একটা সূত্র হারিয়ে গেছে। কিন্তু সূত্রটা বের করতে হবে।

অ্যালান টাকার ভাবতে থাকেন। কীভাবে? বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

ব্যাপারটার মধ্যে গোলমাল আছে, বিপদসংকুল পথ। টাকার জানেন তাকে আরও সতর্ক এবং সচেতন হতে হবে। যেন এটা কোনো দিবা স্বপ্নে পরিণত না হয়, তাকে অসম লড়াইতে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

ফাদার বেরেনডার সাথে কথাবার্তা শুরু হল।

ফাদার, সেই চাষী দম্পতির খবর কী? মেগান প্যাট্রিসিয়াকে যারা দেখতে পেয়েছিল?

বৃদ্ধ যাজকের মুখে হাসি অনেক দিন তুমি ওদের সাথে কথা বলতে পারবে না। কেন বল তো? হয়তো কোনো দিনই পারবে না।

টাকার অবাক হয়েছেন তার মানে!

অনেক বছর আগে ওই চাষী দম্পতির মৃত্যু হয়েছে।

নরকের অন্ধকার, কিন্তু আলো কোথায় ছোট্ট শিশুটার নিউমোনিয়া হয়েছিল তাই তো? কোন হাসপাতালে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়?

হাসপাতালটা ১৯৬১ সালে পুড়ে গেছে। একটা নতুন হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। তাই কোনো রেকর্ড পাওয়া যাবে না। আঠাশ বছর আগের ঘটনা, পৃথিবীটা অনেকখানি পাল্টে গেছে ভাই। এখন কি আর সেই দিনকাল আছে?

না, চারপাশে শুধুই হতাশা। কোথায় যাওয়া যেতে পারে? ওই অনাথ আশ্রম।

.

এলেন স্কট রোজই জানতে চান, মেয়েটিকে পাওয়া গেছে কিনা। অ্যালান বুঝতে পারেন, কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ঝরছে।

তার মানে? রহস্য ঘণীভূত হচ্ছে কি?

অ্যালান টাকার অনাথ আশ্রমে। বিচ্ছিরি পরিবেশ, একদল ছেলে গান গাইছে, কথা বলছে, এখানে স্কট সাম্রাজ্যের মহারানী বড় হয়ে উঠেছে? ব্যাপারটা ভাবতে কেমন খারাপ লাগে। আর ওই কুকুরিটা কিনা নিউইয়র্কে অভিজাত জীবন কাটিয়েছে?

একজন তরুণী এসে দাঁড়ালেন, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, সিনর?

অ্যালান টাকার হাসলেন–হ্যাঁ পারেন, কোটি ডলার দিয়ে। মুখে বললেন- এখানকার দায়িত্বে কে আছেন?

–সিনোরা অ্যাঞ্জেলস।

–উনি কি আছেন?

–হ্যাঁ, আমি আপনাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

দেখা হল। ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে, আশি বছর পার হয়েছে। চেহারাটা বেশ বড়ো, চোখে কেমন কঠিন আভা। মাথার চুল ধূসর এবং পাতলা। চোখ দুটি উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।

–আপনি কি আমাদের কোনো একটি শিশুকে দত্তক নিতে এসেছেন? দেখুন কাকে পছন্দ হয়।

না সিনোরা, আমি একটি শিশু সম্পর্কে জানতে এসেছি, অনেক বছর আগে সে এই আশ্রম ছেড়ে চলে যায়।

অ্যাঞ্জেলস বললেন–আমি তো জানি না। কিছু বুঝতে পারছি না।

একটা ছোট্ট মেয়েকে এখানে আনা হয়েছিল, ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে।

অনেক দিন আগের কথা। হয়তো মেয়েটি এখানে নেই। পনেরো বছর বয়স হলে আমরা...

না সিনোরা, আমি জানি সে এখানে নেই। আমি জানতে চাইছি ঠিক কবে এখানে আনা হয়েছিল।

–এ ব্যাপারেও আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না।

ডিটেকটিভের হৃদয় গলছে- কেন? তার নাম জানা আছে। প্যাট্রিসিয়া স্কট, গোয়েন্দা মনে করলেন, কিন্তু অ্যালান মুখে বললেন– মেগান, তার নাম হল মেগান।

মার্সিডিজ অ্যাঞ্জেলসের মুখে আলো- না, কেউ এই মেয়েটিকে ভুলতে পারবে না। সে একটা শয়তানি ছিল, একদিন সে কী করেছিল জানেন?

.

পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার ইচ্ছে অ্যালানের নেই। সময় খুবই কম, শেষ অব্দি রেকর্ড ঘরে তারা পৌঁছে গেলেন।

ওই ফাইলে একটা ছবি থাকলে কেমন হত? পরবর্তীকালে ফটোকপি করতেই হবে। ফাইলটা নিজের চোখে দেখতে চাইলেন অ্যালান। কিন্তু রাজী হচ্ছেন না ওই ভদ্রমহিলা। সত্যিই তো, ফাইলগুলো একান্ত এবং গোপনীয়।

-ছোট্ট মেগান, তাকে কীভাবে সাহায্য করেছেন? তার জন্য কিছু ভালো খবর আছে।

–আপনি জানতে চাইছেন মেয়েটিকে কবে এখানে আনা হয়েছিল?

হ্যাঁ, মেয়েটির বাবা মারা গেছে, কিছু টাকা পয়সা আছে, তার হাতে তুলে দিতে হবে।

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন। তাকিয়ে থাকলেন অ্যালানের মুখের দিকে।

অ্যালান হাসি হাসি মুখে বললেন আপনি আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করছেন, আমি যদি এই অনাথ আশ্রমে একশো ডলার দান করি আপনি কিছু মনে করবেন? তারপর বাড়িয়ে বললেন দুশো? ঠিক আছে পাঁচশো ডলার?

অ্যাঞ্জেলসের মুখে হাসি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সিনর। আমি দেখছি ফাইলটা পাওয়া যায় কিনা।

কাজটা করা সম্ভব হয়েছে। অ্যালান ভাবলেন। যিশু, তুমি মহান, তুমি করুণাঘন।

পয়লা অক্টোবর তারিখে প্লেনটা ধ্বংস হয়ে যায়, মেগানকে নিশ্চয়ই তার দশদিন বাদে : হাসপাতাল থেকে আনা হয়েছিল। দিনটা এগারোই অক্টোবরের কাছাকাছি হবে।

অ্যাঞ্জেলস ফিরে এলেন– একটু খোঁজাখুঁজি করতে হল।

উনি ফাইলটা অ্যালানের হাতে তুলে দিলেন। লেখা আছে, মেগান, শিশু কন্যা, মা বাবার পরিচয় নেই। তারিখটা? ১৪ জুন, ১৯৪৭।

হতেই পারে না, অ্যালানের চোখে মুখে বিস্ময়। বিমানটা ধ্বংস হয়েছে ১ অক্টোবর তারিখে।

-তারপর? কী বলছেন সিনর? আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

–এই রিপোর্ট কে রাখে বলুন তো?

–আমাকে নিজেকেই সব কাজ করতে হয়। যখন কোনো শিশুকে এখানে আনা হয়, তার সম্পর্কে প্রাপ্তব্য সব তথ্য আমি লিখে রাখি।

স্বপ্ন ভাঙছে– আপনার কোনো ভুল হয়েছে কি? দিনটার ব্যাপারে?

রাগত কণ্ঠস্বর– আমি জানি সিনর, জুন এবং অক্টোবরের মধ্যে কী তফাত।

স্বপ্নটা ভেঙে গেছে। তার মানে? প্যাট্রিসিয়া স্কটের মৃত্যু হয়েছে বিমান দুর্ঘটনায়। এলেন স্কট কাকে খুঁজছেন?

অ্যালান টাকার উঠলেন– ধন্যবাদ।

অ্যালান টাকার চলে যাচ্ছেন, আহা, লোকটি বড়োই ভালো। কত উদার, পাঁচশো ডলার, অনাথ আশ্রমের অনেক কিছুই কেনা যাবে। নিউইয়র্ক থেকে একটা ফোন এসেছিল, এক লক্ষ ডলারের চেক, আহা, ভগবান ক্রমশ মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। তাতেই তো সব কিছু...

.

অ্যালন টাকার রিপোর্ট দিলেন।

এখনও কোনো খবর পাইনি শ্রীমতী স্কট, বুঝতে পারছি না, অনেকে বলছেন মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে।

এখন কণ্ঠস্বর একেবারে পালটে গেছে। খেলাটা শেষ হয়েছে, এলেন স্কট ভাবলেন, তা হলে? প্যাট্রিসিয়া? কী হল তার? কেউ তার খবর রাখল না।

.

৩০.

সিস্টার মেগান ফেলিক্স কারপিওর দিকে তাকিয়ে আছেন। যাত্রাপথ এগিয়ে গেছে, মেগান কি ভয় পেয়েছেন? ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কত বছর ধরে তাকে কনভেন্টের বদ্ধ ঘরে জীবন কাটাতে হয়েছে। আর কখনও যেন এই অনুভূতি না হয়।

মেগান এখন কী প্রার্থনা করছেন? তিনি কি অতীত দিনের কথা ভাবছেন? অনাথ আশ্রমের সেই কালো অন্ধকার দিন? সেই দিনগুলি কি আবার ফিরে আসবে? কিন্তু এখন? এখন তো তাকে সন্ত্রাসবাদীরা ঘিরে ধরেছে, তার জীবনটা এখন সরু সুতোর ওপর ঝুলছে। তা হলে?

সমস্ত রাত ধরে তারা হেঁটেছিলেন। ভোরবেলা থেমে গেলেন। মেগান আর অ্যাম্পায়রা জিরন, জাইমে মিরো ও ফেলিক্স কারপিওকে দেখা গেল, সামনে একটা মানচিত্র।

জাইমে বললেন- মেরিনা জেল ক্যাম্পোটে পৌঁছোতে আর চার মাইল। এই পথটা, আমরা যাব না। এখানে আমি গ্যারিসনের লোকজন থাকে। আমরা ভেলাডরি দিয়ে উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে যাব। মনে হচ্ছে বিকেলের আগেই সেখানে পৌঁছতে পারব।

সিস্টার মেগানের মনে আনন্দের ঝরনা। সমস্ত রাত কীভাবে কেটে গেল। জাইমে দলের কর্তা। মেগান বুঝতে পেরেছেন, জাইমের মধ্যে একটা অসাধারণ পৌরুষ আছে।

সিস্টার মেগানের কথাবার্তা শুনে জাইমের কেবলই মনে হয়েছে, ইনি বোধহয় সত্যিকারের সিস্টার নন। এঁর অবস্থান কনভেন্ট থেকে অনেক হাজার মাইল দূরে।

অ্যাম্পারো জিরনকেও কিছুটা প্রভাবিত করা গেছে। পথ চলে গেছে গ্রামের পাশ দিয়ে। প্রকৃতি বন্য এবং শূন্য। নিরাঘ বাতাসের সুগন্ধ, পুরোনো গ্রাম, কোনো কোনো গ্রামে মানুষ নেই, নিস্তব্ধ নিথরতায় ভরা, পাহাড়ের ওপর পুরোনো দিনের একটা ভাঙা দুর্গ।

মেগানের চোখে অ্যাম্পায়রা বুঝি এক বুনো বেড়াল, অনায়াসে পাহাড়ি উপত্যকা দিয়ে হাঁটতে পারেন। কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না।

শেষ অব্দি দূরে ভেলাডরি গ্রামটা দেখা গেল। জাইমে থেমে গেলেন।

সব কিছু ঠিক করা আছে।

কোনো চিন্তা নেই।

ব্যাঙ্ক কখন বন্ধ হয়?

–পাঁচটার সময়, অনেকটা সময় পাওয়া যাবে।

–আজকে ভালো টাকা জমেছে তাই তো?

হায় ঈশ্বর, এরা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করবেন? মেগান ভাবলেন, সামান্য উত্তেজনা।

.

তারা ভেলাডরি শহরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছেন। জাইমে বললেন- জনগণের ভিড়ে লুকিয়ে থাকতে হবে। আজকে বুল ফাইটের লড়াই, হাজার হাজার মানুষ এখানে আসবে। কেউ যেন কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হই, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

কথা বলতে বলতে জাইমে জনগণের সঙ্গে মিশে গেলেন। মেগান এত মানুষের সমাবেশ কখনও দেখেননি। পথচারীরা আনন্দের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন। গাড়ি এবং মোটর সাইকেল। বুল ফাইটের আসর জমে উঠবে। টুরিস্টরা এসেছেন, আশেপাশের শহর থেকে আরও নাগরিক। ছোটো ছেলেদের দেখা গেল নকল যুদ্ধের মহড়া দিতে।

শব্দ এবং শব্দ, কত রকম খাবার বিক্রি হচ্ছে। এটা সেটা কত কী?

মেগানের মনে হল, সত্যি খিদে পেয়েছে।

ফেলিক্স বললেন– জাইমে আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। আমরা কিছু কিনে খাব কি?

মেগানের হাতে কিছু খাবার তুলে দেওয়া হল।

খাবারটা চমৎকার। অনেক বছর বাদে মেগান রাস্তার খোলা খাবার খেতে পারলেন।

এইদিকে অ্যারেনা। জাইমে বললেন।

পার্কের মধ্যিখানে আসর বসবে, অ্যারেনাতে অনেক মানুষের ভিড়, চারটে টিকিট কাটার ঘর রয়েছে। লোকের লাইন পড়ে গেছে।

–আমরা কি ষাঁড়ের লড়াই দেখব? মেগান জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ, দেখবো, দেখবেন কেমন উত্তেজনা। ফেলিক্স জবাব দিলেন।

মেগানের মনে নানা চিন্তার ভিড়, ফেলিক্স জবাব দিলেন– মাদ্রিদ আর বাকটোনাতে আসল লড়াই হয়। এখানে বুল ফাইটের আনন্দ নেই। নবীনরা যোগ দেয়, অ্যামেচারের দল। তাদের শক্তি নেই, সাহস নেই। মেগানের মনে হল, তাও তো উত্তেজনা থাকবে।

ওঁরা অ্যারেনাতে প্রবেশ করলেন। দেওয়ালে একটা পোস্টার রয়েছে। মেগান তাকালেন। জাইমে মিরার ছবি, তলায় লেখা আছে, হত্যার জন্য খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। দশলক্ষ পেস্তা পুরস্কার দেওয়া হবে, জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে।

বোঝা গেল, যে মানুষটির সাথে মেগান হাঁটছেন, তিনি হলেন এক ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী, জাইমে ছবির দিকে তাকালেন– অনেকটা আমার মতো দেখতে, তাই নয়! তিনি চট করে পোস্টারটা ছিড়লেন, পাট করে পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন।

অ্যাম্পারো অবাক হয়ে গেছেন। একটা পোপার ছিড়লে কী হবে? সরকার কি আর বসে আছেন? হাজার হাজার পোস্টার ছেপে চারদিকে লটকে দিয়েছে।

জাইমে ভাবলেন, এই পোস্টারটা বোধহয় আমাদের জন্য সৌভাগ্য বহন করবে।

মেগানের চিন্তা এখন শান্ত হয়ে গেছে।

আমরা ভেতরে যাব।

বারোটা দরজা, এই বিশাল বাড়িটির মধ্যে। লাল লোহার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। মানুষজন হৈ হৈ করছে। জাইমে ইতিমধ্যে টিকিট কেটেছেন। পাথরের বেঞ্চের ওপর বসার ব্যবস্থা। ছোটোবেলায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি দেখতেন মেগান, মাদ্রিদে, হাজার লোকের সমাবেশ, কিন্তু এখানে অত আতিশয্য নেই।

ষাঁড়ের লড়াই শুরু হল। মেগান চোখ ভোলা রেখেছেন, সবকিছু তাঁকে দেখতে হবে। বিরাট একটা ষাঁড় ঢুকে পড়েছে, ওপাশ থেকে একটা মানুষকে দেখা গেল।

জাইমে তাকিয়ে আছেন মেগানের মুখের দিকে। জাইমের মনে হচ্ছে, ষাঁড়ের লড়াই মেয়েটিকে অসুস্থ করবে।

কিন্তু, সময় এগিয়ে চলেছে, লড়াই বেঁধে গেছে। উত্তেজনা, দুপক্ষ সমান লড়ছে।

বুল ফাইটের কথাগুলো মেগান পরপর বলে যাচ্ছেন, কিছু ইঙ্গিত কিছু সংকেত।

জাইমে অবাক হয়ে গেছেন সিস্টার, এ ব্যাপারে এত শব্দ আপনি জানলেন কী করে?

মেগান জবাব দিলেন আমার বাবা ছিলেন বুলফাইটার। ভালো করে দেখুন।

অ্যাম্পায়োর হঠাৎ মনে হল, জাইমে বোধহয় এই সিস্টারের প্রতি একটু বেশি আকর্ষণ বোধ করছে। কিন্তু কেন?

একজন ফেরিওয়ালাকে দেখা গেল, সে চট করে জাইমে মিরোর হাতে কিছু একটা খুঁজে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল, জাইমে উঠে দাঁড়ালেন।

মেগান প্রশ্ন করলেন কী হয়েছে? চিন্তার কোনো কারণ ঘটেছে কি?

জাইমে বললেন- আমরা এখুনি লগনোর দিকে যাত্রা করব। সিস্টার, আপনি আমাকে লক্ষ্য রাখবেন। গেটের দিকে এগিয়ে আসবেন।

জাইমে অতি দ্রুত পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। জাইমে চোখের বাইরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মেগান উঠে দাঁড়ালেন। জনগণের মধ্যে থেকে চিৎকার শুরু হয়েছে। এক অল্পবয়সী মাতাডোর শুয়ে পড়েছে, তার শরীরের সর্বত্র ক্ষতচিহ্ন। রক্ত বেরিয়ে আসছে, বালিতে রক্ত মিশে যাচ্ছে।

জাইমে অ্যাম্পারো এবং ফেলিক্স প্রবেশ পথের একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

জাইমে বললেন–তাড়াতাড়ি ছুটতে হবে।

ফেলিক্স জানতে চাইলেন–কী হয়েছে?

সৈন্যরা টমাসকে মেরে ফেলেছে, রুবিও ধরা পড়েছে, মদের আসরে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল সে।

মেগান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন সিস্টার, থেরেসা আর লুসিয়ার খবর কী?

–আমি জানি না, তাড়াতাড়ি করতে হবে, ব্যাঙ্কে লোকের ভিড় জমে উঠবে।

জাইমে চকিতে তার হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকালেন।

ফেলিক্স বলেছিলেন– আমরা আরেকটু অপেক্ষা করব কি? ঘণ্টা দুয়েকের জন্য?

মেগানের মনে নানা চিন্তার ভিড়।

তারা অ্যারেনা থেকে বাইরে চলে এসেছেন। ফেলিক্স একটা নীল রঙের সেডান গাড়ির দিকে তাকালেন।

ফেলিক্স বললেন- এটা কী হতে পারে।

গাড়িটা খুলে ফেলা হল গোপন চাবি দিয়ে। তারপর? অ্যাম্পারো বললেন– এবার এমন অভিনয় করুণ, মনে হবে আপনি বুঝি সত্যিই সিস্টার। যিশুর দোহাই, এখন কোনো গোলমাল করবেন না।

সামনে দুজন পুরুষ যাত্রী, জাইমে গাড়ি চালাচ্ছেন। অ্যাম্পায়রা পেছনের সীটে বসেছেন।

মেগান তার পাশে বসে পড়লেন। মেগান চোখ বন্ধ করেছেন।

হায় ঈশ্বর, এ কোন্ পাপ কাজের সঙ্গে আমাকে যোগ দিতে হল।

জাইমে বললেন- আমরা এই গাড়িটা চুরি করব না। এটাকে আমরা বাসকোর নামে অধিগ্রহণ করেছি।

.

নতলা বাড়ি, তারই একতলাতে ব্যাঙ্কের অবস্থিতি। গাড়িটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। জাইমে ফেলিক্সকে বললেন- ইঞ্জিনটা চলতেই থাকবে। কোনো সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে চলে আসব।

ফেলিক্স অবাক হয়ে তাকালেন– কী বলছেন? আপনি একা যাবেন? এটা হতে পারে না। জাইমে, ব্যাপারটায় বিপদ আছে।

জাইমে বললেন আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে, আমার জন্য চিন্তা করো না।

জাইমে হারিয়ে গেলেন ব্যাঙ্কের মধ্যে।

মেগানের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়েছে, মেগান প্রার্থনা করলেন, কনভেন্টে যেমন করতেন–

প্রার্থনার মাধ্যমেই আমরা হৃদয়ের উদ্বোধন ঘটাতে পারি। প্রার্থনা হল ধৈর্য, প্রার্থনা হল সেই অনির্বাণ শিখা, আমার হৃদয় শান্তিতে পরিপূর্ণ হোক।

কিন্তু মেগানের মন শান্ত হবে কী করে?

.

জাইমে মিরো দ্রুত ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকে গেলেন। কাজকর্ম ঠিক মতো এগিয়ে চলেছে। কোথাও অশান্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। তিনি চট করে কাউন্টারে বসে থাকা লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকটি একমনে ফাইল দেখছিল। জাইমে পকেট থেকে পোস্টারটা বের করলেন। লোকটির সামনে পোস্টারটি খুলে ধরলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন- দেখুন তো, মিল পাচ্ছেন কি না?

পোস্টারটির দিকে তাকালেন ওই ভদ্রলোক, তারপর জাইমেকে দেখলেন। চোখ দুটো কপালে উঠে গেছে তার। হায় ঈশ্বর, সেই ভয়ংকর খুনে সন্ত্রাসবাদী! চোখের নিমেষে যিনি মানুষ হত্যা করতে পারেন। ভদ্রলোক ঠকঠককরে কাঁপছেন।কাতর কণ্ঠস্বরে বলছেন- দোহাই, বাড়িতে আমার বউ ছেলেমেয়ে আছে। আমি টু শব্দটি করব না। আমাকে মারবেন না।

.

জাইমে হাসলেন, সাপের মতো নীরব শীতল হাসি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। ক্যাশিয়ারের দিকে। সেখানে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্যাশিয়ারের চোখ মুখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, শীতল শিহরণ মেরুদণ্ড বেয়ে। চাবির গোছার

দরকার হল না। টাকার স্তূপ, টেবিলের ওপর, ভালোই আমদানি হয়েছে আজ। ব্রিফকেস তৈরি ছিল পাশেই, জাইমে টাকা ভরে নিলেন। টা টা গুডবাই করতে করতে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলেন, না, অপারেশনটা সত্যিই ভালো হয়েছে।

গাড়িটা স্টার্ট দেওয়া অবস্থাতেই ছিল। দ্রুত হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলল। জাইমে পাশে বসে থাকা মেগানের দিকে তাকালেন। এ কী? ভুল করে গাড়িটা অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। এখানে ওয়ান ওয়ে, ট্রাফিক সার্জেন্ট ছুটে এসেছেন–দেখি মিস্টার আপনার রেজিস্ট্রেশনটা।

জাইমে জানেন, এখনই কিছু একটা ঘটবে।

অভ্যাসবশত পিস্তলে হাত দিলেন। পেছনে বসে থাকা অ্যাম্পায়ো তৈরি। এখনই রক্তারক্তি শুরু হবে।

কিন্তু এ কী? নারীকণ্ঠে আর্ত চিৎকার। রাস্তার ওপর একটা মেয়ে শুয়ে পড়েছে, একটা উন্মত্ত পুরুষ তাকে প্রচণ্ড পেটাচ্ছে। আর একটু হলেই ও হয়তো মরে যাবে। ট্রাফিক সার্জেন্ট সেদিকে ছুটে গেলেন। চোখের নিমেষে জাইমে গাড়িটাকে অন্য হাইওয়েতে ঢুকিয়ে দিলেন। নিরাপদ দূরত্বে আসার পর একটুখনি থামলেন।

মেগানের দুটি চোখে বিস্ময়– ভাগ্যিস, ওই ঘটনাটা ঘটল। তা না হলে কী যে হত?

জাইমে হাসছেন সিস্টার, সবকিছু আমাদের সাজানো নাটক। ভাববেন না, আমরা এখানে একা, সমস্ত দেশ জুড়ে এমন অনেক বন্ধু আছে আমাদের। তারা এভাবেই আমাদের সাহায্য করে।

মেগান আরও অবাক হয়েছেন। হায় ঈশ্বর, একদল সন্ত্রাসবাদী, চুরি করা একটা গাড়ি, ব্যাঙ্ক থেকে লুট করা টাকা নরকের এ কোন অন্ধকারে তুমি আমাকে নিয়ে এলে!

৬. কর্নেল র‍্যামন আকোকা

৩১.

কর্নেল র‍্যামন আকোকাকে দেখা গেল। সহকারীদের সঙ্গে গভীর গোপন আলোচনায় মেতে উঠেছেন। বিরাট এক ম্যাপ টেবিলের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল বললেন– মিরো এখন বাসকোর অধিকৃত অঞ্চলের দিকে চলেছেন। এটা সুনিশ্চিত।

তার মানে? বারগোস ভিক্টোরিয়া লগরনো, পাম্পালোনা অথবা সান সেবাসটিয়ান?

আকোকা ভাবলেন, সান সেবাসটিয়ানে পৌঁছোনোর আগেই লোকটাকে ধরতে হবে।

টেলিফোনে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আপনি কিন্তু সময় হারাচ্ছেন।

.

বারগোসের দিকে রাস্তা চলে গেছে। জাইমে শান্তভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন। শেষ অব্দি তিনি কথা বললেন- ফেলিক্স, সান সেবাসটিয়ানে পৌঁছে একটা কাজ করতে হবে। রুবিওকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে।

–সিস্টার লুসিয়ার খবর কী?

মেগান জানতে চাইলেন।

সিস্টার লুসিয়া কি ধরা পড়েছেন?

জাইমে বললেন– লুসিয়ার অবস্থা খুবই খারাপ। পুলিশ তাকে খুনের আসামি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এখন জিজ্ঞাসাবাদের পালা চলেছে।

এই খবরটা মেগানকে অবাক করে দিল। সিস্টার লুসিয়াকে মেগান ভালোইবাসতেন।

একটু বাদে সামনে তিনটে ট্রাক দেখা গেল, সৈন্যদলে ভরতি।

জাইমে পাশের রাস্তাটার দিকে যাবার চেষ্টা করলেন। হাইওয়ে এন ১২০

সান ডোমিংগো, সামনের দিকে, সেখানে একটা পুরোনো দুর্গ আছে। আমরা আজ রাতটা এখানেই কাটাব।

দূর থেকে দুর্গের রেখা দেখা গেল। পাহাড়ের একেবারে ওপরে। জাইমে গ্রামের পথ ধরেছেন। ধীরে ধীরে দুর্গন্টা আরও কাছে এসে গেল। কয়েকশো গজ দূরে একটা মস্ত বড়ো লেক।

জাইমে গাড়িটা থামালেন। সবাই ধীরে ধীরে নেমে এলেন।

এবার গাড়িটার অন্তিম দশা ঘটাতে হবে। জাইমে অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিলেন। গাড়িটাকে উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে ধাক্কা দেওয়া হল। একটু বাদে গাড়িটা লেকের জলে ডুবে গেল। পাপের কোনে চিহ্ন রইল না কোথাও।

মেগান একবার ভেবেছিলেন, তাহলে আমরা লগরনো যাব কী করে? পরমুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারলেন, আর একটা গাড়ি তৈরি করা হবে।

পরিত্যক্ত এই দুর্গ, বিশাল পাথরের প্রাচীর, বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ফেলিক্স মেগানকে বললেন– পুরোনো দিনে এখানেই রাজকুমাররা থাকতেন। অনেক সময় আবার বন্দীদের এখানে আটকে রাখা হত।

তারা পাথরের দরজার ভেতর প্রবেশ করলেন। এখানেই আজ রাতে থাকতে হবে। মেগান ভাবলেন।

জাইমে বললেন- তোমরা তোমাদের ঘর পছন্দ করে নাও।

অ্যাম্পারো মেগানের দিকে তাকিয়ে বললেন- সিস্টার, আমাকে অনুসরণ করুন।

কয়েকটা পাথরের ছোটো ছোটো ঘর চোখে পড়ল। ঠান্ডা এবং পরিত্যক্ত। কয়েকটা বেশ বড়ো।

অ্যাম্পায়রা সবথেকে বড়ো ঘরে ঢুকে বললেন– জাইমে আর আমি এখানেই শোবো।

তিনি মেগানের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন আপনি কি ফেলিক্সের সাথে শোবেন?

মেগান কোনো কথা বললেন না।

অথবা, অ্যাম্পায়ো বলতে থাকলেন, ইচ্ছে হলে আপনি জাইমের সঙ্গে শুতে পারেন। ভয় নেই, জাইমে আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।

মেগান রাগত স্বরে জবাব দিলেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর মধ্যে আমাকে জড়াবেন না।

.

এক ঘন্টা বাদে জাইমে এবং ফেলিক্স দুর্গে ফিরে এসেছেন। জাইমে দুটো খরগোস ধরেছেন। ফেলিক্স কাঠ নিয়ে এসেছেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁচা মাংস ঝলসানো, আঃ, এটাই বোধহয় উপাদেয় খাবার।

ফেলিক্স বললেন- হে ভদ্রমহিলারা, আজ রাতের ডিনারে এর থেকে বেশি ব্যবস্থা করতে পারিনি। লগরনোতে গিয়ে সুস্বাদু খাবার খাওয়াব, কথা দিচ্ছি।

খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হল, এবার ঘুমোত হবে।

অ্যাম্পারো বললেন- এসো, এসো, আমাদের বেডরুমটা কেমন, একবার দেখবে এসো।

মেগান দেখতে পেলেন, হাতে হাত রেখে ওঁরা ওপরের দিকে চলে গেলেন।

ফেলিক্স জানতে চাইলেন সিস্টার, আপনি কোথায় শোবেন ঠিক করেছেন?

হ্যাঁ, আমার জন্য ভাববেন না। শুভরাত্রি। মেগান বললেন।

মেগানের হাতে ফেলিক্স একটা শ্লিপিং ব্যাগ তুলে দিয়ে বললেন- শুভ রাত্রি, সিস্টার।

মেগান চোখ বন্ধ করলেন। চারপাশের লোকগুলোর ভাবগতিক ভালো নয়। কেউ সন্ত্রাসবাদী, কেউ খুনি, কেউ ব্যাঙ্ক ডাকাত। ঈশ্বর জানেন, এদের পরিণতি কী হবে! আমাকে আর কতদিন এদের সঙ্গে থাকতে হবে।

কিন্তু, যদি আমরা অন্য দিক দিয়ে দেখি, তাহলে। এঁদের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। কীজন্য টাকা চুরি করছে? দেশকে স্বাধীন করার জন্য। আহা, সে একজন সাহসী মানুষ। মেগান শুনতে পেলেন জাইমে আর অ্যাম্পায়রা হাসাহাসি করছেন। তিনি একটা ছোট্ট ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুয়ে পড়লেন। ঈশ্বরকে বললেন, আমাকে ক্ষমা করো! কিন্তু কেন? আমি কী করেছি?

জীবনে এই প্রথমবার শুতে যাবার আগে মেগান ভগবানের নাম স্মরণ করতে পারলেন না। ইতিমধ্যেই তিনি শ্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

আমি এখানে কী করব? কনভেন্টের কথা মনে পড়ছে। ওই অনাথ আশ্রম, কে আমাকে সেখানে রেখে গেছে? আমি জানি না, আমার বাবা কে ছিলেন? সাহসী যোদ্ধা, নাকি এক মহান বুলফাইটার।

তারপর? মেগান ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্তহীন নিরাপত্তা।

.

ওই বন্দীশালার মধ্যে লুসিয়া কারমাইন সত্যি বোধহয় এক কিংবদন্তীর নায়িকা।

প্রহরী বলেছিল- এই ছোট্ট পুকুরে আপনি একটা বড়ো মাছ। ইতালি সরকার একজনকে পাঠিয়েছেন আপনার জন্য। আমি কি আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব।

না, আমার বন্ধু কেমন আছে?

–ও বোধহয় বেঁচে যাবে।

লুসিয়া প্রার্থনা করলেন, আবার তাকালেন ওই পাথরের প্রাচীরের দিকে। ভাবলেন, এখান থেকে আমি কবে বেরোব এবং কীভাবে?

.

৩২.

পুলিশ চ্যানেলে খবর পৌঁছে গেছে। ব্যাঙ্কে সাংঘাতিক ডাকাতি হয়েছে। কীভাবে, সেটাও অনেকে জানে।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, কর্নেল আকোকা ভেলাডোরিতে পৌঁছে গেছেন।

–আমাকে সঙ্গে সঙ্গে কেন খবর দেওয়া হল না?

দুঃখিত কর্নেল। ব্যাপারটা চোখের পলক ফেলার আগেই ঘটে গেছে।

হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে ধরতে পারলাম না।

–এটা আমাদের দোষ নয়।

–এখনই ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ারকে ডেকে পাঠাও।

কাঁপতে কাঁপতে ক্যাশিয়ার এসে হাজির।

কী করব স্যার, লোকটার হাতে ছুরি ছিল। ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী।

তার মানে জাইমে মিরো?

এবার আকোকা সুনিশ্চিত হলেন।

–সে কি একা এসেছিল?

হ্যাঁ, সে আমাকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু আমি কিছু করতে পারিনি।

দাঁতে দাঁত চেপে আকোকা সংকল্প করলেন– যে করেই হোক লোকটাকে ধরতে হবে।

.

তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। সেই স্বপ্নের মধ্যে কতগুলো কণ্ঠস্বর, কতগুলো ছায়া-ছায়া ছবি। ব্যাঙ্ক ডাকাতি, এটা আমার জন্য নয়, এটা একটা মহান কাজের জন্য। কণ্ঠটা আরও উচ্চকিত।

মেগান চোখ খুললেন। উঠে বসলেন। অদ্ভুত সব কিছু। কিন্তু এই শব্দগুলো? কোথা থেকে আসছে? ভেতর থেকে কি?

তাকিয়ে থাকলেন ক্যাসেলের সামনে। সৈন্যদের তাঁবু মনে হয় তা হলে? ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। জাইমে কোথায়? এখনই জাইমেকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

মেগান পায়ে পায়ে চলে গেলেন সেই ঘরটির মধ্যে, যেখানে জাইমে আর অ্যাম্পায়রা শুয়ে আছেন। ঘরটি ফাঁকা। তিনি রিসেপশন হলে এলেন। জাইমে এবং অ্যাম্পায়ো সামনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ফিসফিস করে কথা বলছেন।

ফেলিক্স বললেন- আমি পেছন দিকটা দেখে এসেছি। সেখান দিয়েই পালাতে হবে।

-কেন? আমরা জানলা গলে পালাব?

জানলা খুবই ছোটো।

তার মানে? মেগান ভাবলেন, আমাদের ধরে ফেলা হয়েছে!

জাইমে বললেন- ইস, একটুর জন্য ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

অ্যাম্পায়রা জানতে চাইলেন, তাহলে এখন কী হবে?

–হয়তো ওরা এমনি এসেছে। এখানে চুপচাপ থাকতে হবে, ওরা চলে যাবার পর...

কিন্তু সামনের দরজাতে শব্দ হল। থমথমে কণ্ঠস্বর– দরজাটা খুলে ফেলতে হবে, এখনই।

জাইমে এবং ফেলিক্স চোখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। বন্দুক উদ্যত।

আবার সেই কণ্ঠস্বর ভেতরে কেউ আছে, দরজা খুলে ফেলো।

আম্পারো আর মেগানকে বলা হল, এখান দিয়ে চলে যাও।

শেষ হয়ে গেছে, মেগান ভাবলেন, অ্যাম্পায়রা জাইমে এবং ফেলিক্সর আড়ালে চলে গেলেন। কত জন সৈন্য? অন্তত দুজন। সুযোগ একটা নিতে হবে।

মেগান সামনের দরজাটা খুলে দিলেন। তারপর বললেন- হায় ঈশ্বর, ভগবান আপনাদের পাঠিয়েছেন। আপনারা না এলে যে কী হত!

.

৩৩.

আর্মি অফিসার মেগানের দিকে তাকালেন– আপনি কে? এখানে কী করছেন? আমি ক্যাপ্টেন রডডিগুয়েজ, আমরা...

ক্যাপ্টেন, আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন। আমার দুই শিশুপুত্রের টাইফয়েড হয়েছে। আমি একজন ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলাম।

টাইফয়েড?

-হ্যাঁ, জ্বরে ওরা কাঁপছে। ওরা অত্যন্ত অসুস্থ। আপনি কি আপনার সৈন্যদের ডেকে আনবেন, ওদের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

–সিনোরা, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? ভয়ংকর অসুখ।

তাতে কী হয়েছে। ওরা আপনার সাহায্য প্রার্থী। ওরা এখনই মরে যাবে হয়তো। মেগান অসহায়ের মতো আর্তনাদ করতে থাকলেন। ভদ্রলোকের চোখেমুখে বীভৎস অসহায়তা।

–আমি এখন চলে যাচ্ছি।

–না, এমন করবেন না।

–ভেতরে চলে যান, আমি পুলিশকে খবর দিচ্ছি। অ্যাম্বুলেন্স আসবে।

–কিন্তু?

–এটা একটা আদেশ, সিনোরা। ভেতরে চলে যান।

উনি বললেন– সার্জেন্ট আমরা এখনই এখান থেকে চেলে যাব।

মেগান দরজাটা বন্ধ করলেন।

জাইমে মেগানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন অসাধারণ, অসাধারণ অভিনয়, আপনি কী। করে শিখলেন?

মেগান বললেন- আমি যখন অনাথ আশ্রমে ছিলাম, তখন শিখেছিলাম কীভাবে বাঁচতে হয়। আশা করি ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন।

ক্যাপ্টেনের মুখখানা দেখতে পেলে ভালো হত। টাইফয়েড, হায়। জাইমে হাসলেন। মেগানের দিকে তাকালেন সিস্টার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

সৈন্যরা চলে গেল।

জাইমে বললেন- এখুনি এখানে পুলিশ আসবে, যাইহোক, আমরা এখনই লগরোনোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

.

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। এবার যাত্রা শুরু হবে।

আধ ঘণ্টা পর তারা একটা সেডান গাড়ির কাছে এসে থামলেন।

জাইমের পাশে মেগান বসেছেন। ফেলিক্স এবং অ্যাম্পায়ো পেছনের সিটে। জাইমে মেগানের দিকে তাকালেন। টাইফয়েড! আবার তিনি হেসে উঠলেন।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। মাঝে মধ্যেই দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে। জাইমের দৃষ্টিতে ফুটেছে কৃতজ্ঞতা।

পুরোনো দিনের ঘটনা? তিনি কি জানতে চাইবেন?

হা, মেগান ধীরে ধীরে বলছেন, আমার মা-বাবার পরিচয় আমি জানি না। পনেরো বছর আমি কনভেন্টে ছিলাম। পনেরো বছর!

–সিস্টার, আপনার কথা শুনে অবাক লাগছে। মনে হচ্ছে, আপনি বুঝি অন্য গ্রহের বাসিন্দা।

মেগান চোখ বন্ধ করলেন। জাইমে জানতে চাইলেন– আপনি কি আবার কনভেন্টে ফিরতে চাইছেন।

–অবশ্যই।

-কেন? এত বড়ো পৃথিবী, এত আনন্দ কবিতা, পিকাসো, লোরকা, পিজারো, ডেসেটো করটেজ, এমন সোনার দেশ, সব কিছু ছেড়ে আপনি ওই অন্ধকারায় ফিরে যাবেন?

হঠাৎ মেগানের মনে হল, আপাত রুক্ষ ওই মানুষটির মনে এক টুকরো ভালোবাসার আগুন আছে।

জাইমে বললেন– আপনার সাথে আগে আমি কথা বলিনি, আসলে চার্চ সম্পর্কে আমার মনোভাব খুব একটা ভালো নয়।

তাই কি? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

হয়তো তাই। জাইমে ভাবলেন। চার্চ মাঝে মধ্যে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ করে।

তিনি বললেন- আপনার চার্চ ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করেছিল। সাধারণ অসহায় মানুষের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার করে।

–সত্যি কি? আমি বিশ্বাস করি না।

-হ্যাঁ, আপনি হয়তো ইতিহাস পড়েননি, অথবা সব জেনেও চুপ করে আছেন।

কথা এগিয়ে চলেছে, পথ ফুরিয়ে আসছে। শেষ অব্দি তারা পথের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন।

এখনও কিছুটা বাকি আছে, ঘন অরণ্য সামনে।

জাইমে বললেন- আমরা লগরোনোর তিরিশ মাইলের মধ্যে চলে এসেছি। দুদিনের মধ্যে হয়তো আর কারও সাথে কারও দেখা হবে না। কাল আমরা ভিক্টোরিয়ার দিকে যাব। তারপর লগরোনো। সিস্টার, আপনি কি মেনডাভিয়ার কনভেন্টে চলে যাবেন?

মেগান জানতে চাইলেন- আপনি কী বলছেন?

–আপনি কি আমার জন্য চিন্তিত, সিস্টার?

মেগানের চিবুকে রক্তাভা।

–আমার কিছুই হবে না, জাইমে বললেন, আমি সীমান্ত পেরিয়ে ফ্রান্সে চলে যাব। মেগান বললেন- ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ জীবন লাভ করুন।

–প্রার্থনা করুন, শুধু আমার জন্য নয়, সকলের জন্য। এখন একটু ঘুম দরকার। কাল আমরা লিয়নে পৌঁছে যাব।

মেগান শুতে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, অ্যাম্পায়রা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘৃণা, . শুধু ঘৃণা ঝরছে অ্যাম্পায়োর দুটি চোখের তারায়।

না, কোনো মানুষ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কেউ না, মেগান ভাবলেন।

.

৩৪.

সকাল হয়েছে, তারা ভিক্টোরিয়ার কাছে একটি গ্রামে পৌঁছে গেছেন। গ্যারেজের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। জাইমে গ্যারেজের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

মেকানিক জানতে চাইলেন- কী হয়েছে?

জাইমে বললেন– এই গাড়িটা মোটেই কাজ করছে না। এটার কোনো গতি নেই। বুড়ো মেয়ের মতো, শক্তি নেই।

–আমার স্ত্রীর মতো মনে হয়, মেকানিকমুখ খিঁচিয়ে বলল, কারবুলেটরে কোনো অসুবিধা?

জাইমে কাঁধ ঝাঁকালেন– গাড়ি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আমার একটা জরুরি দরকার আছে। কালকে মাদ্রিদ পৌঁছোতে হবে। আজ বিকেলের মধ্যে গাড়িটা সারাতে পারবেন?

দুটো কাজ আছে, তারপর।

–আমি দ্বিগুণ দেব।

মেকানিকের মুখে উজ্জ্বলতা– দুটোর সময় আসুন।

–ঠিক হবে কি? আচ্ছা, কিছু খেয়ে আমরা আসছি।

জাইমে তাকালেন অন্যদের দিকে। তারা এই কথাবার্তা শুনছিলেন।

জাইমে বললেন- ভাগ্য ভালো, আমাদের গাড়ি ঠিক হবে। চলুন, কোথাও খাওয়া যাক।

ফেলিক্স অবাক হয়ে জানতে চাইলেন– জাইমে, গাড়িটা তো চমৎকার। তবে গ্যারেজে কেন?

জাইমে হাসলেন পুলিশ গাড়িটার ওপর নজর রাখবে। চোরাই গাড়ি তো। বেশিক্ষণ তারা এই ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। দুটোর মধ্যে সব ফাঁকা হবে। তারা পথেঘাটে সব খোঁজ করবে। গ্যারেজে ঢু মারবে না।

জাইমের বুদ্ধিকে মেগান প্রশংসা করলেন।

জাইমে বললেন- এখুনি একটা ফোন করতে হবে। একটু অপেক্ষা করো।

অ্যাম্পারো জাইমের সঙ্গে যাবার জন্য চেষ্টা করলেন। মেগান এবং ফেলিক্স তাকিয়ে থাকলেন।

ফেলিক্স মেগানের দিকে তাকিয়ে বললেন- কেমন লাগছে সিস্টার? জাইমের সাহচর্য?

হঠাৎ মনে হল একরাশ লজ্জা এসে মেগানকে আচ্ছন্ন করেছে।

মেগান শান্তভাবে বললেন- মানুষটা কিন্তু চমৎকার।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, একজন দেশপ্রেমিক এবং বিদ্রোহীর মধ্যে কী তফাত? কার শক্তি কত বেশি তাই তো? এছাড়া আর কোনো তফাৎ আছে কি?

মোটর যাত্রাটা চমৎকার। মনে হচ্ছে, প্রকৃতি আরও বেশি উদার হয়ে উঠেছে। জাইমেকে সব সময় এই মানসিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। তবুও মুখের কোণে হাসি। মন নিরুদ্বেগ। এত শক্তি উনি কোথা থেকে পান?

জাইমে এবং মেগান টুকটাক কথাবার্তা বলছেন। তারা পরস্পরের প্রতি আরও অনুরক্ত হয়ে উঠছেন। অ্যাম্পায়রা চোখ স্থির রেখেছেন। সবকিছু তাকে শুনতে হবে।

জাইমে বললেন- তখন আমি এক ছোট্ট ছেলে ছিলাম, ভেবেছিলাম একজন মহাকাশযাত্রী হব। দেখলাম, আমার মা-বাবা, ভাই-বোন সকলকে মারা হল। বন্ধুদের হত্যা করা হল। ভয়ংকর একটা ঘটনা, রক্তাক্ত পৃথিবী। মাথা থেকে আকাশ হারিয়ে গেল। নক্ষত্র, মুখ লুকোল। মনে হল তারা বুঝি লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষের দূরের বস্তু। স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিলাম। এই রক্তাক্ত পৃথিবীতে বাঁচতে হবে, মাথা উঁচু করে। তাই তো আমি হাতে বন্দুক নিয়েছি। আজ আমার পরনে সন্ত্রাসবাদীর পোশাক।

–কিন্তু এর থেকে মুক্তি নেই। এই অনিশ্চয়তার জীবন?

মেগান জানতে চাইলেন।

-জানি না, যিশুখ্রিস্টকে আমার ভালো লাগে না। মহম্মদ এবং গান্ধি, আইনস্টাইন এবং চার্চিল। ভাবুন তো, এঁদের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কি? না, কোনো কিছুই আমি ভাবতে চাই না।

এখন আমার সামনে একটাই পথ। যে করেই হোক দেশের স্বাধীনতা আনতেই হবে।

মেগানের মনের ভেতর শীতলতা, তিনি বুঝতে পেরেছেন, জাইমের মধ্যে ছাই চাপা আগুন আছে। কিন্তু জাইমে কি সফল হবেন তার এই প্রয়াসে।

শেষ পর্যন্ত একটা সুন্দর হোটেলের সামনে তারা পৌঁছোলেন। চিকেনের টুকরো, কফি, আরও কত কী। ভীষণ-ভীষণ খিদে পেয়েছিল। সকলেই খুশি হয়েছেন, এক পাত্র রেড ওয়াইন। তাও খাওয়া হল। মেগান ভাবলেন, অনেক দিন বাদে এমন একটা সুন্দর খাওয়ার আসর।

অপূর্ব রেড ওয়াইন, একটির পর একটি ডোক, শরীরটা উষ্ণ হয়ে গেল। জাগল নব উন্মাদনা, আহা, আগে কেন আমি এর স্বাদ পাইনি। মেগান ভাবলেন।

ডিনারের সময় জাইমে সব কিছু দেখছিলেন। বলা হল, একজন বিশ্বাসঘাতক এসে গেছে। কী করে তাকে সরানো যাবে? কে সে? কেন ফেলিক্স?

ফেলিক্সের কথা মনে পড়ে গেল। মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল।

আম্পায়য়রা জানতে চাইলেন- এবার কোথায় যাব আমরা?

–জানি না, যখন-তখন আমাদের পরিকল্পনা পাল্টাতে হবে।

জাইমে মেগানের দিকে তাকালেন। সিস্টার, আপনি কি মেনডাভিয়াতে যাবেন?

মেগান অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জাইমের দিকে তাকালেন। কী করা যায়? এই পুরুষকে একা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

কিন্তু ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কেউ জানে না আগামীকাল কী ঘটবে।

.

সকাল হয়েছে, জাইমে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। সেখানেই রাত কেটেছে। পোশাক একেবারে পাল্টে গেছে। দেহের রং কালো কুচকুচে, মাথায় পরচুল, মস্ত বড়ো পাকানো গোঁফ। ছেঁড়া ফেঁড়া পোশাক। দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

জাইমে বললেন- শুভ সকাল, মনে হচ্ছে কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

তারপর? মেগানের অবাক হবার পালা। কতগুলো বাড়িতে জাইমে বসবাস করেন। এত বন্ধু এবং সহগামী?

মেগান ভাবলেন, এই মানুষটির জন্য হয়তো আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না।

.

অ্যাম্পায়রা ব্রেকফাস্ট তৈরি করেছেন। মোটামুটি খারাপ নয়। চাও তৈরি করেছেন। চিপস। হটস চকোলেট। খেতে খেতে কথা হচ্ছে।

–আমরা কতদিন এখানে থাকব?

জাইমে বললেন– সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসা অব্দি।

হঠাৎ টেলিফোনটা আর্তনাদ করে উঠল। অ্যাম্পায়রা ছুটে গেলেন। ফোন ধরলেন। ফিরে এসে বললেন- প্যাকো ডাকছে।

-কোথায়?

–গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর সে দেবে। তোমাকে এখনই টাইম স্কোয়ারে চলে যেতে হবে। পনেরো মিনিটের মধ্যে।

চিন্তিত মনে জাইমে ভাবতে থাকেন, তাহলে এখনই যাত্রা করা উচিত।

ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে গেছে, কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কে? জাইমে ভাবতে পারছেন না। ফেলিক্স অথবা অ্যাম্পারো? তা কী করে হবে? এ দুজনকেই তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন।

জাইমে বেরিয়ে গেলেন। মেগান ইতস্তত পায়চারি করছেন। মনটা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ভালো নেই। টেলিফোন বেজে উঠল- ঝনঝনাত শব্দে।

অ্যাম্পায়োর কণ্ঠস্বর– আমার টাকাটা? কখন আমি পাব? হ্যাঁ, জাইমে বেরিয়ে গেছে। হেঁটে হেঁটে, সে যাচ্ছে। সকলকে ওখানে আসতে বলে দাও। মিনিট পনেরোর মধ্যেই পার্কে পৌঁছে যাবে। মনে রেখো, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ ওকে মারবে না। কথা ঠিক থাকবে তো?

তাহলে? অ্যাম্পারোই আসল শয়তান। ভয়ের একটা অনুভূতি। শীতল শিহরণ। এখন কী হবে? অসহায় মেগান ভাবতে থাকেন।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পথে বেরিয়ে এসেছেন। ছুটছেন, একটির পর একটি গলি পার হচ্ছেন। অত্যন্ত দ্রুত। অবশেষে তিনি পৌঁছে গেলেন ওই পার্কটার কাছে।

.

জাইমে যথাস্থানে পৌঁছে অবাক হলেন, পুলিশের এত ব্যস্ততা কেন? বেশ কয়েকটা মিলিটারী জীপ দাঁড়িয়ে আছে। তা হলে এটা কি প্যাকোর কোনো চাল নাকি? অথবা অ্যাম্পারো? না, তা কেমন করে হবে। এরা দুজন আমার অনেক দিনের বন্ধু। বিপদ আপদে পাশে দাঁড়িয়েছে।

দূর থেকে জাইমেকে দেখে মেগান বুঝতে পারলেন, এ বার আর কোনো উপায় নেই। জাইমে ধরা পড়েছেন। ফাঁসি হবে তার। শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে কি? তখনই চোখে

পড়ল, প্যারাম্বুলেটরে একটি শিশু একা বসে আছে। তার মা এইমাত্র দোকানে ঢুকে পড়েছে। এই সুযোগটা নিলেন মেগান। অতি দ্রুত চলে এলেন প্যারাম্বুলেটরটার কাছে। অসহায় শিশুটিকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন পার্কের দিকে। তারপর অবাক করে দিলেন জাইমে মিরোকে। দাম্পত্যকলহ শুরু হয়েছে। একে অন্যকে নানাভাবে অভিযুক্ত করছেন। কে কতটা অপদার্থ তা প্রমাণ করার চেষ্টা চলেছে। পুলিশ অফিসার একবার তাকালেন। ওহ, দেশজুড়ে এত অশান্তি আর এরা কিনা সেই খিটখিটে মেজাজটা বজায় রেখেছে। অতি দ্রুত মেগান আর জাইমে পার্ক থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। না, পুলিশ এখন অন্যান্যদের নিয়ে ব্যস্ত। সকলের পকেট সার্চ করা হচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য চেয়ে পাঠানো হচ্ছে।

একটু বাদেই পুলিশ অফিসারের মনে হল, ছেলেটা তারস্বরে চিৎকার করছে কেন? কী অবাক, একালের মা-বাবার এই হয়েছে এক কাজ। প্যারাম্বুলেটরটা পার্কের এক কোণে দাঁড় করানো আছে। তাই বোধহয় ছেলেটি এত চিৎকার করছে। খিদে অথবা ভয়েতে। আর ঝগড়া করেছিল যে বর-বউ, তারা কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।

জাইমেকে ফিরে আসতে দেখে অ্যাম্পারো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ।

–এ কী জাইমে? প্যাকোর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

জাইমের শরীর দিয়ে গরম আভা বেরোচ্ছে। চোখে ফুটেছে রক্ত চাউনি। জাইমে বললেন, এবার তোমার পালা অ্যাম্পারো। তুমি তো জানো, আমার অভিধানে ক্ষমা শব্দটা নেই।

জাইমে পিস্তল তুললেন–এক-দুই-তিন। এখুনি অ্যাম্পায়োর শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। অ্যাম্পায়রা চিৎকার করে বলতে থাকেন জাইমে, এটা কী জীবন? এটা জীবনের এক বিকৃত অধ্যায়। সারাদিন লুটতরাজ, পুলিশের ভয়ে রাতের পর রাত জেগে থাকা, আমি কি এই জীবনটা চেয়েছিলাম। তোমাকে ভালোবেসে আমি সন্ত্রাসবাদীদের দলে নাম লিখিয়েছি। আমার একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ আছে। সোনালি স্বপ্ন। তোমাকে বিয়ে করে আমি সুখী হতে চেয়েছিলাম। তুমি কি আমার সেই স্বপ্নকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলে।

চুপ করো অ্যাম্পারো, চুপ করো। তোমার বকবকানি শোনার মতো সময় আমার হাতে নেই, তুমি আমাকে ভালোবাসো, কিন্তু তুমি আমাকে চরম বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলে কী করে? আজ মেগান না থাকলে আমি বেঁচে ফিরে আসতে পারতাম না।

ফেলিক্স এসে বাধা দিয়েছেন- এমন কাজ করবেন না, ক্ষমা করুন, আমি কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে যদি অ্যাম্পারো এই কাজ আবার করে, তাহলে আমি ওকে মেরে ফেলব।

অবশেষে একটা রফা হল, ঠিক হল, সবাই অ্যাম্পায়োর ওপর কড়া নজর রাখবেন। বেচাল কিছু করলে মৃত্যুই হবে তার একমাত্র শাস্তি।

জাইমে অতি দ্রুত বললেন– এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে অ্যাম্পায়োর বন্ধুরা এসে পড়তে পারে।

.

৩৫.

আকোকা প্রচণ্ড রেগে গেছেন। ভাবতে পারছেন না, কীভাবে মিরোকে হাতের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া হল।

ম্যাপটা টেবিলের ওপর মেলে ধরা হয়েছে। ওরা এখন কোথায় যেতে পারে? বাসকো অধিকৃত অঞ্চলে? তার মানে উত্তর-পূর্ব দিকে? নাকি লগবোনো? কিংবা ফ্রান্স সেবাসটিয়ান। আজ সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- কর্নেল, সময় কিন্তু হাত পিছলে চলে যাচ্ছে। সকলে খবরের কাগজ পড়েছেন। সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশ কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রাইম মিনিস্টার, আমার ওপর ভরসা রাখুন।

রাজা জোয়ান কারলোস গোটা ব্যাপারটা তদন্ত করতে বলেছেন। আমি কিন্তু আর বেশি দিন ঝুলিয়ে রাখতে পারব না।

–মাত্র কয়েকটা দিন। ইতিমধ্যে আমি মিরো আর ওই সিস্টারদের ধরে ফেলব। সামান্যক্ষণ নীরবতা।

আটচল্লিশ ঘণ্টা।

অপাস মুনডো, মনে পড়ে গেল, এই সংস্থার কাছেই কর্নেল আকোকা দায়বদ্ধ। কিন্তু রাজা কথা বললে কী হবে? স্পেনের বিখ্যাত শিল্পপতিরা রেগে গেছেন বলা হয়েছে

জাইমে মিরোকে এখনই স্তব্ধ করতে হবে। এরকম অনিশ্চিত অবস্থা চলতে থাকলে ব্যবসা গুটিয়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাব।

তার মানে? জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ? কোথায় এখন আমরা তাঁকে খুঁজব?

.

রিকার্ডো আর গ্রাসিলার এই স্বপ্নের পরিভ্রমণ এবার শেষ হয়ে গেল।

এই কদিন তারা একে অন্যকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। কথায় কথায় ভবিষ্যতের রূপকথা তৈরি করেছেন। আহা, রিকার্ডো কথা দিয়েছেন, তিনি গ্রাসিলাকে পৃথিবীর সেরা বাড়ি উপহার দেবেন।

চোখ বন্ধ করে গ্রাসিলা ভেবেছেন– সারা জীবনটা আমি সকলের সঙ্গে ভাগ করে ছোট্ট ঘরে কাটিয়েছি। প্রথম জীবনে একটুকরো ঘরের ভেতর আমি, আমার মা আর ওই অচেনা অজানা পুরুষদের দল। তারপর কনভেন্টের ছোট্ট ঘর। সিস্টারদের সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকা।

পরমুহূর্তেই গ্রাসিলার মনে হচ্ছে, রিকার্ডো একজন সৈনিক, একটি আদর্শের জন্য জীবনপাত করছেন। তিনি কি ফরাসি দেশের শান্তজীবন পছন্দ করবেন? এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কতদিন? কতদিন সময় লাগবে এই বিপ্লব সমাপ্ত করতে।

সরকার আলোচনার চেষ্টা করছেন।ইটি একিন্তু সব প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। উগ্রপন্থীদের আক্রমণের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ভালো লাগছে না, জাইমের সঙ্গে আলোচনা করতে।

এখন পিছিয়ে যাওয়া উচিত কি? রিকার্ডো এই উত্তর কোথায় পাবেন?

স্বপ্ন দেখতে দোষ কি? স্বপ্ন দেখা চলতে থাকুক।

.

সমস্ত রাত্রি ধরে তারা এগিয়ে চলেছেন। এলবুরবো এবং ফ্লোরিয়াকে পাশ কাটিয়ে, সামনে একটা পাহাড়ের চূড়ো। দূরে লগরোনো দেখা যাচ্ছে। আকাশ রেখা। গ্রাসিলা এবং রিকার্ডো শহরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেলেন।

একটা বাড়িতে লেখা আছে- সাকুগ্যাপন। পৃথিবীর সবথেকে উল্লেখযোগ্য সার্কাস। জাপান থেকে এসেছে। এক সপ্তাহের জন্য। চব্বিশে জুলাই থেকে শুরু হবে।

রিকার্ডো বললেন- এখানে, এখানেই আজ-বিকেলে ওদের সঙ্গে দেখা হবে।

.

মেগান, জাইমে, অ্যাম্পারো এবং ফেলিক্সও ওই সার্কাস পোস্টারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সকলের মনের ভেতর উত্তেজনা এবং আলোড়ন। অ্যাম্পারোকে চোখে চোখে

রাখতে হবে। ভিক্টোরিয়ার ওই ঘটনার পর থেকে অ্যাম্পারো একলা হয়ে গেছেন। সবসময় তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে।

জাইমে ঘড়ির দিকে তাকালেন সার্কাস শুরু হবে, এবার ভেতরে যেতে হবে।

.

লগরোনোর পুলিশ হেড কোয়ার্টারস। কর্নেল র‍্যামন আকোকা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

সব কিছু ঠিক-ঠাক আছে তো?

–হ্যাঁ, আপনি চিন্তা করবেন না।

আকোকার সময়সীমা ক্রমশ কমে আসছে। জানা গেছে, ওই সিস্টাররা মিরোর সঙ্গে চলেছেন, সঙ্গে অনুগামীরা আছেন। কনভেন্টে পৌঁছোনোর আগেই ধরতে হবে। অরণ্যের সবখানে সৈন্যবাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে।

জাইমে মিরো যদি বাধা দেবার চেষ্টা করে? এ ব্যাপারটাও ভাবা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে ওকে হত্যা করতে হবে।

–আর সিস্টারদের ক্ষেত্রে। তাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। স্থির চোখে আকোকা জবাব দিয়েছিলেন।

আর্দালি এসে খবর দিল, এক আমেরিকান দেখা করতে চাইছেন। উনি সিস্টারদের সম্পর্কে কিছু খবর দেবেন।

অ্যালান টাকার প্রশ্ন করলেন আমি জানি আপনারা অ্যাবে সিস্টারসিয়ানের সিস্টার মেগান সম্পর্কে খোঁজ করছেন? তাই তো?

কর্নেল তাকালেন– এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?

–আমিও ওনার খোঁজ করছি।

অবাক কাণ্ড, কর্নেল আকোকা ভাবলেন, এই আমেরিকান ওই নানকে কেন খুঁজছেন?

-কেন বলুন তো?

কর্নেল, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। যদি কোনো খবর পান আমাকে জানাবেন কি?

টেলিফোন নম্বর এবং ঠিকানা কর্নেলের হাতে তুলে দেওয়া হল।

আকোকা বললেন ঠিক আছে আমি জানাব।

.

সমস্ত দেশ এখন হন্যে হয়ে ওই চারজন সিস্টারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে প্রেস রিপোর্টাররা কর্নেলের কাছে হাজির হচ্ছেন।

ওঁরা এখন উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছেন। অ্যালান টাকার ভাবলেন ওরা নিশ্চয়ই ফ্রান্স সেবাসটিয়ন পৌঁছোবেন। এখুনি সেখানে পৌঁছোতে হবে। এলেন স্কটের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা উচিত হবে কি? ঠিক ধরা যাচ্ছে না, শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে উনি এলেন স্কটকে ফোন করলেন।

.

সার্কাস শুরু হতে চলেছে, অসম্ভব ভিড় হয়েছে। মেগানরা সেখানে পৌঁছে গেছেন। আসন নির্দিষ্ট ছিল, দুটো আসন ফাঁকা ছিল।

কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। রিকার্ডো এবং সিস্টার গ্রাসিলার তো এখানে আসার কথা ছিল। আগুন চোখে জাইমে তাকালেন অ্যাম্পায়োর দিকে– এটা কি তোমার খেলা?

না, আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, এ ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না।

জনগণের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার একজন বাইসাইকেলে চালক ঢুকে পড়েছে। অসামান্য খেলা দেখাচ্ছে।

প্রশিক্ষিত একটা ভাল্লুক, তারপর জোকারদের হাসাহাসি। জাইমে তাকিয়ে আছেন। এত চিন্তায় নিমগ্ন যে, চেনা-অচেনা ঠাহর করতে পারছেন না। সময় এগিয়ে চলেছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আর মাত্র পনেরো মিনিট, তার মধ্যে যদি-ওরা না আসে– কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রিকার্ডো এবং গ্রাসিলা এসে বসে পড়েছেন।

চোখে চোখে কথা হল।

–খবরের কাগজ দেখেছেন।

খবরের কাগজ? আমরা তো পাহাড়ে ছিলাম।

জাইমে বলতে থাকেন- রুবিওকে জেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রিকার্ডো অবাক হলেন কী করে?

বাজে গোলমালে পেটে আঘাত পেয়েছিল। পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে যায়।

রিকার্ডো শান্ত হয়ে গেছেন।

কী করে বার করব?

জাইমে হাসলেন– সেটা আমার পরিকল্পনা।

গ্রাসিলা জানতে চাইলেন সিস্টার লুসিয়া? সিস্টার থেরেসা?

মেগান বললেন- সিস্টার লুসিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোনো এক হত্যার অপরাধে সে নাকি অপরাধী। থেরেসা মারা গেছেন।

গ্রাসিলা ক্রুশ এঁকে বললেন– হায় ঈশ্বর।

খেলা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু, কেউ কি খেলার দিকে দৃষ্টি দিতে পারছেন? মেগান আর গ্রাসিলা ভাবলেন, একে অন্যকে অনেক কিছু বলতে হবে। শুরু হয়ে গেল কনভেন্টে শেখা ওই প্রতীক ভাষায় কথা বলা। দুজন পুরুষ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছেন।

–রিকার্ডো আর আমি বিয়ে করতে চলেছি।

–বাঃ, সুন্দর খবর।

–তোমার কী হয়েছে?

কিন্তু, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার ইঙ্গিত মেগান কখনও শেখেননি। এখন অপেক্ষা করতে হবে।

জাইমে বললেন- আমরা বাইরে যাব। ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমাদের মেনডাভিয়াতে নিয়ে যাবে। সেখানে আমরা দুজন সিস্টারকে ছেড়ে দেব।

জাইমে অ্যাম্পায়োর হাতে হাতে দিলেন। শক্ত করে।

তারা বাইরে এলেন। রিকার্ডো বললেন–জাইমে, গ্রাসিলা আর আমি বিয়ে করতে চলেছি।

জাইমের মুখ আলোক উদ্ভাস– চমৎকার কথা। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।

তিনি গ্রাসিলার দিকে ফিরে বললেন- গ্রাসিলা, আপনার ভাগ্য ভালো। আমি কথা দিচ্ছি, এত ভালো বর আপনি কোথাও পেতেন না।

মেগান দুজনের হাত ধরে বললেন- আপনাদের জীবন শান্ত সুন্দর সুখী হোক।

মেগান ভাবলেন, এখন আমি কী করব? কোথায় যাব? ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

.

আকোকা একটা রিপোর্ট পেলেন।

এক ঘন্টা আগে ওঁদের সার্কাসে দেখা গেছে। ইতিমধ্যে ওঁরা হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছেন। একটা নীল সাদা ভ্যানে চড়ে। কর্নেল, ওরা মেনডাভিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

তাহলে? কর্নেল আকোকা হাসলেন, আমরা অনুসরণের প্রান্তসীমায় এসে গেছি। হ্যাঁ, জাইমে মিরোর সঙ্গে লড়াই করে আনন্দ আছে। তিনি এক সফল প্রতিদ্বন্দ্বী, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কর্নেল আকোকা দেখতে পেলেন, শক্তিশালী বাইনোকুলার দিয়ে, নীল সাদা ভ্যানটা একটা পাহাড়ের পাদদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। এবার তার যাত্রাপথ নীচের কনভেন্টের দিকে। গাছের আড়ালে সৈন্যদল দাঁড়িয়েছিল। কনভেন্টের চারপাশে সেনাবাহিনী পৌঁছে গেছে। এখন পালাবার কোনো পথ নেই। ধীরে ধীরে সৈন্যরা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। কর্নেল আকোকা তার ওয়াকিটকিকে ব্যস্ত রেখেছেন।

কাজকর্ম ঠিক মতো এগিয়ে চলেছে। সৈন্যদের দুটি স্কোয়াডের হাতে অটোমেটিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যে যার পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। রাস্তাটা ধীরে ধীরে আটকে দেওয়া হচ্ছে।

চিৎকার ভেসে এল আপনারা ধরা পড়েছেন। যদি বাঁচতে চান, তাহলে হাত তুলে বাইরে আসুন। আর যদি বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তাহলে সকলকে হত্যা করা হবে।

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা, তারপর ভ্যানের দরজা খুলে গেল। তিনজন পুরুষ এবং তিনজন ভদ্রমহিলা, কাঁপতে কাঁপতে হাত তুলে দিলেন।

আকোকা অবাক হয়ে গেলেন। না, জাইমে নেই, এরা একদল অচেনা অজানা অতিথি।

.

৩৬.

কনভেন্টের অবস্থান পাহাড়ের ওপর দিকে। জাইমে এবং অন্যান্যরা দেখলেন, আকোকা কী করতে চলেছেন। ওই ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীরা বেরিয়ে এসেছেন। হাত তুলেছেন, সবকিছু বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন।

জাইমে মিয়োর মনে পড়ল সেই সংলাপ।

–আপনি কে? আপনারাই বা কে?

–আমরা লগরোনোর বাইরে এক হোটেলে কাজ করি।

–আপনারা এখানে কী করছেন?

–একজন আমাদের হাতে পাঁচ হাজার পেস্তা দিয়ে বলেছে, এই ভ্যানটা কনভেন্টে নিয়ে যেতে হবে।

কে সে?

–জানি না। আমি কখনও তাকে চোখে দেখিনি।

–এটা কি তারই ছবি?

এই হল সেই ভদ্রলোক।

জাইমে বললেন- এবার আমরা এখান থেকে চলে যাব!

.

একটা সাদা স্টেশন ওয়াগন, লগরোনোর দিকে ফিরে যাচ্ছে। আড়চোখে মেগান জাইমের দিকে তাকালেন।

–আপনি কী করে জানলেন?

কর্নেল আকোকা কনভেন্টে অপেক্ষা করছেন, তাই তো? তিনি আমাকে বলেছেন–

কী?

–একটা শিয়াল নিজেকে চতুর বলে ভাবে মেগান। আমি যদি নিজেকে আকোকার জায়গাতে বসাতাম তাহলে? আমি কোথায় কঁদ পাততাম?

ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।

–তা হলে? আপনাকে কনভেন্টে রেখে আসব?

ফেলিক্স জানতে চাইলেন- এবার কী হবে?

জাইমে বললেন- আমরা আর স্পেনে থাকব না। আমরা সোজা সান সেবাসটিয়ানে যাব। সেখান থেকে ফ্রান্সে। তারপর, মেগানের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেখানেও একটা সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট আছে।

কোনো কথাই অ্যাম্পায়োর সামনে বলা হচ্ছে না। অ্যাম্পায়োকে আর কেউ বিশ্বাস করছেন না।

তার মানে? এবার সোজা সান সেবাসটিয়ান। সান সেবাসটিয়ানে বাসকোর আধিপত্য বেশি। সেখানে আকোকার কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না।

স্টেশন ওয়াগন লগরোনো শহরকে ছাড়িয়ে বাইরের দিকে চলে গেল।

ফেলিক্স বললেন– সান সেবাসটিয়ানের সব কটা পথের ওপর কিন্তু পুলিশের নজর থাকবে।

জাইমে বললেন– আমরা ট্রেনে চড়ব।

–সৈন্যরা ট্রেনগুলোকে অনুসরণ করবে। প্রত্যেক কামরাতে সৈন্য থাকবে। রিকার্ডো বললেন।

জাইমে বললেন– আমি অতটা ভাবছি না। আমাদের বন্ধুরা সর্বত্র ছড়ানো আছে। তারাই আমাদের সাহায্য করবে।

হাইওয়ের ধারে একটি টেলিফোন বুথ, কাউকে ফোন করতে হবে। জাইমে অ্যাম্পায়োকে অনুসরণ করতে থাকেন। বুথের ভেতর নিয়ে যান। দরজা বন্ধ করে দেন। হাতে উদ্যত পিস্তল।

কী বলতে হবে, জানো তো?

হ্যাঁ।

অ্যাম্পায়ো একটি নম্বর ডায়াল করলেন। কণ্ঠস্বর শোনা গেল– আমি অ্যাম্পায়ো জিরন। কর্নেল আকোকা আমার টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করছেন।

অ্যাম্পারো জাইমের দিকে তাকালেন- বন্দুকটা কথা বলার চেষ্টা করছে।

একটু বাদে আকোকার কণ্ঠস্বর– আপনি কোথায়?

বন্দুকটা কপালে শক্ত করে চেপে বসেছে– আমরা লগরোনো ছাড়লাম।

-আপনার বন্ধুরাও সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ।

জাইমের মুখ কয়েক ইঞ্চি দূরে। মুখে জন্তুর অভিব্যক্তি।

–আমরা এখন বারসিলোনার দিকে এগিয়ে চলেছি। সাদা গাড়িতে, প্রধান হাইওয়ে ধরে। জাইমে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। বাঃ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কথা শোনা হয়েছে।

.

ট্রেন যাবে সান সেবাসটিয়ানের দিকে। জাইমে ঠিক করলেন, যেখানে সাধারণ মানুষরা বসে, যে ট্রেন প্রত্যেক স্টেশনে থামে, সেই এক্সপ্রেসে উঠে পড়তে হবে। এই সময় নিশ্চয়ই আকোকার লোকজন বারসিলোনার পথঘাট অবরুদ্ধ করেছে। আমরা আলাদা আলাদা ভাবে ট্রেনের টিকিট কাটব। ট্রেনের শেষ কমপার্টমেন্টে আমাদের দেখা হবে।

জাইমে অ্যাম্পায়োকে বললেন- তুমি প্রথমে যাবে। আমি ঠিক তোমার পেছনে থাকব।

কর্নেল আকোকা যদি কোনো ফাঁদ পেতে থাকেন, তাহলে সেই ফাঁদে প্রথমে অ্যাম্পায়োকে পা দিতে হবে। তিনি পালাবার পথ পাবেন না।

অ্যাম্পায়রা স্টেশনের দিকে হেঁটে গেলেন। জাইমে তাকিয়ে থাকলেন, না, কাছে পিঠে কোনো সৈন্য চোখে পড়ছে না।

টিকিট কাটার পালা চলেছে, জাইমে মেগানের পাশের সিটে বসবেন। অ্যাম্পায়রা ঠিক উল্টোদিকে ফেলিক্সের পাশে। অন্যদিকে রিকার্ডো এবং গ্রাসিলা।

জাইমে মেগানকে বললেন- তিন ঘণ্টার মধ্যে আমরা সান সেবাসটিয়ানে পৌঁছে যাব। রাতটা সেখানেই কাটাব। সকালে ফ্রান্সে ঢুকব।

ফ্রান্সে ঢোকার পর?

–চিন্তা করবেন না, সীমান্তের পাশেই সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট আছে। আপনি কি ওখানে থাকতে চাইছেন না?

তার মানে? আমি কী চাইছি? মেগান কিছুই চাইছে না। একবার মনে হচ্ছে কনভেন্টে ফিরে গেলেই ভালো হবে। বাইরের পৃথিবীর এই সমস্যা আর ভালো লাগছে না। পরমুহূর্তে মনে হচ্ছে, না, এখানে আমি কত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছি। মেগানের আবার মনে হল, জাইমে মিরো বোধহয় আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছেন।

প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো গ্রামে এই ট্রেন থামছে। গ্রাম্য চাষীরা উঠে পড়ছে, বিষণ্ণ মুখের বউয়ের দল, উঠতি ব্যবসায়ী, চটপটে সেলসম্যান, চিৎকার হচ্ছে, কিচিরমিচির শব্দ।

পাহাড়ি পথে ট্রেন এগিয়ে চলেছে।

শেষ অব্দি সান সেবাসটিয়ান।

জাইমে বললেন মেগান, বিপদ কেটে গেছে। এটা আমাদের শহর। এখানে আমিই রাজা, একটা সেডান দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশনের সামনে, ড্রাইভার হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানালেন, বোঝা গেল, সত্যি আর কোনো ভয় নেই।

মেগান দেখলেন, জাইমে অ্যাম্পায়োকে চোখে চোখে রেখেছেন। অ্যাম্পারে পালাবার চেষ্টা করলেই ধরে ফেলা হবে।

জাইমে, ড্রাইভার বলল, প্রেস বলছে, কর্নেল আকোকা নাকি তোমাকে খোঁজার চেষ্টা করছেন?

জাইমে হাসলেন, খুঁজতে থাকুক। জিল, আমি তো বিপদের বাইরে চলে এসেছি।

আফেনিদা সানচো দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। সমুদ্র সৈকতের দিকে। গরমকাল, আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। জনাকীর্ণ পথঘাট, সমুদ্রসৈকত প্রাণবন্ত। ছোটো ছোটো প্রমোদ তরণী। আরও ছোটো নৌকো, দূরে পাহাড়, অসাধারণ দৃশ্যপট। মনে হচ্ছে এখানে অপার শান্তি বিরাজ করছে।

জাইমে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় থাকব আমরা?

হোটেল নিজায়। লারগো করটেজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আহা, আবার পুরোনো সেই বন্ধুবান্ধব...

.

নিজা একটা মাঝারি আকারের হোটেল। প্লাজা জুয়ান ডে-তে ওপর। সান মারটিন স্ট্রিটের ওপর। একটা বার্থস্কোয়ারের মধ্যে ধবধবে সাদা বাড়ি। বাদামী রঙের সাদার। মস্ত বড়ো নীল চিহ্ন। ছাদের ওপর, হোটেলের পেছনে দিকে, সমুদ্রের তলায়।

লারগো করটেজ হোটেলের মালিক, নিজে ছুটে এসেছেন, বিরাট চেহারার মানুষ।

–স্বাগতম, অনেক দিন ধরেই ভাবছি, কখন আপনি আসবেন।

জাইমে কাঁধ ঝাঁকালেন কয়েক দিন দেরি হয়ে গেছে তাই তো?

লারগো বললেন- আমি সব পড়েছি, খবরের কাগজে কী সব লিখছে। মেগান এবং গ্রাসিলার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন– আপনাদের ঘর তৈরি।

জাইমে বললেন- আমরা আজ রাতে এখানে থাকব। কাল ফ্রান্সে চলে যাব। একজন ভালো গাইড চাই। যিনি সবকিছু জানেন।

–আমি ব্যবস্থা করব। হোটেল মালিক বললেন তাহলে আপনারা মোট ছজন?

জাইমে অ্যাম্পায়োর দিকে তাকিয়ে বললেন- পাঁচ।

করটেজ জিজ্ঞাসা করলেন নাম লিখিয়েছেন? বলুন না হয়, আমি লিখে নিচ্ছি। ঘরে যান, হাত মুখ ধোন। তারপর আমরা একটা চমৎকার খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করব।

–অ্যাম্পারো আর আমি একটু বাদে যাচ্ছি, গলাটা ভেজাতে হবে। জাইমে বললেন। আমরা পরে আসছি।

লারগো বললেন– ঠিক আছে আপনি যেমন ভালো মনে করবেন।

মেগান সন্তর্পণে জাইমেকে লক্ষ্য করতে থাকেন। অবাক হয়ে গেছেন। অ্যাম্পায়রাকে নিয়ে নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনা আছে। এটা কি শান্ত শীতল হত্যাকাণ্ড? ব্যাপারটা ভাবতে গেলে গা ঘিনঘিন করে।

অ্যাম্পায়রা যেতে ইতস্তত করছেন। কিন্তু তাকে যেতেই হবে।

জাইমে অ্যাম্পায়রাকে বারের এককোণে নিয়ে গেলেন। লবির পাশে।

ওয়েটার এসে গেছে।

জাইমে বললেন– এক গ্লাস ওয়াইন।

এক গ্লাস, অ্যাস্পারো তাকালেন।

তারপর পকেট থেকে কী একটা বের করলেন জাইমে। সেটা খুললেন।

শেষ চিৎকার অ্যাম্পায়োর গলায় আমার কথা শোনো। বোঝার চেষ্টা করো আমি কেন এটা করেছি। আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। তুমি কি পাগল হয়ে গেছে?

ওয়েটার এসে গেছে, মদের গ্লাসটা রেখে দিয়েছে। জাইমে সাদা পাউডারটা ওই মদে মিশিয়ে দিলেন। ভালো করে নাড়লেন, অ্যাম্পায়োর সামনে গ্লাসটা রাখলেন। কঠিন কণ্ঠস্বরে বললেন, এখুনি খেয়ে ফেলো।

–দেখো, মৃত্যুর অনেকগুলো পথ আছে, এটাই সবথেকে সহজ এবং যন্ত্রণাবিহীন। যদি তোমাকে আমি আমাদের ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিই, তাহলে কী হবে?

জাইমে, আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি, আমাকে বিশ্বাস করো, প্লিজ।

–এটা, এখুনি তোমায় খেতে হবে।

কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য।

অ্যাম্পায়রা তাকালেন। তারপর গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললেন- তোমার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমি এটা পান করছি।

জাইমের ঠোঁটে শয়তানি হাসি। অ্যাম্পায়ো পুরো মদটা খেয়ে ফেলেছেন। ঢকঢক করে।

অ্যাম্পায়রা বললেন– এবার কী হবে?

চলো, ওপর তলায়, তোমাকে আমি বিছানাতে শুইয়ে দেব। তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। অ্যাম্পারোর চোখ জলে ভরে এসেছে। তুমি একটা বোকা, জাইমে, আমি মরতে চলেছি। কিন্তু এখনও আমি বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং ভালোবাসব।

কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। জাইমে উঠলেন। অ্যাম্পায়োকে হাতের মধ্যে নিলেন। অ্যাম্পারো হাঁটতে পারছেন না। সমস্ত ঘর জুড়ে বুঝি ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

জাইমে...

অ্যাম্পায়োকে নিয়ে লবির দিকে হেঁটে চলেছেন জাইমে। লারগোরটেজ অপেক্ষা করছেন।

জাইমে বললেন- আমি ওনাকে ঘরে দিয়ে আসছি। কেউ যেন বিরক্ত না করে।

করটেজ দেখতে পেলেন অ্যাম্পায়রাকে নিয়ে জাইমে ওপর তলায় উঠে যাচ্ছেন।

.

ঘরে বসে মেগান অনেক কিছু ভাবছিলেন। সান সেবাসটিয়ান একটি উৎসব মুখরিত শহর। মধুচন্দ্রিমার লোভে নব বিবাহিত নারী-পুরুষের ভিড়। প্রেমিক-প্রেমিকারা এই সুযোগে প্রেম করতে ব্যস্ত।

জাইমে কী করছেন? মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা এখনই হয়ে গেছে।

অনেকগুলো চিন্তা, কিন্তু আমার মনে ভিড় করছে কেন? আমি কী করতে পারি!

.

রিকার্ডো শিস দিয়ে দিয়ে পোশাক পালটাচ্ছিলেন। মনটা আজ চমৎকার তরতাজা। আমিই পৃথিবীর রাজা। ফরাসি দেশে গিয়ে আমরা বিয়ে করব। কোথায়? সুন্দর একটা চার্চে, আগামীকাল?

ঘরে বসে গ্রাসিলা চান করছিলেন। ঈষদুষ্ণ জল। রিকার্ডোর কথা ভাবছিলেন। মনে মনে হাসলেন, আমি সত্যি সত্যি ওকে খুশি করব, ঈশ্বর তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

.

ফেলিক্স কারপিও জাইমে এবং মেগানের কথা ভাবছিলেন। আহা ওদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক? হয় কি? কিন্তু এইসব সিস্টাররা তো ভগবানের অংশবিশেষ। রিকার্ডো সিস্টার গ্রাসিলার ডাক দিয়েছে? নাঃ, এটা বোধহয় উচিত হয়নি।

.

পাঁচজন এসেছেন হোটেলের ডাইনিং রুমে। অ্যাম্পায়োর কথা কেউ জিজ্ঞাসা করছেন না।

জাইমের দিকে তাকিয়ে মেগানের মনে হল, কিছু একটা ঘটে গেছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন করা উচিত হবে না।

লারগো করটেজ খাবার সাজাতে ব্যস্ত। অসাধারণ সব পদ, খেতে খুবই ভালো লাগে। অনেক দিন বাদে এমন জমজমাট খাওয়ার আসর। কী না নেই সেখানে? টমেটো থেকে শসা, মদে ভেজানো রুটির টুকরো, সবুজ সবজির স্যালাড, ভাত আর চিকেন, গোরুর মাংসের টুকরো, সসে ডোবানো, শেষকালে সরবত। অনেক দিন বাদে এত সুন্দর খাবার।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। মেগান বললেন- ঘুম পাচ্ছে, আমি এবার বিছানাতে যাব।

জাইমে বললেন আপনার সঙ্গে কথা আছে।

তিনি লবির একেবারে কোণে চলে গেলেন।

কাল...জাইমে কী জিজ্ঞাসা করবেন? মেগান কোথায় যাবেন? তিনি আর কখনই কনভেন্টের মধ্যে যাবেন না।

জাইমে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি কনভেন্টে ফিরবেন না, তাই তো?

মেগান বললেন- হা, জাইমে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মন বিক্ষিপ্ত।

জাইমে হাসলেন– মেগান, খুব তাড়াতাড়ি এই লড়াইটা শেষ হয়ে যাবে। আমরা আবার : সুখের স্বপ্ন দেখব। আমি বলছি, এখন আমার চারপাশে বিপদ, কিন্তু আপনি কি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। ফ্রান্সে আমার অনেক বন্ধু আছে। তাদের কাছে আপনি শান্ত এবং নিরাপদ থাকবেন।

মেগান তাকালেন- জাইমে, আমায় একটু সময় দেবেন।

–তা হলে? আপনি আমার প্রস্তাবে একেবারে না বলছেন না, তাই তো?

মেগান বললেন- হ্যাঁ, আমি প্রস্তাবটা একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারছি না।

সে রাতে কারো চোখে ঘুম ছিল না। অনেক কিছু ভাবতে হবে। অনেক লড়াই, মেগান তাকিয়ে ছিলেন, অতীতের স্মৃতির আন্দোলন। কতগুলো বছর কেটে গেছে অনাথ আশ্রমে, তারপর কনভেন্টে, এবার আলোকোজ্জ্বল বর্ণময় একটি জগত। জাইমে মিরো দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করছেন। আমি কাকে বিশ্বাস করব।

কোনদিকে যাব...

সকাল হল, এ প্রশ্নের উত্তর তখনও অজানা।

.

গ্রাসিলা কনভেন্টের কথা ভাবছিলেন। কনভেন্টের দিনগুলো কেমন ছিল? ঈশ্বরের কাছাকাছি ছিলাম, এখন তা আমি পাব না...

জাইমে ভাবছিলেন মেগানের কথা। মেগানকে কখনওই কনভেন্টে রাখা উচিত হবে না। মেগানকে আমি আমার বান্ধবী করব। কিন্তু মেগান কি উত্তর দেবেন...

ফেলিক্স অ্যাম্পায়োর মৃতদেহটা কীভাবে সরাকেন সেকথা চিন্তা করছিলেন। না, লারগো করটেজের ওপর এ দায়িত্ব দিতে হবে।

.

সকাল হয়েছে, লবিতে দেখা হল।

মেগানের দিকে তাকিয়ে জাইমে বললেন–সুপ্রভাত। আপনার কাছে কোনো উত্তর এসেছে?

সমস্ত রাত ধরে এর উত্তর খুঁজেছেন মেগান- হ্যাঁ, জাইমে এসেছে।

–আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন?

–জাইমে।

লারগো করটেজ তাড়াতাড়ি এলেন। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু আর সময় আছে কি? জোস ফেব্রিয়ান, আপনাদের গাইড। সে আপনাদের পাহাড়ি পথে ফ্রান্সে পৌঁছে দেবে। সে হল সান সেবাসটিয়ানের সেরা গাইড।

জাইমে বললেন– আপনাকে দেখে খুশি হয়েছি জোস, আপনি কী ভাবছেন?

–প্রথমে আমরা পায়ে হেঁটে যাব। তারপর বর্ডারের ও প্রান্তে পৌঁছে যাব। সেখানে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আর সময় নেই। এখুনি চলে আসুন।

যাত্রা শুরু হল।

লারগো করটেজ বললেন– ভালোভাবে পৌঁছে যাবেন কিন্তু।

জাইমে বললেন– ঠিক আছে, সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।

তাঁরা স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চললেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল, একদল সৈন্য সামনে এসে রাস্তা আটকে দিয়েছে। কর্নেল র‍্যামন আকোকা এবং কর্নেল সোসটেলোকে দেখা গেল।

জাইমে পেছন দিকে তাকালেন না, পালাবার কোনো পথ নেই। এখন প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হবে।

জাইমে অভ্যাসবশত তার বন্দুকে হাত দিলেন।

কর্নেল আকোকা বললেন মিরো চেষ্টা করবেন না, তাহলে বুলেট দিয়ে আপনার

জাইমে পালাবার চেষ্টা করছিলেন, দৌড়ে এখান থেকে বেরোনো যাবে কি? কিন্তু আকোকা জানলেন কী করে? জাইমে দেখলেন, দরজার পাশে অ্যাম্পারো দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে গম্ভীর হতাশার ছাপ।

ফেলিক্স বললেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম, জাইমে আপনি মেয়েটাকে একেবারে

আমি ওকে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ও আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙল কী করে?

কর্নেল আকোকা এগিয়ে এলেন। বললেন– খেলাটা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি সৈন্য এসে হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিল।

ফেলিক্স এবং রিকার্ডো জাইমের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কোনো আদেশ? জাইমে মাথা নাড়লেন। বুঝতে পারলেন, এখন আর উপায় নেই।

জাইমে জানতে চাইলেন- আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?

কয়েকজন পথচারীর চোখে ঘটনাটা ধরা পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কর্নেল আকোকা বললেন– আমরা আপনাকে মাদ্রিদে নিয়ে যাব। সেখানে মিলিটারি ট্রায়াল হবে। আপনাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। আর যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকত, আমি এখানেই আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতাম।

জাইমে বললেন– সিস্টারদের ছেড়ে দেওয়া হোক।

না, এই ষড়যন্ত্রে তারাও যোগ দিয়েছেন। তাদেরও একই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে।

কর্নেল আকোকা সিগন্যাল দিলেন। সৈন্যবাহিনী এবার তৎপর হতে শুরু করেছে। মিলিটারি ট্রাক এগিয়ে চলবে।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশ পালটে গেল। হাজার হাজার মানুষ উন্মত্তের মতো ছুটে আসছে। বাড়ির বউরা রান্না ফেলে ছুটে আসছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের দেখা যাচ্ছে। ব্যবসাদাররা দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকের হাতে শর্টগান, অনেকের হাতে রাইফেল। তারা বাসকোপন্থী। এটা তাদের স্বদেশভূমি। এখানে জাইমের অসাধারণ আধিপত্য। প্রথমে কয়েকশো, তারপর কয়েক হাজার। রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। মিলিটারি ট্রাক সামনে পেছনে কোনো দিকে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না।

কর্নেল আকোকা চিৎকার করতে থাকেন আমি কিন্তু গুলি করতে বাধ্য হব।

জাইমে বললেন হাসতে হাসতে আকোকা, এটা আমার রাজত্ব। আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আমি যদি বলি, তাহলে এই উন্মত্ত জনতা আপনাকে ছিঁড়ে খাবে। দেখছেন তো সকলেই সশস্ত্র। আপনার দশ-বারো জন পুলিশ কতক্ষণ লড়াই করবে?

তাহলে? আমাদের ছেড়ে দিন। না হলে বাঁচবেন না।

হতভম্বের মতো আকোকা সেই সিদ্ধান্ত নিলেন। জাইমে আর মেগান ট্রাক থেকে নেমে এলেন। অন্যরা তাদের অনুসরণ করলেন। কর্নেল আকোকা অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছেন। সমস্ত মুখ রাগে থমথম করছে।

জনগণের মধ্যে উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল।

তারা নানাভাবে টিটকিরি করতে শুরু করেছে। টুকরো টুকরো মন্তব্য ভেসে আসছে। শেষ অব্দি আমরা মুক্ত হতে পেরেছি অবাক হয়ে গেছেন মেগান, এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনও হয়নি।

তারপর? মেগান তাকালেন জাইমের চোখের দিকে।

তখনও জনগণের ভিড়।

কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে– আপনি সিস্টার মেগান?

–হ্যাঁ, আমিই সিস্টার মেগান।

নিঃশ্বাসের মধ্যে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। ভীষণ জরুরি। আমার . নাম অ্যালান টাকার। আপনি আমার সঙ্গে আসবেন?

একলা?

–হ্যাঁ, আপনাকে আসতেই হবে।

–প্লিজ, আমি এখন আসতে পারব না।

–আসুন, এই কথাটা বলার জন্য আমি নিউইয়র্ক থেকে ছুটে এসেছি।

–আমাকে খুঁজতে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

–সবই বোঝাব, আমাকে একটু সময় দিন।

ওই অচেনা অজানা ভদ্রলোক মেগানকে বগলদাবা করে রাস্তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। মেগান তাকিয়ে থাকলেন। জাইমে মিরো দাঁড়িয়ে আছেন, তারই জন্য অপেক্ষা করছেন।

.

অ্যালান টাকারের সঙ্গে সংলাপ মেগানের জীবনটাকে পাল্টাতে পারবে কি?

–আমি যার কাছ থেকে আসছি, তিনি আপনাকে দেখবার জন্য উদগ্রীব।

–কে?

এক ভদ্রমহিলা, তিনি আমেরিকায় থাকেন।

অ্যালান টাকার ভাবলেন, সব কথা খুলে বলা উচিত হবে কিনা।

–আপনি সিস্টার মেগান তো? কিন্তু আপনার নাম মেগান নয়, আপনি হলেন প্যাট্রিসিয়া।

হঠাৎ মেগানের মনে হল, তার কষ্টকল্পনা কোথায় হেঁটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা অনুভূতি।

–আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমাকে বোঝাবেন কি?

–আপনার জন্য একটা পাশপোর্টের ব্যবস্থা করব।

মেগান তাকালেন। হোটলের সামনে জাইমে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাকে একটু সময় দিন।

মেগান ফিরে এলেন।

জাইমে জানতে চাইলেন ওই লোকটা তোমাকে বিরক্ত করছিল?

-না-না।

জাইমে মেগানের হাত ধরলেন–এসো, এখন থেকে আমরা দুজন একসঙ্গে থাকব, মেগান।

আপনার নাম মেগান নয়, আপনি প্যাট্রিসিয়া।

মেগান তাকালেন জাইমের সুন্দর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে থাকব। কিন্তু প্রথমেই জানতে হবে, আমি কে?

—জাইমে, আমি তোমার সঙ্গে থাকব। কিন্তু আর একটা দরকারী কাজ আছে।

তার মানে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

কয়েক দিনের জন্য, হয়তো কয়েক মাস। কিন্তু কথা দিচ্ছি, আমি ফিরে আসব।

–আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি লারগো করটেজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।

আমি আসব। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম। হা, কিন্তু একবার এলেন স্কটের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

.

৩৭.

চার্চের শান্ত পরিবেশ, ল্যাটিন ভাষায় মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ঈশ্বর এই নব বিবাহিতকে আশীর্বাদ করুন।

গ্রাসিলা মন দিয়ে সব শব্দগুলো শোনার চেষ্টা করছেন। কত কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে তার। আজ আমি বিশ্বের সুখীতমা মহিলা। হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রতি আর একটু সদয় হও।

যাজক আরও বললেন– পৃথিবীতে সব শান্তি এখন যেন ওই দম্পতিকে আশ্রয় করে।

হঠাৎ গ্রাসিলার মনে হল, আমি কি এভাবে বিয়ে করতে পারি? তিনি চিৎকার করে বললেন, নানা, আমার অন্যায় হচ্ছে। আমি তো এখনই বিবাহিত।

মাথা নাড়ছেন গ্রাসিলা, উন্মাদের মতো আচরণ করছেন।

রিকার্ডো অবাক হয়ে গেছেন। রিকর্ডো বললেন- গ্রাসিলা কী বলছ তুমি?

গ্রাসিলা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন– আমি আমার জীবন যিশুকে দান করেছি। আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারি না। ডার্লিং রিকার্ডো, এটা জীবন উৎসর্গ নয়, এটা আশীর্বাদ। কনভেন্টের মধ্যে গিয়ে আমি মানসিক শান্তি পেয়েছিলাম। আমি জানি তুমি আমাকে অনেক কথার বাণী শুনিয়েছ, তোমার সঙ্গে কাটানো সময় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আমি কোনো দিন তা ভুলতে পারব না। কিন্তু আমাকে আমার জগতে ফিরতেই হবে।

তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম, আমি শপথ ভাঙতে পারব না। তোমার জন্য আমি বিশ্বাসঘাতিকা হতে পারব না। আমি জানি আমি তোমাকে সুখী করতে পারব না, তুমি আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো।

রিকার্ডো তাকিয়ে আছেন, ভেঙে পড়া একটা পুরুষ। কোনো শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে না। মনে হচ্ছে, তিনি বোধহয় মারা গেছেন।

গ্রাসিলা তাকালেন তাঁর ভাঙাচোরা মুখের দিকে। হৃদয়ের শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তিনি শেষবারের মতো রিকার্ডোর মুখে চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিলেন। বললেন– আমি সত্যি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি। আমি সবসময় তোমার জন্য প্রার্থনা করব। চোখে জল। গ্রাসিলা বললেন, তোমার জীবন সুখের হোক!

.

৩৮.

শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা, আরান্ডা ডে ডুয়েরোর হাসপাতালে একটা মিলিটারী অ্যাম্বুলেন্স ঢুকে পড়েছে। দুজন পুলিশ সামনের দরজা খুলে নেমে এলেন।

রুবিও আরজানোকে নিতে হবে, অর্ডার আছে। কাগজটা তিনি তুলে দিলেন।

সুপারভাইজার তাকালেন– আমি তো তাকে ছাড়তে পারব না। আর্মি অ্যাডমিনিসট্রেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ঠিক আছে। কোথায় তাকে পাব?

সুপারভাইজার বললেন- সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি সপ্তাহের শেষে ছুটিতে বাইরে গেছেন।

-এটা আমাদের সমস্যা নয়, এই হল রিলিজ অর্ডার, কর্নেল আকোকা সই করেছেন। আমি কি তাকে ডেকে আনব? আমি কি বলব, আপনারা এই অর্ডারটাকে গ্রাহ্য করছেন না?

না-না, এটার কোনো দরকার নেই। আমি ওই বন্দীকে তৈরি রাখছি।

আধ মাইল দূরে সিটি জেলের সামনে দুজন গোয়েন্দা বেরিয়ে এলেন। একটা পুলিশের গাড়ির মধ্যে থেকে। তারা ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারা ডেস্ক সার্জেন্টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

একজন বললেন– আমরা লুসিয়া কারমাইনকে নিতে এসেছি।

সার্জেন্ট তাকালেন দুই গোয়েন্দার দিকে।

–এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলেনি তো?

একজন ডিটেকটিভ চিৎকার করে বললেন- এটাই হচ্ছে লাল ফিতের বাঁধন, তিনি বললেন এই হল রিলিজ অর্ডার।

কর্নেল আকোকা সই করেছেন।

–ঠিক আছে। আপনারা মেয়েটিকে কোথায় নিয়ে যাবেন?

–মাদ্রিদে। কর্নেল নিজে প্রশ্ন করবেন।

–সত্যি? আমরা একবার কথা বলব।

–কোনো প্রয়োজন আছে কি? একজন ডিটেকটিভ বাধা দেবার চেষ্টা করলেন।

মিস্টার, বলা হয়েছে এই মেয়েটির ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। এমন কী ইতালিয় সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কর্নেল আকোকা যদি এই মেয়েটিকে ডেকে থাকেন, তা হলে আমি সেটা জানব।

–আপনি কিন্তু সময় নষ্ট করছেন।

–আমার হাতে অনেক সময় আছে মিস্টার।

উনি ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। বললেন, কর্নেল আকোকার সঙ্গে কথা বলতে হবে। মাদ্রিদে।

ডিটেকটিভ বললেন- বৃথা সময় নষ্ট করছেন। এখন কর্নেলকে পাবেন না।

ফোন বেজে উঠল।

কর্নেল অফিস।

সার্জেন্ট তাকালেন ডিটেকটিভদের দিকে বিজয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে। হ্যালো, আমি ডেস্ক সার্জেন্ট বলছি- আরাভার পুলিশ স্টেশন থেকে। কর্নেল আকোকার সঙ্গে কথা বলব।

গোয়েন্দা বারবার অধৈর্য হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

–আঃ, কখন এই খেলাটা শেষ হবে?

কর্নেল আকোকা?

–হ্যাঁ, কে কথা বলছেন?

–দুজন গোয়েন্দা এসেছেন কর্নেল, তারা একজন বন্দীকে মুক্ত করতে চাইছেন?

লুসিয়া কারমাইন?

–হ্যাঁ, স্যার।

–আপনি কি আমার সই করা অর্ডারটা দেখেননি?

–হ্যাঁ, স্যার দেখেছি।

–তা হলে আবার ফোন করতে গেলেন কেন? এক্ষুনি মেয়েটিকে ছেড়ে দিন।

সার্জেন্ট উঠলেন, তার আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন– আমি মেয়েটিকে নিয়ে আসছি।

পুলিশ স্টেশনের পাশে একটা ছোট্ট গলি, একজন ছেলে নজর করল এক ভদ্রলোক টেলিফোন পোলের তারটা কেটে দিলেন। নেমে এলেন তরতর করে।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল- তুমি ওখানে কী করছিলে?

ভদ্রলোক ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে বলল আমার এক বন্ধুকে সাহায্য করছিলাম। কত বড়ো বন্ধু তুমি তা পরে জানতে পারবে।

.

তিন ঘণ্টা কেটে গেছে। উত্তরের এক ফাঁকা ফার্ম হাউসে লুসিয়া ও রুবিও আরজানোর দেখা হল।

.

রাত তিনটে, কথা শোনা গেল– কমিটি এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলবে।

-হ্যাঁ, স্যার। কোথায়?

–কর্নেল, একটা লিমুজিন পাঠানো হয়েছে। এখুনি চলে আসুন।

–ইয়েস স্যার।

রিসিভারটা রেখে দিলেন। থরথর করে কাঁপছেন। সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়াগুলো ফুসফুঁসে প্রবেশ করছে।

লিমুজিন এসে যাবে, আমাকে এখনই তৈরি হতে হবে।

তিনি বাথরুমে গেলেন, আয়নায় প্রতিবিম্ব, পরাজয়ের প্রতিচ্ছবি।

জয়ের কাছে এসে গিয়েছিলাম, পারলাম না।

কর্নেল আকোকা দাড়ি কামালেন। খুবই সাবধানে। তারপর চান করলেন। গরম জলে। পোশাক পরে নিলেন।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি জানেন, এই বাড়িটার সঙ্গে আর কখনও তার দেখা হবে না।

তাহলে? এবার কী হবে?

কালো লিমুজিন, দরজা খুলে গেল। দুজন মানুষ, ভেতরে চলে আসুন কর্নেল।

অন্ধকার রাস্তার বুক চিরে এগিয়ে গেল ওই লিমুজিন।

.

মনে হচ্ছে এটা একটা স্বপ্ন। আমি তাকিয়ে আছি সুইজ আলপসের দিকে। আমি স্বাধীন।

জাইমে মিরো সব কিছু ব্যবস্থা করছেন। যাতে উনি লিরিকে পৌঁছোতে পারেন। গতরাতে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

সব কিছু স্বপ্ন? আহা, এত সুন্দর পাহাড় আর আমি এখনও বেঁচে আছি।

.

নটা বাজার কিছুক্ষণ আগে একজনকে দেখা গেল ল্যাক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক দরজাটা খুলে দিলেন– আসুন, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে কি?

লুসিয়া হাসলেন– না, মোটে না।

আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?

–আমার বাবার একটা অ্যাকাউন্ট আছে। তিনি আমাকে আসতে বলেছেন।

–ওটা কি নম্বরযুক্ত অ্যাকাউন্ট?

হা।

নম্বরটা কত?

B2A14920।

উনি মাথা নাড়লেন এক মুহূর্ত। উনি ভল্টের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। ব্যাঙ্কের কাজ শুরু হয়েছে। লুসিয়া ভাবলেন, সবকিছু ঠিক ঠাক আছে।

ভদ্রলোক ফিরে এলেন। কোনো অভিব্যক্তি আছে কি?

–আপনার বাবার অ্যাকউন্ট?

–হ্যাঁ, অ্যানজেলো কারমাইন।

–অ্যাকাউন্টে দুজনের নাম আছে।

–আর একটা নাম কী?

লুসিয়া কারমাইন।

তার মানে এই পৃথিবীতে আমিই রানি।

–অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে?

–এককোটি তিরিশ লক্ষ ডলার। এটা আপনি কীভাবে নেবেন? ব্যাঙ্কার জানতে চাইলেন।

–এটা ব্রাজিলের রিও শহরের একটা ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করতে হবে।

করে দিচ্ছি। আজ বিকেলের মধেই পৌঁছে যাবে। ব্যা

পারটা খুবই সহজ।

লুসিয়া এক ট্রাভেল এজেন্সির কাছে গেলেন। বিরাট পোস্টারে ব্রাজিলের ছবি।

তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

–আপনাকে কী করে সাহায্য করব?

ব্রাজিলের দুখানা টিকিট কাটতে হবে।

রুবিও কোথায়? ব্রাজিলে আমরা একসঙ্গে যাব।

সারাজীবন আমরা পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাব।

সবকিছু ঠিক হয়েছে কি? ওই দুর্ঘটনা? ওই ভয়ংকর সম্ভাবনা? বাবা এখনও জেলখানায়? আমার দুভাই? বেনিটো পাটাস? বাসকেটা? পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আকোকার লোকেরা? জাইমে মিরো। থেরেসা? সোনার ক্রুশ? রুবিও আরজানো? ডিয়ার রুবিও তুমি আমার জন্য আর কত কষ্ট করবে?

ঝরনায় পড়ে যাওয়া? বারের গোলমাল?

হোটেলে ফিরে এলেন লুসিয়া। টেলিফোন নিলেন।

কী বলব? কাকে ফোন করব? অপারেটর বললেন, কোন নাম্বার? লুসিয়া জবাব দিলেন না। তাকিয়ে থাকলেন, তুষার বৃত আল্পস চূড়ার দিকে। দুটো আলাদা জীবন রুবিও এবং আমি। আমরা দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। আমি অ্যানজেলে কারমাইনের কন্যা।

নাম্বার প্লিজ।

সে এক চাষার ছেলে, এই কাজটাকেই সে ভালোবাসে। আমি কি তাকে দূরে নিয়ে যেতে পারব না?

–আপনাকে কী করে সাহায্য করব? অপারেটর জানতে চাইলেন।

লুসিয়া বললেন না, ধন্যবাদ। তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

তারপরের দিন, সুইজ এয়ার ফ্লাইটে লুসিয়া চলেছেন রিওর দিকে।

রুবিওকে সঙ্গে নেননি। তিনি জানেন, এই পৃথিবীতে তিনি একেবারে একা।

.

৩৯.

টাউন হাউস। সুন্দর সাজানো ড্রয়িং রুম। দরকারি আলোচনা চলেছে। অ্যালান টাকারের জন্য অপেক্ষা, মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে উনি আসবেন। না, এখন আর মেয়ে নয়, এক পূর্ণবয়স্কা যুবতী। একজন সিস্টার। কী বিষয়ে আলোচনা হবে।

দেখতে চমৎকার, সুন্দরী রূপসী এবং লাবণ্যবতী। টাকারের মুখে হাসি– শ্রীমতী স্কট, ইনি হলেন মেগান।

এলেন বললেন- ঠিক আছে আমি কথা বলব। আপনি এখন যেতে পারেন।

হাসি মিলিয়ে গেল। অ্যালান বললেন– গুডবাই।

তারপর? কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। কিছু একটা হারিয়ে যাচ্ছে কী? বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

এলেন মেগানকে ভালোভাবে অবলোকন করলেন- আপনি বসতে পারেন।

মেগান বসলেন। দুজন পরস্পরকে মাপছেন। একজনের চোখে বিস্ময়, অন্য জনের চোখে কৌতূহল।

এলেন ভাবছেন, মেয়েটির মধ্যে মায়ের ছায়া আছে। এক অসাধারণ রূপবতী। সেই অ্যাকসিডেন্টের রাত, ঝড়। প্লেনে আগুন ধরে যাওয়া।

সবাই বলেছিল, মেয়েটি মারা গেছে। কিন্তু?

তারপর নীরবতা ভাঙল- আমি এলেন স্কট, স্কট ইন্ডাসট্রির প্রেসিডেন্ট। আপনি কি নাম শুনেছেন?

-না।

শোনার কথা নয় অবশ্য, এটা মনে মনে।

কীভাবে আসল কথাটা পাড়া যায়। একটা গল্প বানাতে হবে। কিন্তু মেগানের মুখের দিকে তাকিয়ে এলেনের মনে হল, প্যাট্রিসিয়াকে বিশ্বাস করতেই হবে। এলেন ভাবলেন, এই মেয়েটির ওপর সব চাবিকাঠি তুলে দেব? চোখে জল আসছে কি? না, এখন সত্যিটা বলতেই হবে।

এলেন স্কট হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন– আপনাকে একটা গল্প বলব। আমি কি আপনাকে তুমি বলে ডাকতে পারি?

.

এটা ছিল তিন বছর আগের ঘটনা। প্রথম বছর এলেন স্কট খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মেগানকে সহকারিনী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। মেগানের কাজ করার ক্ষমতা এবং বুদ্ধিদীপ্তি দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মেগান অতি সহজে যে কোনো বিষয় ধরতে পারছেন।

সারদিন ধরে তুমি কী করে কাজ করো?

মেগান হাসলেন। ভাবলেন, আমি তো কনভেন্টে ছিলাম, ভোর চারটেতে আমাকে উঠতে হত। না হলে সিস্টার বেটিনা বকতেন।

এলেন স্কট চলে গেছেন। মেগান এখনও শিখে চলেছেন। শেষ অব্দি এলেন তাকে দত্তক নিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা ভাবতে অবাক লাগে। মেগান ভেবেছিলেন, যতদিন আমি অনাথ আশ্রমে ছিলাম কেউ আমাকে দত্তক নেয়নি। আর এখন কিনা আমার নিজের পরিবারের কেউ একজন আমাকে দত্তক নেবেন।

সত্যি, পৃথিবীটা বড়ো অদ্ভুত।

.

৪০.

জাইমে মিরো একটু চিন্তা করছেন। একজন নতুন লোককে দেখা যাচ্ছে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

তিনি ফেলিক্স কারপিওকে বললেন- কী হচ্ছে বলুন তো?

আমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়, আমাদের সঙ্গে যাবে।

জাইমে বললেন– না, আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

তারা সেভাইলে এসেছেন, বিকেলবেলা, অনেকগুলো ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করা হয়েছে। শেষ অব্দি একটাকে নির্দিষ্ট করা হল। রাস্তার ধার, বেশি ট্রাফিকের ভিড় নেই। কাছাকাছি একটা ফ্যাক্টরি আছে। সবকিছু চমৎকার।

ফেলিক্স জানতে চাইলেন– কোনো বিপদের সম্ভাবনা?

–না, বিপদ নয়। তবে আমি ভবিষ্যতের সবকিছু দেখতে পাই। মনে হচ্ছে একটা বিপদ আসতে পারে।

–তাহলে আজকের মতো ব্যাপারটা বন্ধ রাখলে কী হয়?

না, আজ আমাকে কাজটা শেষ করতেই হবে।

ব্যাঙ্কে জনা ছয়েক কাস্টমার ছিলেন। ফেলিক্সের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। তিনি সকলকে ভয় দেখালেন। জাইমে ক্যাশরুমের দিকে চলে গেলেন। সিল্কের মতো মসৃণ তার গতি।

শেষ অব্দি ব্যাপারটা অত সহজে হল কি?

সর্বত্র পুলিশ গিজগিজ করছে। জাইমে এবং ফেলিক্সকে দেখা গেল। একজন ডিটেকটিভ চিৎকার করলেন, অস্ত্র ফেলে দিন।

জাইমে ক্ষণ ভগ্নাংশ ভাবলেন। তারপর তার অস্ত্র গর্জন করে উঠল।

৪১.

৭২৭ বিমান পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মাথার ওপর দিয়ে। দিনটা শুকনো, ঘটনাবহুল। মেগান ভাবলেন, এখনও অনেকটা যাত্রা বাকি।

ক্যালিফোর্নিয়া যেতে হবে, অনেক কাজ আছে। সান ফ্রান্সিকোতে নতুন ফ্যাক্টরি। মাথার ওপর বোঝ।

মেগান ভাবলেন– কেউ কি আমাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করবে? সিস্টারসিয়ান কনভেন্টের কথা মনে পড়ল।

স্টুয়ার্ট বললেন মিস স্কট, কিছু লাগবে কি?

মেগান খবরের কাগজের দিকে তাকালেন। বললেন– আমাকে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাটা দেবেন?

প্রথম পাতার গল্প, জাইমে মিরোর ছবি, লেখা আছে– জাইমে মিরো, ই টি এন নেতা, বাসকোপন্থী, প্রচণ্ডভাবে আহত, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে গতকাল এক ব্যাঙ্ক

ডাকাতির সময়, সেভাইলে, ফেলিক্স কারপিওর মৃত্যু হয়েছে। সেও এক ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী ছিল। দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ মিরোকে সন্ধান করছিল।

বেশ কিছুক্ষণ মেগান বসেছিলেন স্তব্ধ হয়ে। অতীতের অনেক কথাই তার মনে পড়ছিল। সেটা একটা দূরাগত স্বপ্নের মতো মনে হয়, শেষ বিকেলের আলোয় কে বুঝি একগাদা ছবি তুলেছে আবছা, তাই মুখগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

এই যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ হবে। আমরা সবকিছু মুঠো বন্দী করতে পারবে। কারণ জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে, তুমি কি আমার জন্য একটু অপেক্ষা করবে?

কথাগুলো এখনও কানে বাজছে, আমি কি ভুল করলাম? জাইমেকে রণক্ষেত্রে একা ফেলে?

না, টেলিফোনটা ধরতে হবে। পাইলটকে বললেন- আমরা নিউইয়র্কে ফিরে যাব।

.

একটা লিমুজিন অপেক্ষা করছে। মেগান অফিসে এলেন। বেলা দুটো বেজেছে। লরেন্স গ্রে অপেক্ষা করছেন। তিনি হলেন অ্যাটর্নি, এখন কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন।

মেগান বললেন– জাইমে মিরো, তার সম্পর্কে কী জানেন?

–এক ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী, ই টি এন-র সঙ্গে যুক্ত। আমার মনে হচ্ছে উনি বোধহয় ধরা পড়েছেন।

–হ্যাঁ, এবার বিচার শুরু হবে। আমার কিছু কাজ আছে। কাকে আমরা দেশের সেরা আইনবিদ বলতে পারি।

কারটিস হেম্যান।

–না, একজন ঘাতক আইনজীবী চাই।

–মাইক রসন?–একশো বছরের জন্য তাকে কিনে নেওয়া হয়েছে মেগান।

–চুক্তিগুলো ভাঙতে হবে। আমি তাকে মাদ্রিদে পাঠাব। আমার নিজের কাজে।

–আমরা স্পেনের পাবলিক ট্রায়ালে যোগ দিতে পারি না।–

-হ্যাঁ, আমরা পারি। আইন তাই বলছে।

অ্যাটর্নি ভাবলেন, আমি কি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?

-হ্যাঁ, বলুন।

–আমি চেষ্টা করব।

–তাহলে? ব্যাপারটা মনে থাকে যেন।

.

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। লরেন্স গ্রে মেগানের অফিসে প্রবেশ করেছেন।

মাইক রসন ফোনে আছেন, তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

মেগান ফোন ধরলেন– মিঃ রসন, আপনার গলা পেয়ে ভালোই লাগছে। আপনি তো জানেন, স্কট ইন্ডাসট্রিতে কত ঝামেলা। আমি এমন একজনকে চাইছি, যিনি আমাদের সমস্ত আইনের বিষয়টা সামলে নেবেন। আপনার নামটাই প্রথম মনে পড়ছে। এর জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

মিস স্কট?

বলুন।

–আপনি একথা কেন বলছেন?

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–রাত দুটো বেজেছে। আপনি রাত দুটোর সময় কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেন?

মিঃ রসন।

–আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি। একজন অন্যজনকে বিশ্বাস করব। আপনি বলছেন স্পেনে যেতে হবে। বাসকো সন্ত্রাসবাদীর পক্ষে দাঁড়াতে হবে, যাকে পুলিশ ধরেছে।

না, সে কোনো সন্ত্রাসবাদী নয়। বলতে চাইছিলেন। কিন্তু মেগান সেকথা বললেন না। বললেন- হ্যাঁ।

আপনার সমস্যা কী? তিনি কী স্কট ইন্ডাসট্রির কোনো শত্রু?

–তিনি–

–আমি দুঃখিত, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। আমি এত কাজের চাপে আছি যে গত ছমাস ধরে বাথরুম যেতে পারছি না। আমি অন্য কয়েকজন আইনজ্ঞের নাম বলতে পারি।

না, মেগান ভাবলেন, জাইমে মিরো আমাকে চাইছেন। তারপর? একটা অদ্ভুত অসহায়তা। স্পেন আর একটা জগৎ, আর একটা সময়, তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে ঠিক আছে, আপনাকে অনুরোধ করার জন্য দুঃখিত।

কী বললেন? আপনার নিজস্ব ব্যাপার, আপনি কি সত্যি কথাটা বলবেন? আমি জানতে চাইছি, স্কট ইন্ডাসট্রির সর্বাধিনায়িকা কেন এক স্পেনদেশীয় উগ্রপন্থীর জন্য এতখানি দরদ দেখাচ্ছেন। কালকে কি লাঞ্চের আসরে একবার দেখা হবে?

হ্যাঁ, দেখা হবে।

–লে সারকাতে একটার সময়।

.

লে সারকা।

মাইক রসন বললেন– ছবি দেখুন। আমি কিছু গল্প বলব।

তার উচ্চতা খুব একটা বেশি নয়। পোশাক পরিচ্ছেদের মধ্যে অবহেলার ছাপ। কিন্তু মনটা কম্পিউটারের মতো চলমান। চোখের তারায় হাজার সূর্যের আলো। সবসময় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মাইক রসন বলতে থাকেন- এবার প্রথম থেকে বলুন তো?

মেগান বললেন– উনি আমার ভালো বন্ধু। আমি চাই না, ওনাকে এভাবে মেরে ফেলা হোক।

রসন ঝুঁকে বসলেন- আমি খবরের কাগজের পাতায় পড়েছি, ডন জুয়ান কারলোসের সরকার মিরোকে মেরে ফেলতে পারে। আপনার বন্ধুর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ আছে।

মেগানের মুখের রং পাল্টাচ্ছে। যা সত্যি তা আমাকে বলতেই হবে। মিরো অনেকগুলো ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছেন, মানুষকে হত্যা করেছেন, বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে দিয়েছেন।

উনি হত্যাকরী নন, উনি একজন মহান দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য লড়াই করছেন।

হতে পারে, বলুন আমাকে কী করতে হবে?

–ওনাকে বাঁচাতে হবে।

–মেগান, আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি, আপনাকে সত্যিটা বলে চাই, যিশুখ্রিস্ট থাকলেও বোধহয় ওনাকে বাঁচাতে পারবেন না। আপনি কি অলৌকিক কোনো ব্যাপার বিশ্বাস করেন?

–হ্যাঁ, আমি করি। বলুন, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কিনা?

বলুন তো, কেন আপনি এত উদ্বিগ্ন।

–ছজন লইয়ারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তাদের কেউ মিরোকে সাহায্য করতে চাইছেন না। কোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে আদেশ জারি করতে চলেছে। বন্ধু, এখন আর অলৌকিক কোনো ঘটনা ঘটবে কি? যিশু কি জেগে উঠেছেন? জানি না, তবে একটা লাঞ্চে আপনি আমাকে ডেকেছিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

.

বিচার শুরু হল ১৭ সেপ্টেম্বর, মেগান তার সহকারীকে বললেন আমার সমস্ত অ্যাপয়ন্টমেন্ট ক্যানসেল করো। আমি এখন মাদ্রিদে উড়ে যাব।

–সেখানে কতদিন আপনি থাকবেন?

বলতে পারছি না।

.

এরোপ্লেনে বসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক হল। প্লেন এখন আটলান্টিক পার হচ্ছে। মেগান ভাবলেন, আমার হাতে টাকা আছে, আমার হাতে ক্ষমতা আছে। প্রধানমন্ত্রী হলেন আসল চাবিকাঠি। এই মামলা শুরু হবার আগে তার কাছে পৌঁছাতে হবে। না হলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

.

প্রধানমন্ত্রী লিও পোলডো মার্টিনেজের সঙ্গে মেগান একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট ঠিক করলেন। মাদ্রিদে পৌঁছোনোর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। ওই ভদ্রলোক মেগানকে মনক্লো প্যালেসে ডেকেছেন, লাঞ্চের আসরে।

মেগান বললেন আমি জানি, আপনি খুব ব্যস্ত। তাই এই আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ।

মিস স্কট, আপনি যখন স্কট ইন্ডাসট্রির প্রধান, আপনাকে বিশেষ খাতির তো করতেই হবে। বলুন, আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

মেগান বললেন আমি এখানে এসেছি আপনাকে সাহায্য করার জন্য। স্পেনে আমাদের কয়েকটা ফ্যাক্টরি আছে। আমরা আরও বেশি ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে চাইছি।

প্রধানমন্ত্রীর চোখ জ্বলে উঠেছে সত্যি?

-হ্যাঁ, স্কট ইন্ডাসট্রি এখানে একটা বিরাট ইলেকট্রনিক্স প্ল্যান্ট খুলবে। অনেক মানুষের চাকরির সংস্থান হবে। যদি একটা সফল হয়, আমরা আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টরি খুলব।

কিন্তু আমার এই স্পেন কেন?

–অন্য দেশের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবেই এই দেশটাকে ভালোবাসি। তবে এখানে গৃহযুদ্ধের ব্যাপার আছে, তাতে অনেক আধিকারিক আসতে চাইছেন না।

-সত্যি!

–হ্যাঁ, আপনাদের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেছে। আমি বলব কি?

কারোর নাম কি মনে পড়ছে?

–হ্যাঁ, জাইমে মিরো।

–জাইমে? আমরা ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরিটা স্থাপন করতে চাইছি না।

মেগান বললেন, আরও অনেক কিছু আমরা চাই, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে।

প্রধানমন্ত্রী বললেন– একটা ছোট্ট সমস্যা আছে।

–কী সমস্যা? আমরা কি পরে কথা বলব?

–মিস স্কট, স্পেনের আভিজাত্য এবং সম্মানকে আমরা এভাবে বিক্রি করতে পারি না। কেউ ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করাবে তা পারবে না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনি এখানে এসেছেন, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তাই তো? না, আপনার ফ্যাক্টরি এখানে করার দরকার নেই।

মেগান ভাবলেন, ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

ছ সপ্তাহ ধরে এই বিচার চলেছিল।

মেগান পুরো সময়টা মাদ্রিদে ছিলেন। প্রত্যেক দিন খবর সংগ্রহ করতেন। মাইক রসনের সঙ্গে কথা হত।

বন্ধু, এবার মনে হয় আপনার চলে আসা উচিত।

–মনের দিক থেকে সায় পাচ্ছি না।

মেগান চেষ্টা করলেন জাইমের সঙ্গে দেখা করতে।

বিচারের শেষ দিন, মেগান কোর্টঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাজার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন। সাংবাদিকরা এসেছেন। মেগান থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

–কী হয়েছে?

–জাইমেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

.

৪২.

ঠিক করা হল, সকাল পাঁচটার সময় ফাঁসির আদেশ কার্যকর হবে। অনেক মানুষের ভিড় জমেছে মাদ্রিদে। কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে। ব্যারিকেড করা হয়েছে। জনগণ যাতে উন্মত্ত না হয়ে উঠতে পারে, তার ব্যবস্থা। চারপাশে সশস্ত্র প্রহরা।

জেলখানার ভেতর মাঝে মধ্যেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী লিও পোলডো মার্টিনেজ নিজে এসেছেন। জি ও ইর নতুন প্রধান আলোনজো সেবাসটিয়ান। তার পাশাপাশি আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

ওয়ার্ডেন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সারা জীবন তিনি সরকারকে সাহায্য করে গেছেন। দুষ্কৃতিদের ধরেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন– দেখুন, সব ব্যাপারটা যেন নিখুঁতভাবে হয়। মিনোর ফাঁসির ব্যাপারে কোনো গোলমাল হলে সাংঘাতিক অবস্থা হবে।

আধিকারিকরা বললেন– আমরা সব বিপদের সম্ভাবনাকে খুঁটিয়ে দেখছি। আপনি এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করবেন না।

জেলখানার ভেতর রক্ষী থাকবে তো?

–হ্যাঁ, এখন প্রহরা আরও বেশি করা হয়েছে। জাইমে মিরোকে একটা সিকিউরিটি, সেলের ভেতর আটকে রাখা হয়েছে। তিন তলাতে। অন্য বন্দীদের অন্য সেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুজন সশস্ত্র প্রহরীকে সব সময়ের জন্য রাখা হয়েছে। আমি লকডাউনের ব্যবস্থা করেছি। এই ফাঁসির আদেশ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা চালু থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়েছেন। ঠিক আছে, কোথাও কোনো ত্রুটি চোখে পড়ছে না।

এভাবেই অধিবেশনটা শেষ হয়ে গেল।

.

সকাল সাতটা বেজে তিরিশ মিনিট। জেলখানার সামনে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু দেবেন কি?

জেলখানার একজন রক্ষী জানতে চাইল।

ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে সে বলল- আপনি কি এখানে নতুন এসেছেন?

-হ্যাঁ, জুলিও কোথায়?

–ও আজ অসুস্থ।

আজ সকালে কোনো কিছু দেব না, বিকেলে আসব।

কিন্তু রোজ সকালে

–হ্যাঁ, আজ দেবার কিছুই নেই।

ট্রাকটা ধীরে ধীরে রাস্তার মধ্যে হারিয়ে গেল। ওয়ার্ডেনের কাছে খবর পৌঁছে গেল।

সকাল আটটা বেজেছে। রাস্তাতে একটা গাড়িবোমা ফাটল। বেশ কয়েকটা গাড়িতে আগুন লেগে গেছে। সাধারণ অবস্থা হলে হয়তো প্রহরীরা খুব একটা সতর্ক হত না। কিন্তু এখন ওপরতলার কড়া নির্দেশ আছে। তারা তল্লাসি করতে শুরু করল।

ওয়ার্ডেনের কাছে খবর পৌঁছে গেল।

ওয়ার্ডেন বললেন- ওরা শেষ মুহূর্তে আঘাত হানতে পারে। আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

.

সকাল নটা বেজে পনেরো মিনিট। একটা হেলিকপ্টারকে দেখা গেল জেলখানার ওপর উড়ে যেতে। তার গায়ে লেখা আছে স্পেনের সবথেকে বিখ্যাত সংবাদপত্রের নাম। সঙ্গে

সঙ্গে দুটি অ্যান্টি এয়ারক্রাফট বন্দুক উন্মুখ হয়ে রইল। লেফটেন্যান্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি পতাকা ওড়ালেন। হেলিকপ্টারটিকে সংকেত করলেন।

ফোন করা হল, ওয়ার্ডেন, মাথার ওপর একটা কপ্টার উড়ছে।

–কোনো চিহ্ন?

–মনে হচ্ছে, সব থেকে বিখ্যাত কাগজ লা প্রেনসা, কিন্তু নতুন রং করা হয়েছে।

একটা গুলি করা। যদি না মরে তা হলে আকাশের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাও।

—ঠিক আছে।

গুলি করা হল। পাইলটের ভয়ার্ত মুখছবি। আবার গুলি করা হল। হেলিকপ্টারটা আকাশে হারিয়ে গেল।

লেফটেন্যান্ট ভাবলেন, এবার আর কী ঘটনা ঘটবে?

.

সকাল এগারোটা, মেগান স্কট জেলখানার রিসেপশন অফিসে হাজির হয়েছেন। তাকে অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

–আমি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।

–আপনার কি অ্যাপয়ন্টমেন্ট করা আছে নাকি?

–না, তা হলে?

–আমি দুঃখিত, ওয়ার্ডেন আজ সকালে কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। আপনি বরং বিকেলে ফোন করুন।

-বলুন মেগান স্কট এসেছেন।

ভদ্রলোক মেগানের দিকে তাকালেন। তা হলে? ইনি হলেন সেই বিখ্যাত আমেরিকান ভদ্রমহিলা যিনি জাইমে মিরোকে ছাড়াবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আহা, উনি বললেন আচ্ছা, আমি ওয়ার্ডেনকে বলছি।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। মেগানকে দেখা গেল ওয়ার্ডেনের অফিসে বসে থাকতে। বেশ কয়েকজন আধিকারিক সেখানে পৌঁছে গেছেন।

মিস স্কট আপনার জন্য কী করতে পারি?

আমি জাইমে মিরোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দীর্ঘশ্বাস– না, সেটা সম্ভব নয়।

কিন্তু

–মিস স্কট, আমরা সকলেই আপনার পরিচয় জানি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোনো সাহায্য করতে পারব না। আমরা, স্পেনদেশীয় বাসিন্দারা সকলের আভিজাত্য এবং পদমর্যাদা বুঝতে পারি। আমাদের মনেও আবেগ আছে, মাঝে মধ্যে আমাদের এমন একটা অবস্থার সামনে দাঁড়াতে হয়, সব আবেগকে হত্যা করতে হয়।

ভদ্রলোকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে কিন্তু আজ, মিস স্কট, আজ একটা বিশেষ দিন, অনেক বছর ধরে আমরা ওই লোকটিকে অনুসন্ধান করেছি। আজ সব নিয়মনীতি মেনে চলতেই হবে। তাই জাইমে মিরোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে না।

মেগান চেষ্টা করলেন– আমি কি এক মুহূর্তের জন্যও দেখা করতে পারব না?

প্রিজন বোর্ডের একজন সদস্য কথাটা ভাবলেন। মেগানের মুখে উদগ্রীব উৎকণ্ঠা।

–আমি দুঃখিত, ওয়ার্ডেন বললেন।

–আমি কি একটা খবর পাঠাতে পারি? কণ্ঠস্বর আবেগে বুজে আসছে।

–একটা মৃত লোককে খবর পাঠিয়ে কী লাভ? এক ঘন্টা সময় আছে। তারপর তো এই পৃথিবীতে জাইমে মিরো বলে কেউ থাকবে না।

কিন্তু, এখনও সময় আছে, যদি একদল বিচারক আবার নতুন করে রায় ঘোষণা করেন?

–সেটা হওয়া সম্ভব নয়। আমি পনেরো মিনিট আগে খবর পেয়েছি। প্রাণভিক্ষার জন্য মিরোর শেষ আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সুতরাং ফাঁসির ঘটনা ঘটবেই।

তিনি উঠলেন, সকলে তাকে অনুসরণ করলেন। মেগান তাকালেন ঠিক আছে, ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

মেগান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

.

বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আছে। জাইমে মিরোর সেলের দরজা খুলে গেল। ওয়ার্ডেন এবং তার দুই সহকারী ভেতরে ঢুকলেন। চারজন সশস্ত্র প্রহরীকে দেখা গেল।

ওয়ার্ডেন বললেন- সময় হয়েছে।

জাইমে তার বিছানা থেকে উঠলেন। তার হাতে হাতকড়া, পায়ে লোহার বেড়ি ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত।

জাইমে ফাঁকা করিডরের দিকে এগিয়ে গেলেন। এত শেকল থাকাতে ভালোভাবে হাঁটতে পারছেন না। চারপাশে সশস্ত্র প্রহরা।

জাইমে বললেন- কোথায় যাব?

ওয়ার্ডেন বললেন- ফসি কাঠের দিকে।

ব্যাপারটা বলতে খারাপ লাগে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। এভাবেই এক-একজনকে ফাঁসি দেওয়া হবে। জনগণের চোখের বাইরে, সাংবাদিকরা প্রবেশ করতে পারবেন না।

করিডর দিয়ে সেই মৃত্যুকালীন শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। বাইরে হাজার লোকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। জাইমে–জাইমে–জাইমে-মনে হচ্ছে, শব্দ যেন আক্রমণ করছে।

–ওরা আপনাকে ডাকছে, একজন রক্ষী বললেন।

না, ওরা নিজেরা সাহস পাওয়ার চেষ্টা করছে। ওরা স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করছে। পরবর্তীকালে ওরা হয়তো অন্য কারো নামে জয়ধ্বনি দেবে। আমি মারা যাব, কিন্তু সংগ্রাম চলতে থাকবে।

দুজন সিকিউরিটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট্ট একটা চেম্বার আছে। তার পাশে লোহার দরজা।

–ঠিক সময়ে আমি এসে গেছি, তাই তো?

–ভদ্রলোক এসে গেছেন ফাদার, ওয়ার্ডেন বললেন, ফাদার, আপনি কিন্তু তার সামনে এগোবেন না।

কিন্তু, আমাকে যে—

–শেষ প্রার্থনা? বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে তা বলতে হবে।

একজন দরজাটা খুলে দিল। ফাদার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চারপাশে সশস্ত্র প্রহরা। ভদ্রলোকের চেহারাটা বিশাল।

ওয়ার্ডেন মাথা নাড়লেন। জাইমেকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। প্রহরীরা বাইরে। সবুজ দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর কয়েকজন সহকারী বসে আছেন। হাতের শেকল খুলে দেওয়া হল। তারপর? দড়ি দিয়ে বাধা হল জাইমেকে।

ওয়ার্ডেন জাইমের দিকে তাকালেন। বললেন- কোনো অসুবিধা নেই। আপনি কী বলছেন ভগবান তা শুনতে পাবেন।

–আপনি কি মুখে কাপড় চাপা দিতে চাইছেন?

ওয়ার্ডেন জানতে চাইলেন।

না।

ওয়ার্ডেনকে অবাক দেখাল।

বাইরে জনগণের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। সবুজ দরজা খুলে গেল।

ডাক্তার বললেন- এবার সময় হয়েছে।

সব কিছু পরপর ঘটে যাচ্ছে। জাইমে মিরোর দেহটা বন্দীশালার পেছন দিকে নিয়ে আসা হবে। তারপর একটা ভ্যানের ওপর তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু, যে মুহূর্তে প্রহরীরা তৎপর হয়ে উঠল, জনগণ উন্মত্ত হয়ে খেপে উঠেছে।

কণ্ঠস্বর ক্রমশ উচ্চকিত হয়ে উঠছে। পুরুষ এবং নারীরা বুক চাপড়ে আর্তনাদ করছে। ছোটো ছেলেরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। কী ঘটছে তারা বুঝতে পারছে না।

ড্রাইভার বলল– কীভাবে যাব বুঝতে পারছি না।

.

দুপুর দুটো বেজেছে। সকলে প্রধানমন্ত্রী মাটিনেজের কাছে হাজির হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন– আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কাজটা নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য।

ওয়ার্ডেন বললেন- প্রধানমন্ত্রী, আমরা এখানে এসেছি পদত্যাগ করার জন্য।

মার্টিনেজ অবাক হয়ে গেলেন- আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী হয়েছে?

-এটা মানবিকতার ব্যাপার হে মহামান্য প্রধানমন্ত্রী, একটা মানুষকে এভাবে হত্যা করা উচিত কি? হয়তো হত্যাই তার কাজের একমাত্র দণ্ড। কিন্তু এইভাবে? এটা নৃশংস, আমরা কেউ সমর্থন করতে পারছি না।

–আরও একবার চিন্তা করা উচিত। আপনাদের ভবিষ্যৎ, আপনাদের পেনশন।

না, আমরা বিবেক নিয়ে বাঁচতে চাই। ওয়ার্ডেন তিনটে কাগজ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন- এখানে আমাদের পদত্যাগপত্র আছে।

.।

রাত হয়েছে, ভ্যান ধীরে ধীরে ফরাসি সীমান্তে পৌঁছে গেল। সেখানে একটা ফার্ম হাউস আছে।

এটাই হল আসল জায়গা। লাশটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। না হলে পচা গন্ধ বেরোবে।

ফার্ম হাউসের দরজা খুলে গেল। এক ভদ্রমহিলা, মধ্য পঞ্চাশ, জিজ্ঞাসা করলেন আনা হয়েছে?

-হ্যাঁ, ম্যাডাম। কোথায় এটাকে রাখা হবে?

–পার্লারের মধ্যে।

–ঠিক আছে। কবর দিতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।

ভদ্রমহিলা দেখলেন একটা দেহকে ব্যাগের মধ্যে পুরে আনা হয়েছে।

–অনেক ধন্যবাদ।

লোক দুটো চলে গেল। ভদ্রমহিলা তাকিয়ে আছেন।

পেছনের ঘর থেকে আর একজনকে দেখা গেল। এবার ব্যাগটা খুলে ফেলা হল। জাইমে মিরো শুয়ে আছেন। হেসে বললেন– সব ব্যাপারটা অলৌকিক। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি হত?

মেগান জানতে চাইলেন- কী খাবে? হোয়াইট ওয়াইন, নাকি রেড?

.

৪৩.

মাদ্রিদের বারাজাস এয়ারপোর্ট। প্রাক্তন ওয়ার্ডেন গোমেজ এবং তার প্রাক্তন সহকারীরা দাঁড়িয়ে আছেন।

মনে হচ্ছে, এইভাবে কাজটা না করলেই বোধহয় ভালো হত। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার, আমরা একটা গোটা দ্বীপ কিনতে পারব।

একজন বললেন- আমি সুইজারল্যান্ড যাব, সেখানে অনেকগুলো গ্লেসিয়ার কিনব।

আলোচনা এগিয়ে চলেছে।

একজন বললেন আমি একটা হাসপাতাল খুলব। মেগান স্কটের এই দানটা আগেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া একটা কথা বলব, আমি কিন্তু জাইমে মিরোকে সত্যি ভালোবাসি।

.

৪৪.

ফরাসি দেশ, সুন্দর আবহাওয়া, চারপাশে সোনালি ফসলের হাতছানি। আহা, প্রতিবছর মানুষের সুখ যেন উপছে ওঠে, রুবিও আরজানো ভাবলেন, কী সুন্দর এই প্রকৃতি!

প্রথম বিয়ে, এক বছর আগে, যমজ সন্তানের জন্ম, একটা মানুষ কি এত সুখী হতে পারে?

বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, রুবিও ট্রাক্টরের ওপর চড়ে বসেছেন। অনেক কাজ বাকি আছে। যমজ দুই শিশুর কথা ভাবছেন। ছেলেটা বড়ো হয়ে একজন শক্তিশালী কৃষক হয়ে উঠবে। কিন্তু বোনটি? সে কী করবে? সে কি তার মনের মানুষকে কষ্ট দেবে?

ট্রাক্টরটা শব্দ করে এগিয়ে চলেছে।

লুসিয়া হাসলেন তুমি ঠিক সময়ে এসে গেছে। ডিনার তৈরি।

.

মাদাম প্রাওরেস বেটিনার দিন কাটছে অস্থিরতার মধ্যে। এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, যা তার বিশ্বাসের বাইরে।

অনেক দিন বাদে সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং রাজা ডন জুয়ান কারলোস নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সিস্টার গ্রাসিলা এবং অন্যান্য সিস্টারদের মাদ্রিদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে আবার তারা নৈঃশব্দ্যের জগতে ফিরে গেছেন।

প্রাতরাশ শেষ হয়ে গেছে। মাদার প্রাওরেস দাঁড়িয়ে আছেন তার অফিসে। তার টেবিলের ওপর পড়ে আছে ওই সোনার ক্রুশটি।

আহা, পৃথিবীতে কত অলৌকিক ঘটনাই না ঘটে যায়।

.

শেষ কথা

১৯৭৮– মাদ্রিদ শহরে কিছুটা শান্তি ফিরে এসেছে। বাসকোদের হাতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তুলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা নিজস্ব পতাকা তুলতে পারবেন। নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন। একটা আলাদা পুলিশ প্রশাসন দেওয়া হবে। ই টি এন-র সঙ্গে সরকারের সম্মানজনক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মাদ্রিদের মিলিটারী গভর্ণর

পদত্যাগ করেছেন। ফ্রাঙ্কো যাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন, সেই লুইস ব্ল্যাঙ্কা এখন দায়িত্ব নিয়েছেন।

হিংসার ঘটনা ক্রমশ কমে আসছে।

গত তিনবছরে ই-টি-এন-র সন্ত্রাসবাদীরা ছশো জনকে হত্যা করেছিলেন। বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। ই-টি-এন এখন অনেক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। কম করে পঁচিশ লক্ষ বাসকো সমর্থক। এখন চোরাগোপ্তা আক্রমণ কমে এসেছে।

অপাস মুনডোর কাজ আরও বেড়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ আলোচনা করতে চান না।

.

সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট আগের মতোই নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে এগিয়ে চলেছে। সারা পৃথিবীতে তার শাখা ছড়িয়ে পড়েছে। স্পেনেই আছে সাতটি।

সেখানে একই রকমভাবে ঈশ্বরের বন্দনা করা হয়, রাতের অন্ধকারে নৈঃশব্দ্যের প্রহর ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

হায়, সময়ের বালুকাবেলায় কত না পদচিহ্ন আঁকা হয়। মানুষের ছোটো ছোটো সুখ দুঃখের জলছবি–মহাকাল শুধু তাকিয়ে থাকে, কোনো ব্যাপারেই সে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় না।